গাভী বিত্তান্ত

আহমদ ছফা

গাভী বিত্তান্ত

আহমদ ছফা

সন্দেশ

ISBN-984-8088-28-8

গাভী বিত্তান্ত

আহমদ ছফা

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ১৯৯৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০০২

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

সন্দেশ, বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট শাহাবাগ ঢাকা-১০০০ থেকে
লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত
কম্পোজ : **সোহেল কম্পিউটার** ৫৬ বড় মগবাজার (কাজী হাউস), ঢাকা-১২১৭
ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং ওয়ার্কস : ৪৩৫ ওয়ার্লেস রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা ১২১৭ থেকে মুদ্রিত
পরিবেশক : **বুক ক্লাব** ৫৩ আজিজ সুপার মার্কেট শাহাবাগ ঢাকা-১০০০ ।

Web page: www.sandeshgroup.com

১০০.০০ টাকা

উ ৎ স র্গ

ফাদার ক্লাউস ব্যুয়েলে
আমার বন্ধু এবং শান্তিপথের যাত্রী

আবু জুনায়েদের উপাচার্য পদে নিয়োগপ্রাপ্তির ঘটনাটি প্রমাণ করে দিল আমাদের এই যুগেও আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা ফ্যাকাল্টির সদস্যবৃন্দ আবু জুনায়েদের উপাচার্যের সিংহাসনে আরোহণের ব্যাপারটিকে নতুন বছরের সবচাইতে বড় মজার কাণ্ড বলে ব্যাখ্যা করলেন। আবু জুনায়েদ স্বয়ং বিস্মিত হয়েছেন সবচাইতে বেশি। আবু জুনায়েদের বেগম নুরুন্নাহার বানু খবরটি শোনার পর থেকে আণ্ডাপাড়া মুরগির মতো চিৎকার করতে থাকলেন। তিনি সকলের কাছে বলে বেড়াতে লাগলেন যে তাঁর ভাগ্যেই আবু জুনায়েদ এমন এক লাফে অত উচুঁ জায়গায় উঠতে পারলেন। কিছু মানুষ অভিনন্দন জানাতে আবু জুনায়েদের বাড়িতে এসেছিলেন। নুরুন্নাহার বানু তাঁদের প্রায় প্রতিজনের কাছে তাঁর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর থেকে কী করে একের পর এক আবু জুনায়েদের ভাগ্যের দুয়ার খুলে যাচ্ছে সে কথার পাঁচ কাহন করে বলেছেন। অমন ভাগ্যবতী বেগমের স্বামী না হলে, একদম বিনা দেন-দরবারে দেশের সবচাইতে প্রাচীন, সবচাইতে সম্ভ্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদটি কী করে আবু জুনায়েদের ভাগ্যে ঝরে পড়তে পারে! যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই মুখে কিছু না বললেও মনে মনে মেনে নিতে দ্বিধা করেননি যে একমাত্র স্ত্রী ভাগ্যেই এরকম অঘটন ঘটতে পারে।

শিক্ষক হিসেবে আবু জুনায়েদ ছিলেন গোবেচারা ধরনের মানুষ। গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ডিপার্টমেন্টে বা ডিপার্টমেন্টের বাইরে তাঁর সঙ্গে কারো বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল না। আর আবু জুনায়েদ স্বভাবের দিক দিয়ে এত নিরীহ ছিলেন যে তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করলে অনেকে মনে করতেন, শত্রুতা করার ক্ষমতাটির বাজে খরচ করা হবে। তাই গোটা বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় তাঁর বন্ধু বা শত্রু কেউ ছিলেন না।

আমাদের দেশের সবচাইতে প্রাচীন এবং সবচাইতে সম্ভ্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয়টি হাল আমলে এমন এক রণচণ্ডী চেহারা নিয়েছে। এখানে ধন প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। এখানে যখন তখন মিছিলের গর্জন কানে ঝিম ধরিয়ে দেয়। দুই দলের বন্দুক যুদ্ধে যদি পুলিশ এসে পড়ে সেটা তখন তিন দলের বন্দুক যুদ্ধে পরিণত হয়। কোমলমতি বালকেরা যেভাবে চীনা কুড়াল দিয়ে অবলীলায় তাদের বন্ধুদের শরীর থেকে হাত-পা বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারে, সেই দক্ষতা ঠাঁটারি বাজারের পেশাদার কশাইদেরও আয়ত্ত করতে অনেক সময় লাগবে। এখানে যত্রতত্র সে সকল বিস্ময় বালকের সাক্ষাৎ মিলবে যারা কিমিয়া শাস্ত্রের গোপন রহস্য জানার মতো করে সেই চমৎকার রোমাঞ্চকর তথ্যটি জেনে ফেলেছে। রিভলবারের ট্রিগারে

একবার চাপ দিলে একটি গুলি বেরিয়ে আসে, সে-একটিমাত্র গুলি একজন মানুষের বুকে আঘাত করে সে মানুষটিকে জগৎ থেকে পত্রপাঠ বিদায় নিতে হয়। উপন্যাস রচনা করা কিংবা উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডি লেখার চাইতে অনেক সুন্দর এবং কঠিন এই কর্ম। একবার দক্ষতা অর্জন করতে পারলে কাজটি কিন্তু অতি সহজে নিষ্পন্ন করা সম্ভব। সকলের দৃষ্টির অজান্তে এখানে একের অধিক হনন কারখানা বসেছে, কারা এন্তেজাম করে বসিয়েছেন সকলে বিশদ জানে। কিন্তু কেউ প্রকাশ করে না। ফুটন্ত গোলাপের মতো তাজা টগবগে তরুণেরা শিক্ষক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার পর হনন কারখানার ধারেকাছে বাস করতে করতে নিজেরাই বুঝতে পারেন না কখন যে তাঁরা হনন কারখানার কারিগরদের ইয়ার দোস্তে পরিণত হয়েছেন। তাই জাতির বিবেক বলে কথিত মহান শিক্ষকদের কারো কারো মুখমণ্ডলের জল ছবিতে খুনি খুনি ভাবটা যদি জেগে থাকে তাতে আঁতকে ওঠার কোনো কারণ নেই। এটা পরিবেশের প্রভাব। তুখোর শীতের সময় সুঠাম শরীরের অধিকারী মানুষের হাত-পাগুলোও তো ফেটে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়টিতে কোনো কাজ অত সহজে হওয়ার কথা নয়। সহজে ভর্তি হওয়ার উপায় নেই, সহজে পাস করে ছাত্ররা বেরিয়ে যাবে সে পথ একরকম বন্ধ। এখানকার জীবন প্রবাহের প্রক্রিয়াটাই অত্যন্ত জটিল। এই জটিলতার আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে তরুণ-তরুণীর হৃদয়াবেগ পর্যন্ত টকে যাওয়া দুধের মতো ফেটে যায়। একজন তরুণ শিক্ষককে কোনো ছাত্রাবাসের আবাসিক শিক্ষকের রদ্দি মার্কা কাজটি পেতেও জুতোর সুখতলা ক্ষয় করে ফেলতে হয়। কোনো শিক্ষক যখন অবসর নেন, তাঁর বাসাটি দখল করার জন্য শিক্ষকদের মধ্যে যেভাবে চেষ্টা তদবির চলতে থাকে, কে কাকে ল্যাঙ মেরে আগে তালা খুলবে, সেটাও একটা গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারে। পরীক্ষার খাতা দেখার বেলায়, কে কার চাইতে বেশি খাতা হাতিয়ে নিয়েছে তা নিয়ে যে উত্তাপ, যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলতে থাকে তা একটা স্থায়ী অসুখ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বিনা যুদ্ধে নাহি দেগা সূচাগ্র মেদিনী' এটা একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদ বিনা প্রয়াসে বলতে গেলে একরকম স্বপ্ন দেখতে দেখতে উপাচার্যের আসনটি দখল করে বসবেন, সেই ঘটনাটি সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট করে ছেড়েছে। আবু জুনায়েদের স্ত্রী নুরুন্নাহার বানুর কাহিনীটিকে সঠিক বলে মেনে নিলে মাথা ঘামানোর বিশেষ প্রয়োজন পড়ে না। ধরে নিলাম সতীর ভাগ্যে পতির জয় হয়েছে। তারপরেও ভাগ্যচক্রের হাতিটি কোন্ পথ দিয়ে আবু জুনায়েদকে পিঠে করে বয়ে এনে এই অত্যুচ্চ আসনে বসাল তার একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করানো প্রয়োজন। তা নইলে নবীর মেরাজ গমন, যীশুর স্বর্গারোহণের মতো আবু জুনায়েদের ব্যাপারটি একটি অলৌকিক কাণ্ড বলে মেনে নিতে হবে।

দুই

শুরুতে আবু জুনায়েদের দুয়েকটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছি। কিন্তু ও থেকে আবু জুনায়েদ মানুষটি সম্বন্ধে কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত গঠন করা সহজ হবে না। পৃথিবীতে নিরীহ মানুষের সংখ্যাই অধিক। এমনকি আমাদের এ বিশ্ববিদ্যালয়টিতেও তাঁরা এখনো বিরল প্রজাতির প্রাণীতে পরিণত হয়ে যাননি। তত্ত্ব তালাশ করলে আরো দু' পাঁচজন এমন মানুষের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব হবে না। এই নিরীহ মানুষেরা এখনো পর্যন্ত কী করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশে কোনোরকম বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়া টিকে আছেন, সেটা কম আশ্চর্যের ব্যাপার নয়।

আবু জুনায়েদের দৈনন্দিন জীবনের ছকটা চলুন পর্যালোচনা করে দেখি। তিনি খুব সকালে বেলা পাঁচটার দিকে ঘুম থেকে উঠেই এক চক্কর হেঁটে আসেন। প্রাতঃভ্রমণ সেরে আসার পর গোসল করতে বাথরুমে ঢুকতেন। মেজাজ ভালো থাকলে কোনো কোনোদিন ফজরের নামাজটা পড়ে ফেলতেন। এমনিতে আবু জুনায়েদ নামাজি বান্দা ছিলেন না। তবে তাঁর একটা ধারণা গজিয়ে গিয়েছিল সকাল বেলার নামাজ দিয়ে শুরু করলে সারাটা দিন নির্ঝঞ্ঝাট কাটে। সব দিন এই নামাজ পড়ার নিয়মটা রক্ষা করতে পারতেন না। তাঁকে নামাজের বিছানায় দেখলে বেগম নুরুন্নাহার বানু বেজায় রকম ক্ষেপে যেতেন। ইদানীং নুরুন্নাহার বানুর মনে একটা সন্দেহের রেখা উঁকিঝুঁকি মারতে আরম্ভ করেছে। আবু জুনায়েদ যে ডিপার্টমেন্টটির শিক্ষক সেখানে বেশ কয়েকজন মহিলা শিক্ষিকা কাজ করেন। তাঁদের মধ্যে বেশ কজন সুন্দরী। এই সুন্দরীদের একজন আবার অবিবাহিতা। তাঁকে নিয়ে সব সময় নতুন নতুন গুজব রটতে থাকে। নুরুন্নাহার বানুর মনে একটি চাপা আশঙ্কা আছে। তাঁর স্বামীটি ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না। এই রকম দুর্বল শিরদাঁড়াসম্পন্ন মানুষেরাই খুব সহজে ডাকিনিদের খপ্পড়ে পড়ে যায়। নুরুন্নাহার বানুর বয়স বাড়ছিল এবং তলপেটে থলথলে মেদ জমছিল। এটা একটুও অস্বাভাবিক নয়। এরই মধ্যে নুরুন্নাহার বানু বুড়িয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু জুনায়েদ দেখতে এখনো তরুণ। মাথার একগাছি চুলেও পাক ধরেনি। নুরুন্নাহার বানুর সঙ্গে সঙ্গে আবু জুনায়েদের শরীরে কেন বার্ধক্য আক্রমণ করছে না, এটাই ছিল নুরুন্নাহার বানুর অসন্তোষের একটা বড় কারণ। নুরুন্নাহার বানু মনে করতে আরম্ভ করছিলেন, আবু জুনায়েদ নিশ্চয়ই অন্য কারো সঙ্গে একটা গোপন সম্পর্ক তৈরি করেছে এবং সেটাই তাঁর সতেজ সজীব

থাকার একমাত্র কারণ। নিয়মিত নামাজি না হয়েও যে আবু জুনায়েদ মাঝে-মাঝে ফজরের নামাজ পড়তেন, দেখে নুরুন্নাহার বানু মনে করতেন, তিনি যে তাঁকে সন্দেহ করছেন ওটা কেমন করে টের পেয়ে গেছেন, তাই কখনো সখনো নামাজের পাটিতে দাঁড়িয়ে তাঁর কাছে প্রমাণ করতে চাইছেন, দেখো আমি নামাজ পড়ি এবং আমার মনে প্রবল ধর্মবোধ বর্তমান, সুতরাং অন্য স্ত্রী লোকের ওপর আমি কোনো আসক্তি পোষণ করতে পারি নে। কিন্তু নুরুন্নাহার বানু মনে করতেন, আবু জুনায়েদ অন্য মেয়ে মানুষের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছেন সেটা গোপন করার জন্য মাঝে-মাঝে নামাজ পড়ে দেখিয়ে থাকেন। আসলে আবু জুনায়েদের এই লোক দেখানো নামাজ পড়া ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়। তাছাড়া অনেকদিন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বাস করে নুরুন্নাহার বানুর মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে এখানে মেয়ে পুরুষ মাঠে ছেড়ে দেয়া গরু মোষের মতো ঘুরে বেড়ায়, তাই যেকোনো সময়ে তারা যেকোনো কিছু করে ফেলতে পারে। সব মেয়ে মানুষ কি আর নুরুন্নাহার বানুর মতো!

যা হোক, আবু জুনায়েদ গোসল সারার পর নামাজ পড়ুন, না পড়ুন, নাস্তা খেতে বসতেন। নাস্তার পর পত্রিকার পাতায় চোখ বুলোতেন এবং সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় কলামগুলো ভালো করে পড়তেন। তারপর ধীরে-সুস্থে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। এ সময়ে কোনো উপলক্ষ নিয়ে নুরুন্নাহার বানু চটাচটি করলে তিনি মেজাজ খারাপ করতেন না। এ্যাটাচি কেসটা দুলিয়ে ডিপার্টমেন্টের দিকে হাঁটা দিতেন। ডিপার্টমেন্টে তিনি দেড়টা, কখনো কখনো দুটো অবধি কাটাতেন। বিভাগীয় মিটিং বা অন্য কোনো ব্যাপার থাকলে তাঁকে আরো দেরিতে ফিরতে হত। আবু জুনায়েদ যেদিন দেরিতে ফিরতেন, নুরুন্নাহার বানুর মেজাজ খিচিয়ে থাকত। তিনি মনে করতেন, আজ তাঁর স্বামী সে অবিবাহিতা শিক্ষিকার সঙ্গে লটর ফটর কোনো একটা কাণ্ড করেছেন, নইলে এত দেরি কেন?

ডিপার্টমেন্ট থেকে ফিরে এ্যাটাচি কেসটা টেবিলের ওপর রাখতেন, জামা কাপড় ছাড়তেন। তারপর খেতে বসতেন। যেদিন নুরুন্নাহার বানুর মেজাজ ভালো থাকত পাতে এটা সেটা তুলে দিতেন। পাশে বসে মাছি তাড়াতেন। মেজাজ খারাপ থাকলে রান্নাঘরে থালাবাসন, খুন্তি, হাঁড়ি নিয়ে প্রলয় কাণ্ড বাধিয়ে তুলতেন এবং আবু জুনায়েদের পেয়ারের মাদী বেড়ালটাকে ধরে আচ্ছা করে পেটাতেন। আবু জুনায়েদ ডানে বামে কোনো দিকে না তাকিয়ে খাবার গলাধঃকরণ করে যেতেন। খাওয়ার পর বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে হাতমুখ ধোয়ার পর শব্দ করে কুলি করে নিতেন। অবশেষে বিছানার ওপর শরীরটা ছেড়ে দিয়ে বেলা পাঁচটা অবধি ঘুমোতেন।

পাঁচটার পর ঘুম থেকে উঠে তিনি আবার ডিপার্টমেন্টের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। ছাত্রছাত্রীদের টিউটোরিয়াল খাতা দেখতেন, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করতেন, এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের রিপোর্ট লিখতেন। এসব করতে করতে সন্ধ্যে নেমে আসত। অন্য শিক্ষকেরা এই সময়টিতে ক্লাবে যেয়ে কেউ কেউ টেনিস

খেলতেন, কেউ কেউ দাবার সামনে বসে যেতেন। কেউ কেউ গোল হয়ে বসে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলুদ, ডোরাকাটা, বেগুনি দলের নির্বাচন নিয়ে তর্ক জুড়ে দিতেন। কে কাকে ডিঙিয়ে প্রমোশন পেলেন, কার ছেলেমেয়ে বখে যাচ্ছে, কে আধারাতে বউকে ধরে পেটায়, চাকরাণী মেয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে যেয়ে আচ্ছা নাকাল হয়েছে কে, সরকারি দলে নাম লিখিয়ে কে গুলশানের প্লট বাগিয়ে নিল ইত্যাকার বিষয় ক্লাবে নিত্যদিন আলোচিত হত। মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদকে কেউ কখনো ক্লাবের ধারেকাছেও ঘেঁষতে দেখেননি। সন্ধ্যাটি যখন গহন হয়ে নামত জুনায়েদ সেই পুরনো ব্যাগটি নিয়ে হেঁটে হেঁটে বাজারে চলে যেতেন।

তরিতরকারি, মাছ, মাংসের দোকানে গেলে আবু জুনায়েদ নতুন মূর্তি ধারণ করতেন। ডিপার্টমেন্টে, বাড়িতে, বিশ্ববিদ্যালয় পাড়া সর্বত্র আবু জুনায়েদ মিনমিনে স্বভাবের লোক বলে পরিচিত ছিলেন। কাঁচা বাজারে পদার্পণ করামাত্রই কোত্থেকে একটা পৌরুষ এসে তাঁর অস্তিত্বে ভর করত। লাল চোখ পাকিয়ে তরকারিঅলাকে ধমক দিতে একটুও ইতস্তত করতেন না। বলে বসতেন, মিয়া তোমার সাহস তো কম নয়, এই পচা পটলের কেজি চৌদ্দ টাকা দাবি করছ? তোমার জেল হওয়া উচিত। মাছঅলাকে বলে বসতে কসুর করতেন না, দেশে যদি আইন থাকত তোমার মতো মানুষকে বহু আগেই পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেত। কাঁটা পর্যন্ত পচে ভর্তা হয়ে গেছে, এমন মাছের চারগুণ দাম বেশি দাবি করছ। কশাইরা তো কশাই, ওদের সঙ্গে রাগারাগি করলে রাগের কোনো মূল্যই থাকে না, তাই আবু জুনায়েদ তাদের সম্পর্কে কোনো মন্তব্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতেন। তিনি মাংস বিক্রেতাদের ধারেকাছে যেতেন না, কারণ নুরুন্নাহার বানু মনে করতেন, আবু জুনায়েদের তাজা মাংস চিনে নেয়ার ক্ষমতা নেই। আবু জুনায়েদ রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক। রসায়ন বিষয়ক গবেষণাটা তিনি কাঁচা বাজারেই চালাতেন। কাঁচা বাজারের প্রায় সমস্ত দোকানদার নিত্যদিনের ওই মহামান্য খদ্দেরটাকে চিনে নিয়েছিল। এই ভদ্রলোকের হাঁক ডাক দরাদরির বহর এত প্রকাণ্ড ছিল যে যদি সম্ভব হত সকলে মিলে এই আবু জুনায়েদের বাজারে প্রবেশ বন্ধ করে দিত। দোকানদারদের সে রকম কোনো আইন পাস করার ক্ষমতা থাকলে আবু জুনায়েদের যাওয়া লাটে উঠত। পাক্কা তিনটি ঘণ্টা কাটিয়ে ব্যাগ ভর্তি বাজার নিয়ে তিনি বাড়িতে ফিরতেন। আসার সময় তিনি রিকশা চাপতেন। বাজারের ব্যাগ রান্নাঘরে রেখে বাথরুমে ঢুকে অনেকক্ষণ কোঁত কোঁত শব্দ করে সারা শরীর থেকে কাঁচা বাজারের স্পর্শদোষ মুছে ফেলতে চেষ্টা করতেন।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে তিনি বাড়িতে কাচা পাজামা পাঞ্জাবী পরে একটু ফুরফুরে হয়ে ওঠার চেষ্টা করতেন। টেলিভিশন খুলে বাংলা সংবাদটি মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। সংবাদ পরে যখন নতুন কোনো প্রোগ্রামের দিকে দৃষ্টি যোগ করতে চেষ্টা করতেন, সেই সময়ে নুরুন্নাহার বানু কিল চড় দিতে দিতে কলেজ পড়ুয়া মেয়েটিকে খাতা বইসহ আবু জুনায়েদের সামনে বসিয়ে দিতেন। অগত্যা আবু জুনায়েদকে

মেয়েটিকে ক্যালকুলাস এবং ইংরেজি ব্যাকরণের ট্যান্স, নাম্বার, জেন্ডার এসব শেখাতে হত। রাতের খাবার খেতে কোনোদিন দশটা বেজে যেত। খাওয়ার পর তিনি চুক চুক করে এক গ্লাস দুধ পান করতেন। তারপর বাতি নিভিয়ে বিছানায় ঘুমিয়ে পড়তেন। এই সময়ে নুরুন্নাহার বানু বাসি পাউরুটির মতো থলথলে শরীরখানা মেলে ধরে তাঁকে উস্কে তোলার চেষ্টা করতেন। সব দিন তিনি সাড়া দিতে পারতেন না এবং পাশ ফিরে ঘুমোতেন। নুরুন্নাহার বানু মনে করতেন সেই ডিপার্টমেন্টের ছেনাল শিক্ষিকার সঙ্গে সম্পর্কের কারণে ইদানীং আবু জুনায়েদ শয্যায় তাঁকে উপেক্ষা করতে আরম্ভ করেছেন। আবু জুনায়েদ ঘুমিয়েই নাক ডাকতে শুরু করতেন। নুরুন্নাহার বানু ভেতরে ভেতরে রাগে ফুঁসতে থাকতেন। আবু জুনায়েদের ঘুমটা গাঢ় হয়ে এলে ঠেলা দিয়ে তাঁকে জাগিয়ে দিয়ে গণ্ডারের মতো নাসিকা গর্জনের জন্য আধারাতে ঝগড়া লাগিয়ে এক ধরনের তৃপ্তি অনুভব করতেন। আবু জুনায়েদের শরীর লম্বা লম্বা কালো কালো লোমে ভর্তি ছিল। একবার তো ম্যাচকাঠি জ্বালিয়ে লোমের বনে আগুনই ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদের এ সকল অসঙ্গতি এগুলো কাল্পনিক হোক বা বাস্তব হোক বেগম নুরুন্নাহার বানু এবং কাঁচা বাজারের দোকানদারেরা ছাড়া অন্য কারো দৃষ্টিতে বিশেষ ধরা পড়েনি। তবে তাঁর বৃদ্ধ শ্বশুর তাঁর মনের ভেতর একটা চাপা ক্ষোভ পুষে রেখেছিলেন। তাঁর পয়সায় আবু জুনায়েদ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন। তিনি মনে করেন বিগত কয়েক বছর ধরে আবু জুনায়েদ যেভাবে কদমবুসি করেন, তাতে ভক্তি শ্রদ্ধার পরিমাণ যথেষ্টভাবে কমে এসেছে। কিন্তু একথা তিনি মুখ ফুটে কারো কাছে প্রকাশ করেননি। আবু জুনায়েদের দৈনন্দিন জীবনযাপন পদ্ধতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করে আমরা তাঁর মধ্যে সামান্য পরিমাণ দোষও আবিষ্কার করতে পারিনি। নুরুন্নাহার বানুর মৌন সন্দেহটুকুকে ধর্তব্যের মধ্যে আনাও উচিত নয় মনে করি। তার সবটাই কাল্পনিক। মেয়ে মানুষ ঘরে বসে থাকলে এবং নিজেকে ক্লান্ত করার প্রচুর কাজ না থাকলে, মাথার উকুনের মতো মনের মধ্যে সন্দেহের উকুন বাসা বাঁধতে থাকে। তরকারিঅলা, মাছঅলা এদের মতামতের কী দাম। তারা তো অহরহ নিরীহ নাগরিকদের পকেট কাটছে।

এই পর্যায়ে মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদের একটি বিশেষ প্রবণতার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। এটাকে দোষ বলব বা গুণ বলব এখনো স্থির করে উঠতে পারিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি ছাটার সময় আবু জনায়েদ সাভার, আমিন বাজার, জয়দেবপুর, মাওয়া শহরতলী এসকল অঞ্চলে জমির দালালদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন। অল্প পয়সায় অধিক জমি কোথায় পাওয়া যায় এবং কীভাবে কেনা যায় সে ধান্ধায় মত্ত হয়ে থাকতেন। জমি কেনার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে মগজে নেশার মতো প্রবেশ করেছিল। তার দৈনন্দিন জীবনযাপন পদ্ধতির মধ্যে ওই একটি বিষয় যেখানে তিনি কোনো শাসন বারণ মানতেন না। আবু জুনায়েদের মনে একটা পেশাগত অহঙ্কার ছিল। সেটা চাপা থাকত। তবু তাঁর যে সমস্ত সহকর্মী নানা

প্রতিষ্ঠানে পরামর্শক জরিপকারকের কাজ করে টাকা-পয়সা করে লাল হয়ে যাচ্ছেন, আবু জুনায়েদ তাঁদের সম্পর্কে নীচু ধারণা পোষণ করতেন। মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলার অভ্যাস নেই বলে এ-কথাটিও কাউকে বলা হয়নি। তাঁর স্বভাবের মধ্যে পেশাগত অহঙ্কারের সঙ্গে যোগ হয়েছিল একটা জেদ। আবু জুনায়েদ মনে করতেন, তাঁর সহকর্মীরা অনৈতিক উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করে যে টাকা-পয়সা আয় করেন, তিনি সৎ ভাবে চেষ্টা করে অনেক বেশি টাকার মালিক হতে পারবেন। তিনি মনে করতেন, ওই জমিকে আশ্রয় করে একদিন তাঁর ভাগ্য খুলে যাবে। নিশ্চয়ই কোথাও নামমাত্র মূল্যে তাঁর জন্য প্রচুর পরিমাণ জমি অপেক্ষায় আছে। তাঁর কাজ হল খুঁজে বের করা। খুনোখুনি কিংবা অন্যরকম গণ্ডগোলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেলে আবু জুনায়েদ ভীষণ খুশি হয়ে উঠতেন। দালালদের নিয়ে তিনি দূর দূর অঞ্চলে জমির সন্ধানে পাড়ি জমাতেন। তাঁর বাড়িতে নানা আকার নানা প্রকারের দালাল হরহামেশা লেগেই থাকত। তাদের কারো কারো পায়ে রবারের পাম্প সু, মুখে গুছি দাড়ি। কেউ ছাতাটি বগলে নিয়ে গুটি গুটি পায়ে ড্রয়িং রুমে হানা দিত। আবু জুনায়েদ এ ধরনের লোকদের ভারি সমাদর করতেন। পরীক্ষার প্রশ্ন করে, খাতা দেখে, অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগত পরীক্ষক হিসেবে যেয়ে মাস মাইনের বাইরে যে টাকা তিনি আয় করতেন, প্রায় তার সবটাই দালালদের সেবায় ব্যয় করতেন। পারলে মাস মাইনের টাকাটাও দালালদের পেছনে ঢেলে দিতেন। সেটি সম্ভব হয়নি। কারণ, সব টাকাটা নুরুন্নাহার বানুর হাতে তুলে দিতে হত। দৈনন্দিন হাত খরচ টাকাটাও তাঁকে স্ত্রীর কাছ থেকে চেয়ে নিতে হত। দশটা টাকা বেশি দাবি করলে দশ রকম জেরার সম্মুখীন হতে হত।

তিন

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়টির ছিল গৌরবময় অতীত। অনেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে গোটা দেশের আত্মার সঙ্গে তুলনা করে গর্ব বোধ করতেন। এখানে মহান ভাষা আন্দোলন জন্ম নিয়েছে। যুগ যুগ ধরে অবদমিত ইতিহাসের উষ্ণ নিঃশ্বাসের মতো এখান থেকে মুক্তিযুদ্ধের আগুন সমগ্র ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছে। মুক্তি সংগ্রামের জ্বালামুখ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে বিশ্ববিদ্যালয়।

অতীতের গৌরব গরিমার ভার বইবার ক্ষমতা বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই। সম্প্রতিককালে নানা রোগ ব্যাধি বিশ্ববিদ্যালয়টিকে কাবু করে ফেলেছে। মাছের পচন যেমন মস্তক থেকে শুরু হয়, তেমনি যাবতীয় অসুখের জীবাণু শিক্ষকদের চিন্তা-চেতনায় সুন্দরভাবে স্থান করে নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্বরজারি, ধনুষ্টঙ্কার নানা রকমের হিস্টিরিয়া ইত্যাকার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাধিগুলো শিক্ষকদের ঘায়েল করেছে সবচাইতে বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় বারশ শিক্ষক। এখন শিক্ষকসমাজ বলতে কিছু নেই। আছে হলুদ, ডোরাকাটা, বেগুনি এসব দল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা কব্জা করার জন্য দলগুলো সম্ভব হলে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হত। মাঠ এবং রাস্তা ছাত্রেরা দখল করে রেখেছে বলে শিক্ষকদের লড়াইটা স্নায়ুতে আশ্রয় করে নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে বেশি প্যাঁচাল পাড়লে মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদের উপাচার্য হওয়ার উপাখ্যানটি অনাবশ্যক লম্বা হয়ে যায়।

সেই বছরটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে ডোরাকাটা দলটি নির্বাচিত হওয়ার খুবই সম্ভাবনা ছিল। আবু জুনায়েদের সঙ্গে এই দলের একটা ক্ষীণ সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। আবু জুনায়েদ নির্বিরোধ শান্তশিষ্ট মানুষ। দলবাজি তাঁর মতো ধাতের মানুষের পোষায় না। তারপরেও আবু জুনায়েদ কীভাবে যুক্ত হয়ে গেলেন। বলা যেতে পারে আবু জুনায়েদের ভাগ্য তাঁকে দলের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তথাপি পেছনে ছোট্ট একটা কাহিনী আছে। রসায়ন বিভাগের অবিবাহিতা সুন্দরী শিক্ষিকাটি পুরুষ মানুষদের সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলে বিরক্ত হয়ে গেলে অধিকতর উত্তেজনাপূর্ণ কোনো কিছুর মধ্যে নিজেকে ঢেলে দিতেন। এরকম ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে। ভদ্রমহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমানে যে উপাচার্য ভদ্রলোকটি আসীন আছেন, তাঁর পেয়ারের এক সুদর্শন শিক্ষকের প্রেমে আকণ্ঠ ডুবে

গিয়েছিলেন। সকলকে বলাবলি করতে শোনা যেত এবার দিলরুবা খানমের একটা হিল্লে হয়ে যাবে। হঠাৎ করে বলা নেই কওয়া নেই, ভদ্রলোক শিল্প মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারির অল্প বয়েসী এক কন্যাকে বিয়ে করে ফেললেন। এই ঘটনাটি দিলরুবা খানমকে এক রকম ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। তিনি সপ্তাহখানেক ক্লাসে আসেননি। আঘাতের ধকলটা হজম করতে একটু সময় নিয়েছিল। পরে দিলরুবা খানম জেনেছিলেন ওই সেক্রেটারি ভদ্রলোকের সঙ্গে উপাচার্যের কী ধরনের আত্মীয়তা ছিল। তিনিই বিয়েটা ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। দিলরুবা খানমের সমস্ত ক্ষোভ রাগ ওই উপাচার্যকে উপলক্ষ করে ফুঁসে উঠতে থাকল। তিনি সর্বত্র বলে বেড়াতে লাগলেন এই দুর্নীতিবাজ আবু সালেহ্‌কে আসন থেকে টেনে ফেলে না দিলে এই বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হয়ে যাবে। উপাচার্য ছিলেন হলুদ দলের মনোনীত প্রার্থী। হলুদ দল ছাড়া বাদামি দলের শিক্ষকেরাও তাঁকে সমর্থন করতেন। দিলরুবা খানম কিছুদিনের মধ্যে একটা অসম্ভবকে সম্ভব করে তুললেন। হলুদ দলের সমর্থক বাঘা শিক্ষকদের ডোরা কাটা দলে নিয়ে এলেন। দিলরুবা খানমের মুখে ওই এক কথা। বর্তমান উপাচার্য অথর্ব, অশিক্ষিত, দুর্নীতিবাজ। তাঁকে ঝেড়ে ফেলে দিতে না পারলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘাস গজাবে না। অবশ্য বাঘা বাঘা শিক্ষকেরা একেবারে নিজের নিজের কারণে ডোরা কাটা দলে যোগ দিয়েছেন। বর্তমান উপাচার্য নিজের পেটোয়া লোক ছাড়া কারো প্রত্যাশা পূরণ করেননি। এই দলছুট শিক্ষকদের কেউ আশা করেছিলেন, উপাচার্য সাহেব তাঁকে একটা চার রুমের ফ্ল্যাট বরাদ্দ করবেন। কেউ আশা করেছিল, বিদেশ যাবার সুযোগ দেবেন। কেউ প্রত্যাশা করতেন তাঁর আদরের দুলালীটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পাবে। কিন্তু মুহম্মদ আবু সালেহ একে ওকে সবাইকে নিরাশ করেছেন। তাই তাঁরাও একে একে ক্ষমতার বলয় থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। দিলরুবা খানমের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতিতে কোনো মহিলা শিক্ষককে এমন অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়নি। তরুণ শিক্ষকদের অনেকে মনে করতেন, শিক্ষক বাহিনীতে একজন মহিলা অগ্রণী ভূমিকা পালন করায় শিক্ষক রাজনীতিতে একটা নতুন মাত্রা যোগ হল। দেশের প্রধানমন্ত্রী মহিলা, বিরোধী দলীয় নেত্রী মহিলা, সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রাজনীতিতেও একজন মহিলা যদি নেতৃত্ব দিতে ছুটে আসেন এই চরাচরপ্লাবী নারী জাগরণের যুগে এই ঘটনাটিকে অত্যন্ত সঙ্গত ও স্বাভাবিক বলে ধরে নিতে হবে।

সুন্দরী মহিলার স্বভাবের খুঁত, দুর্বলতা যখন প্রকাশ পায় তখন তার পুরুষ মানুষকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা অনেক গুণ বেড়ে যায়। বেচারী আবু জুনায়েদ তাঁর সুন্দরী এবং স্খলিতস্বভাবা সহকর্মী মহিলাটির আকর্ষণে মুগ্ধ হয়ে ডোরাকাটা দলের সমর্থকে পরিণত হয়েছিলেন। শুধু একজন নীরব সমর্থক, তার বেশি কিছু হওয়ার ক্ষমতা মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদের ছিল না। এখন দেখা যাচ্ছে আবু জুনায়েদের ধর্মপত্নী রাতের বেলা তাঁর পাশে ঘুমিয়ে মনের মধ্যে যে সন্দেহটি নাড়াচাড়া

করতেন, সেটি একেবারে অমূলক নয়। আবু জুনায়েদ যদি দিলরুবার টানে আকৃষ্ট হয়ে ডোরাকাটা দলে যোগ না দিতেন তাঁর উপাচার্য হওয়ার প্রশ্নই উঠত না। তাহলে একথা থেকে আরেকটি কথা বেরিয়ে আসে। আবু জুনায়েদের স্ত্রী নুরুন্নাহার বানু সকলের কাছে যে দাবি করে বেড়াচ্ছেন, তাঁর ভাগ্যে আবু জুনায়েদের ভাগ্য খুলেছে সেটা সত্যি নয়। এতে দিলরুবা খানমের হাত ছিল। আবু জুনায়েদের উপাচার্য হওয়ার ঘটনাটিকে যদি আল্লাহর কেরামত বলে মেনে নিই, আমরা বেহুদা কল্পনা করার কষ্ট থেকে রেহাই পেয়ে যাই। আল্লাহ নুরুন্নাহার বানুর খসম আবু জুনায়েদকে উপাচার্য বানাবার জন্য দিলরুবা খানমের হাবুডুবু খাওয়া প্রেমকে নষ্ট করে দিয়ে তাঁকে শিক্ষক রাজনীতিতে টেনে এনেছিলেন। শুধু এটুকু বললে আল্লাহর লীলাখেলার সূক্ষ্ম কেরামতির কথা সঠিকভাবে বর্ণনা করা হয় না। আল্লাহ যে বিশ্বজগতের সমস্ত রহস্য নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং তাঁর ইঙ্গিতে যে সবকিছু ঘটে, সেটা প্রাঞ্জলভাবে উপলব্ধি করার জন্য আরো কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন।

ডোরাকাটা দলে যেসব সিনিয়র শিক্ষক এসে যোগ দিয়েছিলেন, শুরুর দিকে সকলের বুলি ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঁচাতে হবে, প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে এবং সর্বক্ষেত্রে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আর জুনিয়র শিক্ষকদের যাতে তাড়াতাড়ি প্রমোশন হয় এবং তাঁরা তাড়াতাড়ি বিদেশ যেতে পারেন সে ব্যবস্থাটিও নিশ্চিত করতে হবে। এগুলো তো হল নির্বাচনী দাবি। কিন্তু প্রার্থী মনোনয়নের বেলায় একটা মস্ত ঘাপলা দেখা দিল।

এবারের নির্বাচনে ডোরাকাটা দলের জয়লাভ করার সমূহ সম্ভাবনা। এই দলের ভেতর থেকে তিনজন যোগ্য ব্যক্তিকে প্রার্থী হিসেবে বেছে নিয়ে তিনজনের একটি প্যানেলকে মনোনয়ন দিতে হবে। এই তিনজনের প্যানেল ঠিক করার সময় শুরু হল আসল গণ্ডগোল। সাম্প্রতিককালে প্রায় বার জন ঝুনো প্রফেসর ডোরাকাটা দলের সমর্থক। তাঁদের প্রত্যেকেই মনোনয়ন পেতে ভীষণ রকম আগ্রহী। সকলেই মনে করেন, তাঁর মতো যোগ্য প্রার্থী পূর্বে কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেননি। প্রায় সকলেই মনে করেন বিশ পঁচিশ বছর ধরে শিক্ষকতার মহান ব্রতে নিযুক্ত আছেন, অবসর নেয়ার পূর্বে উপাচার্যের চেয়ারটিতে একটা পাছা ঠেকাতে পারলে নিঃস্বার্থ জ্ঞান সেবার একটা স্বীকৃতি অন্তত মিলে। এই জ্ঞানবৃদ্ধ মহান শিক্ষকদের মধ্যে এ নিয়ে এত ঝগড়াঝাটি হতে থাকল যে সকলে আশঙ্কা পোষণ করতে লাগলেন ডোরাকাটা দলটিই না আবার তিন টুকরো হয়ে যায়। আগের জমানা হলে তলোয়ার দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিদের মাথা কেটে নিজেকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করতেন। কিন্তু মুশকিলের ব্যাপার হল নিজে নিজে ঘোষণা করে প্যানেলভুক্ত প্রার্থী হওয়া সম্ভব নয়। তার জন্য দলের স্বীকৃতি অর্জন করতে হয়। দলের কর্তা ব্যক্তিদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তাঁরা কিছুতেই সিনিয়র শিক্ষকদের একটা আপোস মীমাংসায় টেনে আনতে পারলেন না। দিনে রাতে মিটিং করেও কোনো গ্রহণযোগ্য ফর্মূলা বের করা সম্ভব হল না। বুড়ো প্রফেসররা নিজ

নিজ অবস্থান এমন দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে রইলেন যে বিরক্ত জুনিয়র শিক্ষকেরা তাঁদের কাছে যাওয়া আসা ছেড়ে দিয়ে যার যার ঘরে ফিরে যাওয়ার কথা চিন্তা করছিলেন। সকলে আবার বলাবলি করতে থাকলেন আবু সালেহ্ আরো এক টার্মের জন্য উপাচার্য থেকে যাবেন। ডোরাকাটা দলটাকে বুড়ো প্রফেসররা পাংচার করে দিয়েছেন। সুতরাং আবু সালেহর দল এবারও বিনা বাধায় নির্বাচিত হয়ে যাচ্ছে। ডোরাকাটা দল পনের দিনব্যাপী ঝগড়া ঝাটির কারণে ভেঙে চার টুকরো হয়ে গিয়েছিল প্রায়। কিন্তু দিলরুবা খানম এবারেও তাঁর ম্যাজিকটা অব্যর্থভাবে প্রয়োগ করলেন।

তিনি রিকশা করে তরুণ শিক্ষকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদের বুঝিয়ে সুজিয়ে এনে জড়ো করলেন। দলীয় ঐক্যটাকে ভেতর থেকে মজবুত করে তুললেন। তারপর তরুণ শিক্ষকদের দিয়ে ঘোষণা করালেন যে সমস্ত সমর্থকদের দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে। যিনি স্বেচ্ছায় মেনে নেবেন না তাঁকে দল থেকে বের করে দেয়া হবে। এই ঘোষণাটা ভয়ানকভাবে কাজ দিল। জ্ঞানবৃদ্ধ প্রফেসরদের আস্ফালন আপনা থেকেই থেমে গেল। এত পানি ঘোলা করার পরে আবু সালেহ্র দলে গিয়ে যে জুটবেন, সে পথও খোলা নেই। অগত্যা দলীয় সিদ্ধান্তের জন্য চুপ করে অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। ডোরাকাটা দলের সমর্থকেরা বৈঠকের পর বৈঠক করে প্যানেলের জন্য দুজন মানুষকে বেছে নিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজে তাঁদের মোটামুটি সুনাম আছে। তাঁরা প্রতিপক্ষকে খুন করে নিজেরা মনোনীত হওয়ার উগ্র আকাঙ্ক্ষা বিশেষ ব্যক্ত করেননি। দুটি নাম তো পাওয়া গেল। কিন্তু তৃতীয় নামটির বেলায় তারা মস্ত ফাঁপড়ে পড়ে গেলেন। সমস্ত ডোরাকাটা দলে আর একটিও মানুষ নেই, যাঁকে মনোনয়ন দিলে দলে বিতর্ক সৃষ্টি হবে না। মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদকে মনোনয়ন দিলে কোনো বিতর্ক হত না, এটা সকলেই জানতেন। কিন্তু তাঁর কথা একটিবারও কারো মনে আসেনি। তিনি প্রফেসর বটে, বিদেশের নামকরা একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রিও আছে। ছাত্রী কিংবা সহকর্মী কাউকে নিয়ে লটর ফটর করার অপবাদও কেউ তাঁকে দিতে পারবেন না। পরীক্ষার খাতা দেখার বেলায় তিনি মোটামুটি নিরপেক্ষতা মেনে চলেন। ডোরাকাটা দলের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নাম কারো মনে আসেনি, কারণ তাঁর মতো গোবেচারা মানুষের নাম উপাচার্যের জন্য বিবেচিত হতে পারে, এটা কেউ স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারেননি। এদিকে সময় বয়ে যাচ্ছিল। আজকের রাতটাই সময়। আগামী কাল সকাল দশটার মধ্যে তিনজন প্রার্থীর প্যানেল ঘোষণা দিতে হবে। তারপর নির্বাচন হবে। তৃতীয় নামটির জন্য দলের মধ্যে আবার উৎকণ্ঠা ঘনীভূত হয়ে উঠল। একজন প্রবীণ শিক্ষক তো মন্তব্যই করে বসলেন, চলুন ফেরা যাক। এবারেও আবু সালেহ্র কাছে আমরা হেরে গেলাম। ডোরাকাটা দলের ভাগ্য চিকন সুতোয় ঝুলছিল। এই শেষ মুহূর্তটিতে দিলরুবা খানম আবার ত্রাণকর্ত্রীর বেশে এসে দেখা দিলেন। প্রবীণ শিক্ষক ড. সারোয়ারের মুখ থেকে কথা টেনে নিয়ে বললেন, আমরা আবু সালেহ্র

কাছে হার মানব কেন, আর ফিরেওবা যাব কেন। দিন এক টুকরো কাগজ, আমি তৃতীয় প্রার্থীর নাম লিখে দিচ্ছি। তারপর নিজে ভ্যানিটি ব্যাগের চেন খুলে ডায়েরি বের করে একটা বাতিল খাতা ছিঁড়ে একটানে মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদের নামটা লিখে দিয়েছিলেন। পড়ে ও ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। দুয়েকজন হাসি চাপতে পারলেন না। ড. সারোয়ার মহা বিরক্ত হয়ে বলে বসলেন, এটা কী করলেন? দিলরুবা খানম চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, এটা হল গিয়ে আপনার তিন নম্বর নাম। আমাদের তিনটি নামের একটি প্যানেল দেয়ার কথা। সে তিনটি নাম পুরো হল। আর কোনো কথা নয়। এখন যে যার ঘরে চলে যেতে পারেন। সকলে এত ক্লান্ত এবং বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে আর কথা বাড়ানো উচিত মনে করলেন না।

ডোরাকাটা দল নির্বাচনে জয়লাভ করেছিল। অবশ্য আবু জুনায়েদ কম ভোট পেয়েছিলেন। চ্যান্সেলর আবু জুনায়েদকে উপাচার্য হিসেবে অনুমোদন দিয়েছিলেন, সে খবরটাকে ভিত্তি করেই কাহিনীটি তৈরি হয়েছে। সুতরাং এ নিয়ে আর বাক্য ব্যয়ের প্রয়োজন নেই। নুরুন্নাহার বানুর ভাগ্য, নাকি দিলরুবা খানমের হস্তক্ষেপ, নাকি চ্যান্সেলরের অনুমোদন অথবা এসব কিছুর মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছের গূঢ় বিজয় সূচিত হয়েছে বলা অত সহজ নয়। তবে খুব গোপন একটি তথ্য আমাদের হাতে এসেছে। গোয়েন্দা রিপোর্টে জানানো হয়েছিল, আবু জুনায়েদ সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করা দূরে থাকুক, জীবনে সভা-সমিতির ধার দিয়েও যাননি।

চার

ব্রিটিশ স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শন উপাচার্য ভবনটিতে নুরুন্নাহার বানু, কলেজগামী কন্যা এবং ছোকড়া চাকরটি নিয়ে উঠে আসার পর মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদ পূর্বে চিন্তা করেননি এমন কতিপয় অসুবিধের সম্মুখীন হতে থাকলেন। উপাচার্য ভবনে পা দিয়েই নুরুন্নাহার বানু এমন সব মন্তব্য করতে থাকলেন সেগুলো আবু জুনায়েদের মতো গোবেচারা স্বামীর পক্ষেও পরিপাক করা একটু কঠিন হয়ে দাঁড়াল। মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদ মনেপ্রাণে নিজেকে বদলে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন। নিজের ওপর আস্থার অভাব ছিল, সেটুকু কাপড়চোপড় দিয়ে চাপা দেয়ার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করছেন না। উপাচার্য হিসেবে প্রথম মাসের মাইনেটি পাওয়ার পূর্বেই দু'দুজোড়া স্যুট তিনি শহরের সেরা টেইলারিং হাউস থেকে আর্জেন্ট অর্ডার দিয়ে বানিয়ে নিয়েছেন। এক ডজন নানা রঙের টাই সংগ্রহ করেছেন। আবু জুনায়েদ মাঝে-মধ্যে ধূমপান করেন। কিন্তু শুনেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজ উপাচার্য লরেন্স সাহেব সব সময় পাইপ টানতেন। পাইপ মুখে থাকলে লরেন্স সাহেবের মুখমণ্ডল ভেদ করে আশ্চর্য একটা ব্যক্তিত্বের প্রভা বিকীরিত হত। তিনি সামনের দেয়ালে উপাচার্যের প্রতিকৃতিসমূহের মধ্য থেকে পাইপ মুখে দণ্ডায়মান লরেন্স সাহেবের সঙ্গে মনে মনে নিজের তুলনা করছিলেন। টানতে পারবেন কি না বলতে পারবেন না তথাপি তিনটি পাইপ এবং টোবাকোও তিনি কিনে ফেলেছেন। ঘোড়ার রেস খেলার জকিদের পোশাক থাকে, ফুটবল ক্রিকেট খেলোয়াড়েরাও নিজেদের পোশাক পড়ে। এমনকি মসজিদের ইমামেরও একটা বিশেষ পোশাক আছে, যা পড়লে চেনা যায় ইনি একজন ইমাম সাহেব, কোর্টের উকিল জজদের তো কথা নেই। সুতরাং উপাচার্যের নিজের একটা পোশাক থাকবে না কেন? বিশ্ববিদ্যালয় বিধিমালায় না থাকুক তিনি নিজেকে বিশেষ পোশাকে মডেল উপাচার্য হিসেবে হাজির করবেন।

আবু জুনায়েদের মধ্যে যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চলছিল এই প্রক্রিয়াটিতে নুরুন্নাহার বানু একটা মূর্তিমান বাধা হয়ে দেখা দিলেন। আবু জুনায়েদ দুরকম সঙ্কটের মধ্যে পড়ে গেলেন। দিলরুবা খানম যদি হস্তক্ষেপ না করতেন, চেষ্টা চরিত্র করে হয়ত মাতৃগর্ভে প্রবেশ করতে পারতেন। কিন্তু উপাচার্য হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। দিলরুবা খানম এই মেন্দা মারা মানুষটির সাজ পোশাকের বহর দেখে

সকলের কাছে তাঁকে দরজির দোকানের ডামি বলে বেড়াতে আরম্ভ করেছেন। এই মহিলা যিনি বলতে গেলে একবারে অবজ্ঞেয় অবস্থা থেকে তাঁকে উপাচার্যের চেয়ারটিতে হাতে ধরে বসিয়ে দিয়েছেন, তাঁর মতামতের নিশ্চয়ই মূল্য আছে।

এদিকে নুরুন্নাহার বানু ভিন্ন রকম উৎপাত শুরু করে দিয়েছেন। উপাচার্য ভবনে পা দেয়া মাত্রই এমন সব কাজ করতে লাগলেন এবং এমন সব মন্তব্য ছুড়তে থাকলেন, পদে পদে আবু জুনায়েদকে নাকাল হতে হচ্ছিল। সকাল বেলা উপাচার্য ভবনে প্রবেশ করেছেন, সেই বিকেলেই ড্রয়িং রুমে কয়েকজন জুনিয়র শিক্ষককে নিয়ে চা খেতে বসেছেন। এই সময়টিতে একজন জুনিয়র শিক্ষককে ডেকে মন্তব্য করে বসলেন, আচ্ছা ওই বাড়িটার ছাদ অত উঁচু করা কি ঠিক হয়েছে? আর দেয়ালগুলোও অত পুরো কেন? অনর্থক অনেক টাকার বাজে খরচ করা হয়েছে। অনায়াসে দোতলা বানানো যেত। দেখুন না দেয়ালগুলো কী রকম পুরু। একটু কম পুরু করে বানালে তিনটা বাড়ি বানানো যেত। একজন মাঝবয়েসী শিক্ষক নুরুন্নাহার বানুকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন, বেগম সাহেবা এটা এক ধরনের বাড়ির নির্মাণ পদ্ধতি। এটাকে গথিক বলা হয়। এই ধরনের বাড়িগুলো এরকমই হয়ে থাকে। নুরুন্নাহার বানু মনে করলেন, শিক্ষকটি সকলের সামনে তাঁকে হেয় করার জন্য গথিক ধাঁচের কথা বলেছেন। তিনি মনে করলেন, এটা এক ধরনের অপমান। তিনি জবাব দিলেন, আপনি কি মনে করেন, আমি দালান কোঠার কিছুই বুঝিনে, আমার আব্বা সারা জীবন ঠিকাদারি করেছেন, এখনো আমার ভাই সি. এ্যান্ডবি, হাউজিং কর্পোরেশন এবং রোডস এ্যান্ড হাইওয়েজের ফার্স্ট ক্লাস কন্ট্রাক্টর। আমাকে আপনার বাড়ি চেনাতে হবে না। জবাব শুনে সকলকে চুপ করে যেতে হল। তারপরে কথার গতি কোনদিকে যেত বলা যায় না। চারজন ডীন গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে তাঁকে ফুলের তোড়া দিয়ে অভিনন্দন জানাতে এলেন। উনারা সকলে ডোরাকাটা দলের সমর্থক। আগে যদি তাঁদের জানা থাকত আবু জুনায়েদ মিয়া তাঁদের কাঁধের ওপর পা রেখে উপাচার্য হয়ে বসবেন এবং তাঁদের ফুলের তোড়া দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে হবে, তাহলে কাঁচা বাজারের থেকে ফেরার পথে তাঁকে খুন করে লাশ গুম করে ফেলতে ইতস্তত করতেন না। যা হোক, প্রবীণ শিক্ষকদের আগমনে পরিবেশ আবার হাল্কা হয়ে এল।

সন্ধ্যেবেলা বেয়ারারা সবগুলো কক্ষের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। পয়লা নুরুন্নাহার ভাবলেন, অত আলোর কী দরকার। বেহুদা মোটা বিল আসবে। নিজ হাতে নিভিয়ে দিতে গিয়ে থেমে গেলেন। জ্বলুক বাতি জ্বলুক। তাঁদের তো আর বিল দিতে হবে না। বাতি জ্বালাবার পর তাঁর চোখে একটা নতুন জিনিস ধরা পড়ল। উপাচার্য ভবনের রুমগুলো সত্যি প্রকাণ্ড। আবু জুনায়েদের ঘাড়ে ঠেলা দিয়ে বললেন, দেখেছ কত বড় একেকটা রুম। ফুটবল নিয়ে এসো। সারা দিন ঘরের মধ্যে ফুটবল খেলবে। টুটুল তাদের নাতি। কথাটা নুরুন্নাহারের মনে ভীষণ ধরে গেল। স্বামী-স্ত্রী দুজন ঠিক করলেন, রেবাকে তার বর এবং টুটুলসহ এসে কিছুদিন

থেকে যাওয়ার জন্য খবর দেয়া হবে। প্রস্তাবটি শুনে নুরুন্নাহার বানু উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। এতদিনে তাঁর প্রাণপ্রিয় নাতিটির হেসে খেলে বেড়াবার একটা ব্যবস্থা হল।

তারপর আবু জুনায়েদ এবং নুরুন্নাহার বেডরুমে গিয়ে ঢুকলেন। মেহগনি কাঠের কারুকার্য করা খাট দেখে নুরুন্নাহার বানুর খুশিতে একেবারে ফেটে পড়ার অবস্থা। দেখেছ দেখেছ কত বড় খাট, আর কী সুন্দর! তারপর গলায় একটা কৃত্রিম বিষণ্নতা সৃষ্টি করে বললেন, কিন্তু মুশকিলের কথা হল কী জানো, এই এতবড় খাটে ঘুমালে আমি অন্ধকারে তোমাকে খুঁজে বের করতে পারব না। নুরুন্নাহার বানুর জবাব দিতে গিয়ে আবু জুনায়েদ একটা বেফাঁস কথা বলে ফেললেন। খুঁজে পেয়েও লাভ কী? তোমার কী আছে? কথাটি মুখ থেকে কেমন করে বেরিয়ে এল জুনায়েদ টেরও পাননি। নুরুন্নাহার বানু সাপিনীর মতো উদ্যত ফণা তুলে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন, কী বললে তুমি?

আবু জুনায়েদ বুঝতে পারলেন, ভারি অন্যায় করেছেন। এখন বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। তিনি তাড়াতাড়ি বেডরুম থেকে বেরিয়ে ড্রয়িং রুমে চলে এলেন এবং বেয়ারাকে বললেন, ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলো। ড্রাইভার গাড়ি বের করলে আপাতত তিনি পালিয়ে বাঁচলেন।

নুরুন্নাহার বানু কিছুক্ষণ স্থানুর মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই প্রথম অনুভব করলেন আবু জুনায়েদের জিহ্বায় অতি অল্প সময়ে শান পড়তে আরম্ভ করেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আয়নার দিকে তাকালেন। নিজের ছবি দেখে ঘুষি মেরে আয়নাটা ভেঙে ফেলার ইচ্ছে হচ্ছিল। এই সময়ে ড্রয়িং রুমে টেলিফোনটা বেজে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি নুরুন্নাহার বানু টেলিফোনটা ধরে জিজ্ঞেস করলেন :

হ্যালো কে কথা বলছেন?

ওপার থেকে নারীকণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এল, ভি . সি . স্যার আছেন?

না, নেই, খুব ভারী এবং গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন নুরুন্নাহার বানু।

কবে পাওয়া যাবে?

কেন আপনার কী দরকার?

আমি তাঁর ডিপার্টমেন্টের একজন কলিগ, একটু কথা ছিল। ওপার থেকে জবাব এল।

কী নাম আপনার?

আমার নাম দিলরুবা খানম।

নামটি শোনামাত্র নুরুন্নাহার বানু টেলিফোনে চিৎকার করে উঠলেন :

আমার স্বামীর সঙ্গে, আপনি রাতের বেলা কী কথা বলতে চান? শুনুন দিলরুবা খানম, আপনাকে আমি চিনি। ঘাড় মটকানোর মতো অনেক যুবক পুরুষ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের কারো একজনের ঘাড়ে বসুন, আমার সংসারটির এমন সর্বনাশ করবেন না। আর কথা নয়। টেলিফোন রাখলাম।

উপাচার্য ভবনের প্রথম রাতটি আবু জুনায়েদের জন্য ছিল অগ্নি পরীক্ষার রাত। রাত দশটার দিকে বাইরে থেকে ফিরে এসে দেখেন ঢাকা দেয়া ভাত তরকারি পড়ে আছে। নুরুন্নাহার বানু ছুঁয়েও দেখেননি। আবু জুনায়েদের বুকটা কেঁপে গেল। সরাসরি বেডরুমে প্রবেশ করতে সাহস হল না। তিনি বাঁ দিকে বাঁক ঘুরে মেয়ের ঘরে গেলেন।

জিজ্ঞেস করলেন, তুমি খেয়েছ দীলু?

হ্যাঁ বাবা কবে। মেয়ে জবাব দিল।

তোমার মা খায়নি কেন বলতে পারো, অসুখ-বিসুখ করেনি তো?

আব্বা মেজাজ খারাপ করাটাই মার স্বভাব। কী হয়েছে আমি বলতে পারব না। এসব তোমাদের ব্যাপার, তোমরা দেখবে। আমাকে টানতে চেষ্টা করছ কেন? আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে, আমি এখন ঘুমোব।

অগত্যা আবু জুনায়েদকে বেডরুমে প্রবেশ করতে হল। দেখেন নুরুন্নাহার বানু মেহগনি কাঠের অপূর্ব কারুকার্যময় খাটে বাঁকা হয়ে শুয়ে আছেন। তিনি কপালে হাত দিলেন। জ্বরজ্বারি কিছু নয়। অসুখটা অন্য জায়গায়। তিনি আস্তে আস্তে নুরুন্নাহার বানুর শরীরে হাত বুলিয়ে ডাকতে লাগলেন :

এই ওঠো খাবার পড়ে আছে। অনেক রাত এখন। সারা দিন তো কম ধকল যায়নি। নুরুন্নাহার বানু কোনো সাড়াশব্দ করলেন না। যেমন ছিলেন তেমনি শুয়ে রইলেন। আবু জুনায়েদ আরো একটু জোরে ঠেলা দিয়ে তাঁকে জাগিয়ে তোলার জন্য ডাকাডাকি করতে থাকলেন। নুরুন্নাহার বানু এবার হাউমাউ করে কেঁদে বিছানার ওপর উঠে বসলেন। তারপর চিৎকার করে বলতে লাগলেন :

আমার আব্বা তোমাকে পড়ার খরচ না যোগালে আজ তুমি কোথায় থাকতে? আব্বা নিজের কাড়ি কাড়ি টাকা খরচ করে ওরকম একজন ছোটলোকের কাছে তোমার আদরের মেয়েকে তুলে দেয়ার বদলে তাকে খুন করে ফেললে না কেন? তোমার কাছে হাত পাতা মেনি বেড়ালটির সাহস কতদূর বেড়েছে আর ঘাড় কতটা মোটা হয়েছে তুমি নিজের চোখে দেখে যাও। আজ সে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে বেড়ায়। রাতের বেলা গাড়ি করে তার মেয়ে মানুষদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আব্বা তোমার ছোট মেয়ের কপালে আল্লাহ কী দুঃখ লিখেছে দেখে যাও।

আবু জুনায়েদ তার মুখে হাতচাপা দিয়ে বললেন :

একটু ঠাণ্ডা হও, এসব আবোল-তাবোল কী বলছ?

নুরুন্নাহার বানু হাতটা মুখ থেকে সরিয়ে দিয়ে আরো জোরে চিৎকার করে বললেন :

আমি ঠাণ্ডা হলে তোমার খুব আনন্দ হয়, না? আমি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব। আমার আম্মাকে, ভাইকে ডাকব। তোমার মেয়ে জামাই সবাইকে খবর দিয়ে এনে সকলের সামনে প্রমাণ করব, রাতের বেলা তুমি ওই কসবি দিলরুবার সঙ্গে কোথায় কোথায় মজা করতে যাও। ঘরে মেয়ে আছে, মাগীর সে কথাটাও মাথায় আসেনি। টেলিফোন করে বলবে স্যারকে চাই।

আবু জুনায়েদ নুরুন্নাহার বানুর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, দেখো এসব কথা তুমি মন থেকে বানিয়ে বানিয়ে বলছ, আমি গাড়ি করে তোমার ভায়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম। তুমি টেলিফোন করে দেখো।

ধার্মিক সাজার চেষ্টা করবে না। তোমাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনেছি। কতদিন থেকে ওই কসবির সঙ্গে তোমার লীলা চলছে?

কার কথা বলছ, আমি কোনো মহিলাকে চিনি না, কারো সঙ্গে আমার কোনো রকমের সম্পর্ক নেই।

এবার নুরুন্নাহার বানু আবু জুনায়েদের চোখে চোখ রেখে বললেন, তুমি বলতে চাও, তোমার সঙ্গে দিলরুবা খানমের গোপন পীরিত নেই?

–ছি ছি কী বলছ তুমি? চুপ করো। দারোয়ান বেয়ারা শুনলে কী বলবে?

নুরুন্নাহার বানু কণ্ঠস্বর আরো বাড়িয়ে বললেন, আমি সকলকে ডেকে শোনাব। ওই মাগী দিলরুবা টেলিফোনে আঁকু পাঁকু করে বলে কেন, স্যারকে চাই? এই রাতে স্যারকে কেন চাই? নুরুন্নাহার মুখের একটা ভঙ্গি করলেন। আবু জুনায়েদ এবার উপলব্ধি করতে পারলেন, তাঁর দুর্ভোগের এই সবে শুরু। নুরুন্নাহার বানু কাটা কলাগাছের মতো ধপ করে বিছানায় পড়ে হাপুস হুপুস করে কাঁদতে লাগলেন। তাঁদের চিৎকার সহ্য করতে না পেরে পাশের ঘর থেকে মেয়েটি বেরিয়ে এসে বলল :

আব্বা আম্মা আধারাতে তোমরা এসব কী শুরু করে দিয়েছ? সব কথা সব লোক শুনছে। কাল থেকে পাড়ায় মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। সে বাতি নিভিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

পরের দিন ভোর হওয়ার অনেক আগেই নুরুন্নাহার বানুর ঘুম ভেঙে গেল। আসলে সারা রাত তিনি দু চোখ এক করতে পারেননি। তাঁর বুকের ভেতরটা জ্বলেছে। এবার থেকে তাঁর পরাজয়ের পালা শুরু হল। তাঁর স্বামীর পদোন্নতি হওয়ার সংবাদ শোনার পর থেকে সকলের কাছে বলে বেড়াচ্ছিলেন, তাঁর ভাগ্যেই আবু জুনায়েদের জীবনের মোড় ঘুরে গেছে। সে কথা মনে হওয়ায় এখন নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করল। মোল্লা আজান দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিছানা থেকে উঠে পড়লেন। আবু জুনায়েদ বাম কাত হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর নাক ডাকছে। নুরুন্নাহার বানু মনে করতে থাকলেন ওই মানুষটাই তাঁর সারা জীবনের সমস্ত দুর্ভাগ্যের কারণ। মশারির বাইরে এসে স্পঞ্জে পা ঢুকিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে অনুভব করলেন, তিনি ভীষণ ক্ষুধার্ত। তক্ষুনি তাঁর মনে পড়ে গেল গত রাতে তিনি কিছু মুখে তোলেননি। ডাইনিং রুমে এসে দেখেন গত রাতের ঢাকা দেয়া খাবার তেমনি পড়ে আছে। তিনি বাথরুমে গিয়ে মুখ হাতে পানি দিয়ে খেতে বসে গেলেন। ক্ষুধাটা পেটের ভেতর হুঙ্কার তুলছিল। তাই বাসী ভাতে আটকাল না। ঢকঢক পানি খেয়ে নিয়ে কিচেনে ঢুকে এক কাপ চা করে আস্তে আস্তে খেতে লাগলেন। চা খাওয়া হয়ে গেলে তিনি হুড়কো খুলে বাইরে চলে এলেন। অল্প অল্প শীত করছিল। তাই একটি হাল্কা চাদর পরে নিয়েছিলেন। প্রথম সূর্যের আলো গাছপালার ওপর এসে পড়েছে। ঘাসের

ডগায় শিশির বিন্দুগুলো টলটল করছে। অনেকদিন এমন নরম তুলতুলে ভোর দেখেননি। তিনি বিশাল প্রাসাদোপম বাড়ির চারপাশটা ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে একটা অনুভূতি জন্ম নিল, সঙ্গে আবু জুনায়েদ থাকলে বেশ হত। তক্ষুনি গত রাতে যেসব ঘটনা ঘটেছে একটা একটা করে সবগুলো মনে পড়ে গেল। তিনি নিজের মনে বিড়বিড় করে উচ্চারণ করতে লাগলেন, ছোটলোক, ছোটলোক। এই ছোটলোকটাই তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। গত রাতে আবু জুনায়েদকে যে সকল হুমকি দিয়েছিলেন, সেগুলো মনে এল। তিনি তাঁর আম্মা, ভাই এবং নিজের মেয়েকে ডেকে এনে যেসব কথা ফাঁস করবেন বলে ভয় দেখিয়েছিলেন, সেগুলো নিয়ে মনের ভেতর খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করলেন। তাঁর মনে হল যেসব করবেন বলে রাগের মাথায় ঘোষণা দিয়েছিলেন, এই প্রভাতের আলোতে মনে হল তার কোনোটা করাই তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর মুখটা তেতো হয়ে গিয়েছিল। ছোটলোক, তাঁর ঠোঁটে আপনিই মন্ত্রের মতো উচ্চারিত হতে থাকল।

মনের মধ্যে অশান্তি, তবু সকাল বেলাটা তাঁর মন্দ লাগছিল না। এরকম ভোর তাঁর জীবনে আর কখনো আসেনি। তিনি মস্ত কম্পাউন্ডটা ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। এরই মধ্যে একটা বেলা হয়েছে। দারোয়ান ঘটাং করে লোহার গেট খুলে ফেলেছে। ঝাড়ু হাতে, খুন্তি হাতে একদল মেয়ে পুরুষ কম্পাউন্ডের ভেতরে প্রবেশ করল। নুরুন্নাহার বানু পায়ে পায়ে গেটের কাছে চলে এলেন। ঝাড়ুঅলা ঝাড়ু তুলে, খুন্তি অলা খুন্তি তুলে সালাম দিল। নুরুন্নাহার বানুর নিজেকে তখন রাণী মনে হচ্ছিল। তিনি খুব খুশি হয়ে উঠেছিলেন। তথাপি তাঁর মনের মধ্যে একটা খুঁত থেকে গেল। তাঁর ইচ্ছে হল বিষয়টা তিনি বুঝিয়ে দেবেন। পরক্ষণে চিন্তা করলেন, এসকল ছোটলোককে ভালো কিছু শিখিয়ে লাভ হবে না।

বরঞ্চ তিনি তাদের কাছে নিজের কর্তৃত্বটা জাহির করা অধিকতর উপযুক্ত মনে করলেন। কে কী কাজ করে জিজ্ঞেস করলেন। ঝাড়ুদার ঝাড়ুদারনী বলল, মেম সাহেব আমরা বাগানে ঝাড়ু দিতে এসেছি। বাড়িতে যারা ঝাড়ামোছার কাজ করবে, আসবে বেলা আটটার সময়। সকালবেলা ওই সমস্ত ঝাড়ুদার ঝাড়ুদারনীর সঙ্গে কথা বলতে তাঁর মন চাইছিল না। তিনি মনে মনে ভেবে নিলেন, ঘুম থেকে উঠে, এই শ্রেণীর মানুষদের সঙ্গে দেখা হল, আজকের দিনটাই জানি কেমন যায়। মাথায় টুপি দাড়িঅলা বুড়ো মানুষটার দিকে তাকিয়ে মনে করলেন, হ্যাঁ, এই লোকের সঙ্গে তবু কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলা যেতে পারে। নুরুন্নাহার বানু জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাজ কী?

বুড়ো ভদ্রলোকের মুখে একটা ছায়া পড়ল। সেদিকে নুরুন্নাহার বানুর চোখ আদৌ গেল না।

সালামত মিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক দিন থেকেই মালীর কাজ করে আসছেন। তাঁর পেশার জন্য নয়, প্রাচীনতা এবং প্রবীণত্বের জন্য সকলেই তাঁকে সমীহ করেন, এবং আপনি সম্বোধন করেন। নুরুন্নাহার বানুর মুখে তুমি শব্দটা তাঁর মনে আঘাতের মতো বাজল। তিনি তাঁর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ন না করে প্রশান্ত স্বরে জবাব দিলেন :

আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের হেড মালি। বিগত বিশ বছর ধরে আমি এই কাজ করে আসছি। হাতের খুন্তিখানা আদর করতে করতে বললেন, ওই জোয়ান ছাওয়ালটা দেখছেন সে আমার এ্যাসিস্টেন্ট এবং মেয়ের জামাইও। গত পাঁচ বছর ধরে আমার সঙ্গে কাজ করে। বর্তমান উপাচার্যের আগের জনের আগের জন দয়া করে জামাইকে চাকরিটা দিয়েছিলেন। নুরুন্নাহার বানুর মনে হঠাৎ করে হুকুম করার আকাঙ্ক্ষাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তিনি বললেন :

চলো দেখাও দেখি তোমরা কী কাজ করো। সালামত মিয়া বললেন, বেগম সাহেবা আমার সঙ্গে সঙ্গে আসেন। বিরাট প্রশস্ত বাগান। সালামত মিয়া তাঁকে সাত রকমের গোলাপের গাছ দেখালেন। ক্রিসেনথেমামের ঝাড়গুলো দেখিয়ে বললেন, এগুলো অল্প ক'দিন পরে ফুটবে। শীতকালীন ফুলগুলো যখন ফুটতে থাকবে দেখবেন বাগানের চেহারাই পাল্টে যাবে। সালামত মিয়া তার জামাইকে সদ্য ফোটা ফুল নিয়ে ঝটপট একটা তোড়া করতে বললেন। তোড়াটা নুরুন্নাহার বানুর হাতে দিয়ে বললেন, বেগম সাহেবা নিন। নুরুন্নাহার বানু তোড়াটা নিলেন, কিন্তু বিশেষ খুশি হতে পারলেন না। সেটা তাঁর ভাব ভঙ্গিতে প্রকাশ পেল।

তোমরা এতগুলো মানুষ সব বেহুদা পাতাপুতা লতা এসব লাগিয়ে গোটা জমিটাই ভরিয়ে রেখেছ। ওগুলো কোন কাজে আসবে? সব কেটে ফেলবে। এপাশে লাগাবে ঢেঁড়শ, ওপাশে বরবটি আর ওই যে খালি জায়গাটা রয়েছে ওখানে লাগাবে বেগুন এবং সুরমাই মরিচের চারা। বাজারে চারা পাওয়া না গেলে বলবে, আমার বড় বোনের বাড়িতে অনেক আছে, এনে দেব।

নুরুন্নাহার বানুর কথা শুনে সালামত মিয়া একেবারে চুপ করে গেলেন। তাঁর মুখ থেকে কোনো কথাই বেরোল না। নুরুন্নাহার বানু ধমক দিয়ে বলল :

কী মিয়া চুপ করে আছ যে, কথাটা বুঝি মনে ধরল না?

সালামত মিয়া আমতা আমতা করে বললেন :

বেগম সাহেবা তরি তরকারি লাগানো খুব ভালো। আর এইটা সিজনও। আমি আপনাকে পেছনে একটা তরকারির বাগান করে দেব। অনেক জমি আছে।

–কেন মিয়া সামনে লাগালে কী ক্ষতি। তরকারি বাগান সামনেই করো।

–না বেগম সাহেবা সামনে তরি তরকারির বাগান করা যাবে না।

–কেন যাবে না শুনি। আমি বলছি সামনেই করো।

–বেগম সাহেবা এ বাড়িতে সামনে তরি তরকারি লাগানোর নিয়ম নেই। আপনি নতুন এসেছেন তাই বুঝতে পারছেন না।

–কী বললে মিয়া?

–বেগম সাহেবা আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি আপনার এ হুকুম তামিল করতে পারব না।

সালামত মিয়ার কথা শুনে নুরুন্নাহার বানুর পায়ের তলা থেকে মাথার ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি একরকম দৌড়েই বাড়ির ভেতর গিয়ে ঢুকলেন। ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে পা দিয়েই তিনি অবাক হয়ে গেলেন। এই

সাত সকালে পাঁচ পাঁচজন মানুষ ড্রয়িং রুমে বসে আছেন। তাঁরা নুরুন্নাহার বানুকে উঠে সালাম দিলেন। তিনি কোনোরকমে সালামের জবাব দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। তিনি দেখলেন, নতুন স্যুট টাই পরে আবু জুনায়েদ অপর দরজা দিয়ে ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করছেন। নুরুন্নাহার বানুর একচোট মনের ঝাল ঝাড়ার ইচ্ছে ছিল। সেটাই মাঠে মারা গেল। তারপরে তিনি কৌতূহলবশত ডাইনিং রুমে গিয়ে দেখেন, সকালের নাস্তা দেয়া হয়েছে। আবু জুনায়েদ নাস্তা খাওয়ার সময় পাননি, তাঁকে জামা কাপড় পরে বের হতে হয়েছে। তখনই নুরুন্নাহার বানুর মনে পড়ল মানুষটা গত রাতেও কিছু খায়নি। আর এই সকালে চলে গেল। স্বামীটির প্রতি তাঁর মনে এক ধরনের মমতা জন্মাতে লাগল। মানুষটা বোকা সোকা। খুব সহজেই তাকে ঠকানো যায়। তার সরল-সহজ স্বামীটিকে কোন ধুরন্ধর কোন বিপদে ফেলে দেয়, সে আশঙ্কায় তাঁর মনটা গুড়গুড় করে উঠল। নুরুন্নাহার বানু মনে করেন, তিনি জীবনে যত জায়গা দেখেছেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়টি তার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ জায়গা। হঠাৎ অনেকদিন বাদে তাঁর ইচ্ছে হল, বেলা হয়ে গেলেও তিনি ফজরের নামাজটা পড়বেন।

সেদিন দিবানিদ্রা শেষ করে আবু জুনায়েদ বিছানায় বসে দেয়ালে হেলান দিয়ে কি একটা বিষয় চিন্তা করছিলেন, এমন সময় নুরুন্নাহার বানু ঢুকলেন। তাঁর মনে একটুখানি অনুশোচনার মতো হয়েছিল। তবে রাগটা পুরোপুরি মরেনি। আবু জুনায়েদের সঙ্গে দুটো মিষ্টি কথা বলার ইচ্ছে তাঁর মনের মধ্যে জন্মেছে। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারছেন না। আর কি নিয়ে আলাপটা শুরু করবেন, বিষয় খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ওগো আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে না দেখলে মনটা আমার কেমন করে, এসব কথা বলার বয়েস কি নুরুন্নাহার বানুর আছে? যখন তরুণী ছিলেন তখনো তিনি এ জাতীয় কথাবার্তাকে ন্যাকামি মনে করতেন। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে তিনি মুখ দিয়ে কথা বের করলেন :

–সকালে নাস্তা পানি মুখে না দিয়ে অমন হন্তদন্ত হয়ে কোথায় ছুটে গিয়েছিলে?

–আবু জুনায়েদ খুব খুশি হয়ে উঠলেন, তাহলে মেঘ কেটে গেছে। তিনি মনে মনে খুব স্বস্তি বোধ করলেন। এ বেলাটা মনে হচ্ছে ভালোই কাটবে।

–এখনো কি তোমাকে আবার বেরুতে হবে? জিজ্ঞেস করলেন নুরুন্নাহার বানু।

–না এ বেলা আর কোনো প্রোগ্রাম নেই, ঘরে থাকব। ভাবছি চা খাওয়ার পর বাড়ির পেছনের দিকটা একবার দেখব।

নুরুন্নাহার বানুর মনে পড়ে গেল সকালবেলা সালামত মিয়া বলেছেন, পেছনে অনেক জমি আছে, সেখানে তাঁর তরকারির বাগান করে দেয়ার কথা বলেছেন। প্রস্তাবটা তাঁর খুব পছন্দ হয়ে গেল।

–আগে চা'টা খেয়ে নিই। তারপর দুজন এক সঙ্গে যাব।

নুরুন্নাহার বানু এবং জুনায়েদ যখন বাড়ির পেছনে এলেন, তখন বিকেলের রোদের তেজটা মরে এসেছে। এই বাড়ির পেছনে ঝোপে ঝাড়ে ঢাকা এমন আশ্চর্য সুন্দর এক নির্জন পরিবেশ আছে, এখানে আসার আগে দুজনের কেউ চিন্তা করতে

পারেননি। তাঁরা কাঠবিড়ালিদের ছুটোছুটি করতে দেখলেন। দূরে কোথায় ঘুঘুর ডাক শুনতে পেলেন। সবুজ সতেজ দুর্বাবেষ্টিত প্রসারিত ভূমির ওপর হাঁটতে হাঁটতে আবু জুনায়েদের মনে এল, এখন তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তাঁর হাতে অনেক ক্ষমতা। শিশু যেমন প্রথম মাতৃ স্তন মুখে লাগিয়ে দুধের স্বাদ অনুভব করে, তেমনি আজ সকাল থেকে তিনি ক্ষমতার স্বাদ অনুভব করতে আরম্ভ করেছেন। এই ক্ষমতা নিয়ে কী করবেন চিন্তা করতে লাগলেন। এই ক্ষমতা নিয়ে কী করবেন? এই অপার ক্ষমতা দিয়ে যদি তাঁর কোনো একটা শখ পূরণ করতে পারতেন, তাহলে সবচাইতে খুশি হয়ে উঠতে পারতেন। সহসা তাঁর মনে এল, তিনি একটা দুধেল গাই পুষবেন। অঢেল জায়গা, প্রচুর ঘাস। অনায়াসে একটা গাই পোষা যায়। গাইয়ের কথা মনে হওয়ার পর তাঁর বাপের চেহারাটা চোখের সামনে জেগে উঠল। তাঁর বাবা প্রতিদিন ধলেশ্বরির পাড়ে পাড়ে দড়ি ধরে গাই গরুটা চরাতে যেতেন। একদিন পাড় ভেঙে বাবা এবং গাই উভয়েই পানিতে পড়ে গিয়েছিলেন। আয়ু ছিল তাই বেঁচে গিয়েছিলেন। এই গাইয়ের এক গ্লাস টাটকা গরম ফেনা ওঠা দুধ প্রতিদিন বিকেল বেলা তাঁকে পান করতে হত। বাবা মরেছেন কতদিন হয়ে গেল। তবু মনে হয় গত কালের ঘটনা। আবু জুনায়েদ বারবার পরীক্ষায় ভালো করতেন। পরীক্ষায় ভালো করার পেছনের কারণ আবু জুনায়েদের প্রকৃতিদত্ত মেধা নাকি গাইয়ের দুধের উপকার, দুটোর মধ্যে কোনটা সত্যি এখনো স্থির করতে পারেন নি। দুধের ব্যাপারে তিনি ভাবনা-চিন্তা করছিলেন, সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই গয়লাদের কথা তাঁর মনে এল। এঁদের স্বভাব-চরিত্র ভীষণ খারাপ। দুধের মধ্যে শহরের ড্রেনের পানি মিশেল দিতেও তাদের আটকায় না। সমস্ত গয়লা শ্রেণীর ওপর তাঁর ভয়ানক রাগ। উপাচার্যের বদলে গয়লাদের শায়েস্তা করার কোনো চাকরি যদি পেতেন তাঁর ধারণা তিনি আরো সুখী হতেন। মানুষের এই শত্রুদের তিনি থামের সঙ্গে বেঁধে আচ্ছা করে চাবকাবার হুকুম দিতেন। তিনি হাঁটছিলেন, আর অস্ফুটে কী সব বলছিলেন। নুরুন্নাহার বানুর মনে হল, তাঁর স্বামীটি তারই চোখের সামনে ভিন্ন প্রাণীতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। তাঁর রূপান্তর, পরিবর্তনের সবগুলো চিহ্ন তাঁর চোখে এখন স্পষ্টভাবে ধরা পড়তে আরম্ভ করেছে।

আবু জুনায়েদ ডালপালা প্রসারিত ছাতিম গাছটিতে পিঠ ঠেকিয়ে স্বগতোক্তি করার মতো বলে ফেললেন : আমি একটা গাই গরু কিনব। এখন রাখার জায়গার অভাব নেই এবং ঘাসও বিস্তর। একটা গরু পোষার শখ অনেক দিনের। এবার আল্লাহ আশা পূরণ করার সুযোগ দিয়েছেন।

নুরুন্নাহার শুনে লাফিয়ে উঠলেন :

–সত্যি তুমি গাই কিনবে?

হ্যাঁ। আবু জুনায়েদ জবাব দিলেন।

খুশিতে নুরুন্নাহার আবু জুনায়েদকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন। আবু জুনায়েদ তাঁর মুখ চুম্বন করলেন।

পাঁচ

মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদ থ্রি পিস স্যুট পরতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছিলেন। দিলরুবা খানম যতই তাঁকে দরজির দোকানের ডামি বলে লোকসমাজে অপদস্থ করতে চেষ্টা করুন না কেন, স্যুট টাই পরলে কোত্থেকে একটা আলগা বুকের বল তিনি অনুভব করেন। স্যুট পরে তিনি অফিস করেন, স্যুট পরে লোকজনের সঙ্গে দেখা করেন। যেদিন স্যুট গায়ে থাকে না, সেদিন নিজেকে ভারি বেচারা বেচারা বোধ করতে থাকেন। আবু জুনায়েদ মনে করতে থাকেন তিনি উলঙ্গ রয়েছেন। আর সব মানুষ তাঁর যাবতীয় অক্ষমতা, দুর্বলতা এমনকি পেটের ভেতরের নাড়ি ভূঁড়ি পর্যন্ত দেখে ফেলছে। বাড়িতেও সর্বক্ষণ স্যুট পরে থাকতে চেষ্টা করেন। এই পোশাকটা তাঁর শরীরে নতুন জন্মানো চামড়ার মতো সাপটে থাকে। মোট কথা, এই কয়দিনে তাঁর এতদূর রূপান্তর ঘটেছে, মাঝে-মাঝে তিনি ভাবতে চেষ্টা করেন, এই স্যুট এই টাইসহ তিনি মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন কি না। যেদিন থেকে তিনি উপাচার্যের আসনটিতে বসেছেন, বুঝে গেছেন এই পোশাকটাই তাঁর একমাত্র ভরসা। এই পোশাকই তাঁকে সোলেমানী গালিচার মতো বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করবে। এই গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজনও তাঁর বন্ধু নেই, সেই নিষ্ঠুর তেতো সত্যটি তিনি দাঁত তোলার মতো বেদনা দিয়ে অনুভব করেছেন।

বেগম নুরুন্নাহার বানু তাঁর স্বামীর বেশভূষা দেখে হাসি-ঠাট্টা করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু মজার কথা হল নির্মল হাসি-ঠাট্টা নুরুন্নাহার বানুর মুখ থেকে বেরোয় না। তিনি জখম না করে কাউকে কিছু বলতে পারেন না। একবার আবু জুনায়েদ ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে টাইয়ের গেরোটি ঠিক করছিলেন, দেখে নুরুন্নাহার বানু মন্তব্য করে বসলেন–

তুমি কি মনে করো স্যুট বুট করলে তোমাকে সুন্দর দেখায়? তোমার হনুমানের মতো চেহারার কোনো খোলতাই হয়?

কথাটি শুনে আবু জুনায়েদ ভীষণ রেগে গেলেন। জবাবে বললেন–

আমাকে কেমন দেখায় তা নিয়ে তোমার মাথা ব্যথা কেন?

নুরুন্নাহার বানু আবু জুনায়েদকে মুখ থেকে কথা টেনে নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন :

—আমার কেন মাথা ব্যথা হবে? মাথা ব্যথা হবে ওই খানকী দিলরুবা খানমের? আমার আব্বা যদি তোমার পেছনে গাঁটের টাকা না ঢালতেন, আজকে তুমি কোথায় থাকতে?

মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদকে নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করার লোকের অভাব নেই। সম্প্রতি তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ পেয়েছেন শিক্ষক সমিতির সভায় একজন প্রবীণ শিক্ষক রসিকতা করে তাঁকে ওরাং ওটাঙের সঙ্গে তুলনা করেছেন। দিলরুবা খানম তাঁকে হরদম দরজির দোকানের ডামি বলে সকলের কাছে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। বুড়ো বুড়ো শিক্ষকেরা তাঁর নামে ওটা কেন বলে বেড়ান, বিলকুল তিনি বুঝতে পারেন। তাঁর মতো শিক্ষক সমাজের একজন অপাংক্তেয় মানুষ ভাগ্যের কৃপায় তাঁদের নাকের ডগার ওপর দিয়ে উপাচার্যের আসন দখল করে বসলেন, তাঁদের দৃষ্টিতে এটা অপরাধ। এই কারণেই তাঁদের সকলের নখ দাঁত গজিয়েছে। মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদ যতই বোকা হয়ে থাকুক না ওই ব্যাপারটা বুঝার মতো বুদ্ধি তাঁর আছে। কিন্তু দিলরুবা খানম কেন সর্বক্ষণ তাঁর নামে নিন্দের গীত গেয়ে বেড়াচ্ছেন, তিনি তাঁর কোনো কারণ খুঁজে পান না। বলতে গেলে দিলরুবা খানমই তো তাঁকে হাত ধরে উপাচার্যের আসনটিতে বসিয়ে দিয়ে গেছেন।

মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদ ভাবতে চেষ্টা করেন, এর হেতুটা কী হতে পারে? নারীর মনের গহন রহস্য আবু জুনায়েদের মতো ভোঁতা মানুষের বুঝার কথা নয়। সাম্প্রতিক সময়ে নুরুন্নাহার বানুর পৌনঃপুনিক খোঁচা খেয়ে একটা বিষয় তাঁর মনে আনাগোনা করে। দিলরুবা খানম কি তাঁর প্রেমে পড়েছিলেন? প্রেমে না পড়লে, বলতে গেলে এটা একটি জেহাদ পরিচালনা করে তাঁকে উপাচার্যের চেয়ারে বসালেন কেন? যতই বিষয়টা গভীরভাবে চিন্তা করেন, তিনি একটা ধাঁধায় পড়ে যান। দিলরুবা খানম তাঁকে এই যে এতদূর টেনে নিয়ে এলেন, তার পেছনে বিশুদ্ধ অনুরাগ ছাড়া আর কী স্বার্থ থাকতে পারে? মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদ ভাবতে চেষ্টা করেন কোনো কারণে দিলরুবা খানমের কোনো দুর্বল জায়গায় তিনি আঘাত করে বসেছেন। তাই তিনি সকাল বিকেল তাঁর বিরুদ্ধে যাচ্ছেতাই বলে বেড়াচ্ছেন। মানুষের মনের ভেতর কত রকম অলিগলি থাকতে পারে চিন্তা করে আবু জুনায়েদ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। নুরুন্নাহার বানু যদি ক্রমাগতভাবে দিলরুবা খানমের নাম করে তাঁকে খোঁচা না দিতেন এদিকটা চিন্তা করে দেখার ফুরসতও তাঁর হত না।

আবু জুনায়েদ টাইয়ের নট বাঁধা শেষ করেন। জুতো পরতে গিয়ে দেখা গেল মোজা পাওয়া যাচ্ছে না। এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করলেন, পাওয়া গেল না। ছোকরা চাকরটিকে ডেকে আচ্ছা করে ধমকে দিলেন। নুরুন্নাহার বানুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, দেখো না মোজা জোড়া কোথায়? এদিকে আমার মিটিং শুরু হয়ে গেছে। নুরুন্নাহার বানু আঙুলে শাড়ির কোণা জড়াতে জড়াতে বললেন,

—তুমি আমার বাবার চাকর। তোমার আমার কাজ করে দেয়ার কথা, আমি কেন তোমার কাজ করব?

–কী বললে, আবু জুনায়েদ জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলেন। নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই অবাক হয়ে গেলেন।

–তোমার বাবার কাছে চলে যাও। যে টাকার খোঁটা প্রতিদিন দিয়ে যাচ্ছো আমি সুদে আসলে শোধ করে দেব। তারপর মোজা না পরেই আবু জুনায়েদ জুতোয় খালি পা গলিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন।

আবু জুনায়েদ চলে যাওয়ার পর নুরুন্নাহার বানু জগটা টেনে নিয়ে সবটা পানি ঢক ঢক করে পান করে ফেললেন। মিনমিনে স্বভাবের আবু জুনায়েদ কখনো ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানতেন না। সেই মানুষটি কত প্রচণ্ড হতে পারেন তার প্রমাণ নুরুন্নাহার বানু হাতেনাতে পেয়ে গেলেন। তাঁর সারা শরীর জ্বালা করছিল। তিনি চিৎকার করে উঠতে চাইলেন। পারলেন না, কে যেন কণ্ঠস্বর চেপে ধরল। পরম বেদনায় তিনি অনুভব করলেন, তাঁর প্রতিপত্তির দিন শেষ হয়ে আসছে। উপাচার্যের চাকরি, এই সুদৃশ্য অট্টালিকা, গণ্ডায় গণ্ডায় লোকজন সাজসজ্জা সবকিছুকে তাঁর অভিশাপ দিতে ইচ্ছে হল।

উপাচার্যের চাকরি করতে গিয়ে মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদ প্রতিদিন টের পাচ্ছিলেন তাঁর ভেতরে অবিরাম ভাঙচুর চলছে। আগামী দিনে কী ঘটবে সে কথা বাদ দিন, একঘণ্টা পরে কী ঘটবে, সেটাও অনুমান করার উপায় নেই। আবু জুনায়েদ উপাচার্য হওয়ার পরে অর্থনীতি বিভাগের একজন ছাত্র খুন হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান দুটি ছাত্রদলই দাবি করেছে নিহত ছাত্রটি তাঁদের দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। দু দলই উপাচার্য ভবনের সামনে এসে মিছিল করেছে, শ্লোগান দিয়েছে। দু দলই উচ্চ চিৎকারে দাবি করেছে জহিরুল হক কেন খুন হল, সে জবাব আবু জুনায়েদকেই দিতে হবে। দু দলই চরম উত্তেজনার সঙ্গে জহিরুল হকের খুনীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে। নিহত ছাত্রের লাশটিও কারা দখল করবে তাই নিয়ে দু দলের মধ্যে যে তোড়জোড় চলছিল, অনায়াসে আরো এক ডজন ছাত্র খুন হতে পারত। সময়মতো পুলিশ এসে হস্তক্ষেপ করেছিল, তাই রক্ষে। নিহত ছাত্রটির গ্রামের বাড়ি কাপাসিয়া। সংবাদ পেয়ে মা-বাবা দুজনেই ছুটে এসেছিলেন। গ্রামের কৃষক। আবু জুনায়েদকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুত্র শোকাতুর মা-বাবার বুকফাটা ক্রন্দন শুনতে হয়েছে। একেবারে দাঁড়িয়ে থেকে ছাত্রটির লাশ বাড়িতে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। অনবধানতাবশত কোনো একদল যদি লাশ ছিনিয়ে নিয়ে যেত তাহলে সেই লাশ কাঁধে নিয়ে শহরে মিছিল করার সুযোগ পেলে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করা অসম্ভব ছিল না ; যার ফলে গোটা দেশে খুন এবং পাল্টা খুনের একটা উৎসব লেগে যেত। ব্যাপারটি যদি এতটুকুতে চুকেবুকে যেত তাহলেও কথা ছিল না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং ডেকে নিয়ে ধমক দিয়েছেন, সরকারি ছাত্রদলটির সমর্থক শহীদ ছাত্রটির খুনীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তিনি কেন তাদের পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিচ্ছেন না। আবার বিরোধী দলের একজন নেতা টেলিফোন করে শাসিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের সমর্থক সুবোধ ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপদে

লেখাপড়া করতে পারছে না। সরকার তাদের অযথা হয়রানি করার জন্য পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছে এবং আবু জুনায়েদ সরকারকে সাহায্য করে যাচ্ছেন, একথাটি যেন মনে থাকে। সব সময় দিন একরকম থাকবে না। কেন্টিনে চালের সঙ্গে বেশি কাঁকড় পাওয়া গেছে। ছাত্রেরা ভাতের থালাসহ দল বেঁধে মিছিল করে উপাচার্য ভবনে প্রবেশ করে একেবারে ডাইনিং রুমে চলে এসেছে। তখন আবু জুনায়েদ, নুরুন্নাহার বানু এবং একজন মেহমান দুপুরের খাবার খেতে বসেছিলেন। দারোয়ান, কেয়ারটেকার কারো বাধা ছাত্রদের ঠেকাতে পারেনি।

একজন ছাত্র ভাতের থালাটি ডাইনিং টেবিলে উপুর করে দিয়ে শ্লোগান দিয়ে উঠল, 'ভাতের সঙ্গে কাঁকড় কেন আবু জুনায়েদ জবাব চাই'। যে সকল ছাত্র ভেতরে প্রবেশ না করে বাইরে ভিড় করেছিল তারাও সকলে মিলে শ্লোগান দিতে থাকল 'আবু জুনায়েদের চামড়া, তুলে নেব আমরা'। ছাত্রদের হাতে আবু জুনায়েদের লাঞ্ছনা এবং ভোগান্তি দেখে নুরুন্নাহার বানুর হাততালি দিয়ে খলখল করে হেসে উঠতে ইচ্ছে করে। কোন্ বাপের মেয়েকে অপমান করেছে, আবু জুনায়েদ! আল্লাহ কি নেই?

একদিন মহিলা হোস্টেলের পাশের ট্রান্সফরমারটি বিকট একটা শব্দ করে জানিয়ে দিল যে বেটা আত্মহত্যা করেছে! এই অকালপ্রয়াত ট্রান্সফর্মার মহিলা হোস্টেলের ছাত্রীদের একটা বিতিকিচ্ছিরি অবস্থার মধ্যে ছুড়ে দিল। দুদিন ধরে হোস্টেলে কোনো পানি নেই। মেয়েদের গোসল, টয়লেট সব একরকম বন্ধ। বাইরে থেকে বালতি বালতি পানি আনিয়ে এক বেলার নাস্তা এবং রান্না কোনো রকমে সারা হয়েছে। মেয়েরা প্রথমে হাউজ টিউটর, তারপর প্রভোস্টের কাছে নালিশ করল। কোনো ফল হল না দেখে সকলে তোয়ালে কাঁধে জড়িয়ে সাত পাঁচশো মেয়ে একযোগে উপাচার্যের বাড়ি ঘেরাও করে বসল। প্রমিলা বাহিনীকে বাধা দেয়ার ক্ষমতা দারোয়ানের কী করে হবে। তাদের একদল উপাচার্য ভবনের ভেতরে প্রবেশ করে বাথরুমের বেসিন কমোড এগুলো ভাঙচুর করতে থাকল। আবু জুনায়েদের কিছুই করার ছিল না। তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রলয়কাণ্ড দেখলেন। নুরুন্নাহার বানু ফস করে একটা অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন। এই মন্তব্য শুনে একটি মোটা উঁচু ষণ্ডামার্কা মেয়ে তাঁর পরনের শাড়ির অর্ধেক টেনে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই মেয়েরা যেমন পঙ্গপালের মতো ঝাঁক বেঁধে এসেছিল, তেমনি ঝাঁক বেঁধে চলে গেল। চলে যাবার সময়ে একটি বব কাটিং চুলের মেয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে রিভলবার বের করে আবু জুনায়েদের মস্তক তাক করে উঁচিয়ে ধরে বলল–

–চাঁদু যেন মনে থাকে, কত ধানে কত চাল। গাঁইগুঁই করলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।

হোস্টেলের মেয়েরা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর নুরুন্নাহার বানু সিঁড়ির ওপর বসে সমস্ত জীবন ধরে যে সমস্ত গালাগাল মুখস্থ করে রেখেছিলেন, একে একে মেয়েদের উদ্দেশ্যে ঝাড়তে লাগলেন–খানকি, মাগি, বেশ্যা, ছেনাল–হায়েজ

নেফাসের পয়দায়েস আরো কতো কী মনে মনে সন্ধান করতে লাগলেন আরো শক্তিশালী গালাগাল আছে কি না। সে রকম কোনো কিছু না পেয়ে আবু জুনায়েদকে নিয়ে লাগলেন। তাঁর দিকে রোষ কষায়িত লোচনে তাকিয়ে বলতে লাগলেন–

–তোমার মতো একটা ছাগলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বলে এই ছেনাল মাগীদের হাতে আমাকে নাকাল হতে হল।

সম্প্রতি পত্রপত্রিকায় নৃতত্ত্ব বিভাগের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে জোর লেখালেখি চলছে। ভদ্রলোক ছাত্রছাত্রীদের কাছে টাকা নিয়ে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিক্রয়ের ব্যবসাটি নিরাপদে এতদিন চালিয়ে আসছিলেন। অল্প ক'দিন আগে সেটি ধরা পড়েছে। বিভাগের সমস্ত শিক্ষক এবং ছাত্রেরা অকাট্য প্রমাণসহ উপাচার্যের কাছে দাবি জানিয়েছেন, এই ভদ্রলোক যদি এই বিভাগে বহাল থাকেন শিক্ষকেরা ক্লাশ নেবেন না এবং ছাত্রেরাও শিক্ষকদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদও মনে মনে স্বীকার করেন, আবদুর রহমানের চাকরিটি থাকা উচিত নয়। কিন্তু মুশকিলের ব্যাপার হল আবদুর হলেন উপাচার্যের নিজের দলের লোক। দলের কেউ চাইবেন না, আবদুর রহমানের চাকরিটি চলে যাক। আবু জুনায়েদের ইচ্ছে আবদুর রহমানকে বরখাস্ত করেন। কিন্তু উপাচার্যের ইচ্ছেই তো সব না, সিনেট আছে, সিন্ডিকেট আছে। সেখানে ব্যাপারটা ফয়সালা করতে হবে। সিনেট সিন্ডিকেটে আবদুর রহমান দলে ভারি। সুতরাং, আবদুর রহমানের অপরাধ কবুল করেও তিনি তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার ক্ষমতা রাখেন না। আবদুর রহমানকে বরখাস্ত করলে তাঁর দলটি কানা হয়ে যাবে। দল না থাকলে আবু জুনায়েদকেও কানা হয়ে যেতে হবে।

সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগের ছেলেমেয়েরা সদলবলে মিছিল করে এসে উপাচার্যের দপ্তরের দরজা জানালা ভাঙচুর করেছে। তাদের দাবি ছিল একটিই কেন তাদের পরীক্ষার তারিখ বারবার পিছানো হচ্ছে। ভাঙা দরজা জানালা নতুন করে মেরামত করার পর সমাজতত্ত্ব বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা তাদের পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে মেরামত করা দরজা জানালা আবার নতুন করে ভেঙে দিয়ে গেছে।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা তাঁদের বেতন এবং ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে একটানা সাত দিন কর্মবিরতি পালন করেছেন। তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সপ্তাহব্যাপী কর্ম বিরতির পর বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসারেরা পাঁচ দিনের কর্ম বিরতির ঘোষণা করেছেন। তাঁদেরও বেতন ভাতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। অফিসারদের কর্মবিরতির পর শিক্ষকেরা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট ডেকে বসলেন। তাঁদের দাবি বেতন ভাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, অনেক দূর প্রসারিত। বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সের সমস্ত দাবি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। এ্যাসিসট্যান্ট প্রফেসরদের এসোসিয়েট প্রফেসর করতে হবে এবং এসোসিয়েট প্রফেসরদের প্রফেসর। মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদও স্বীকার করেন এগুলো শিক্ষকদের অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত দাবি। কিন্তু দুঃখের কথা হল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাগারে কোনো বাড়তি

টাকা নেই। বাজেটের বরাদ্দ সমস্ত অর্থ ব্যয় করা হয়ে গেছে। শিক্ষকেরা আড়াই মাস গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ালেন। আর তাঁদের মধ্যে যাঁরা সত্যিকার করিৎকর্মা চুটিয়ে কনসালটেন্সি ব্যবসা চালালেন।

অবশেষে একদিন শিক্ষকেরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে ক্লাশে যোগ দিলেন। ঠিক সেই সময়ে দুই প্রধান ছাত্র সংগঠনের মধ্যে একটা সম্মুখ সমর বেঁধে গেল। মারা গেছে আটজন এবং আহত হয়েছে একশো জনেরও বেশি। যারা মারা গেছে, তাদের মধ্যে একজন ছাড়া আর সকলেই নির্দলীয় ছাত্র। প্রাণ দেয়া প্রাণ নেয়ার নেশা দু দলের বীর পুরুষদের এমনভাবে পেয়ে বসল তিনদিন ধরে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা কুরুক্ষেত্রের আকার ধারণ করল। কাটা রাইফেল ও মেশিনগান অবাধে ব্যবহার হতে লাগল। বোমাবাজির শব্দে কানপাতা দায় হয়ে দাঁড়াল। মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অনুমতি নিয়ে সিন্ডিকেট ডেকে আবার অনির্দিষ্টকালের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে হল।

বিশ্ববিদ্যালয় যখন একেবারে বন্ধ হয়ে যায় তখন আবু জুনায়েদের খুব খালি খালি লাগে। নানা উত্তেজনার মধ্যে সময় কাটাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। চাপের মধ্যে থাকার একটা মজা হল, নিজেকে কিছুই করতে হয় না, ঘটনা জন্ম দিয়ে চলে এবং ঘটনা স্রোতই সবকিছুকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। এ রকম সময় এলে মনটা কাঁচা বাজারে যাওয়ার জন্য আঁকুপাঁকু করতে থাকে। হায়রে সেদিন কি আর আছে?

বিশ্ববিদ্যালয়ে কত কবি বাস করেন সঠিক সংখ্যাটি নিরূপণ করা হয়নি। দুশোও হতে পারে আবার তিনশোও হতে পারে। ফুল টাইম পার্ট টাইম মিলিয়ে যত লোক লেখেন, প্রথম প্রেমে পড়ার উত্তাপ ছন্দোবদ্ধ অথবা গদ্য কবিতায় প্রকাশ করেন, সব মিলিয়ে হিসেব করলে হাজারখানেক দাঁড়িয়ে যেতে পারে। তিরিশ হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মাত্র এক হাজার কবি, সংখ্যাটা কিছুতেই অধিক বলা যাবে না। বাঙালি মাত্রেই তো কবি। এমনকি বাংলার দোয়েল, শ্যামা, কোকিল ইত্যাকার বিহঙ্গ কুলের মধ্যে কবিত্বের লক্ষণ অত্যধিক মাত্রায় পরিস্ফুট। বিহঙ্গ সমাজের মধ্যে প্রচলিত সাধারণ কোনো বর্ণমালার চল নেই বলেই ওদের কবিত্ব শক্তির প্রতি আমরা উদাসীন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে স্থায়ীভাবে যাঁরা কবিতা রচনার কাজে নিবেদিত রয়েছেন তরুণে প্রবীণে মিলিয়ে তাঁদের সংখ্যা গোটা তিরিশেক দাঁড়াতে পারে। মোটে তিরিশ জন, ফুলটাইম কবি তাঁদের মধ্যে মত ও পথের এত ফারাক যে খুব সূক্ষ্মভাবে হিসেব করলে একত্রিশটি উপদলের অস্তিত্ব আবিষ্কার করা অসম্ভব হবে না। কবিদের কেউ কেউ বলেন কবিতাকে হতে হবে সমাজ বিপ্লবের হাতিয়ার। আরেক দল বলেন কবিতায় বিপ্লব টিপ্লবের কথা বলা এক ধরনের অশ্লীলতা। কবিতাকে পরিশুদ্ধ কবিতা হতে হলে অবশ্যই প্রেম থাকতে হবে। আরেকটি উপদল মনে করে প্রেম আবার কী? প্রেম কাকে বলে? মেনি বিড়ালের সঙ্গীনি খোঁজার চিৎকার যাকে ভদ্র ভাষায় প্রেম বলা হয়, ওই জিনিস কি কবিতার বিষয়বস্তু হতে

পারে? এই রকম কত আছে! কেউ বলে ছন্দ দিয়ে কবিতা লেখা হয়, কেউ বলে ভাবই কবিতার আসল প্রাণবস্তু। আরেক দল বুকে তাল ঠুকে প্রকাশ করতে কসুর করে না ভাষাই কবিতার সবকিছু। এই ধরনের যত প্রকারের মতভেদ আছে সেগুলোর কোনদিন নিরসন হবে, কবিরাও তা আশা করেন না। ডিম্ব আগে না বাচ্চা আগে এই বিতর্ক চলতে থাকবে।

সূক্ষ্ম ভেদ, উপভেদ এগুলো আপনিই লুপ্ত হয়ে যায়, যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি প্রতিদ্বন্দ্বি কবি গোষ্ঠী সুযোগ-সুবিধের প্রশ্নে একে অপরের প্রতিস্পর্ধী হয়ে দাঁড়ায়। একদল বাংলা একাডেমীর মাঠে কবিতা পড়লে, আরেক দল শিল্পকলা একাডেমীর মিলনায়তনে এসে জড়ো হন। যেহেতু রাজনীতি সমাজের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে, তাই কবিদেরও রাজনৈতিক ছাতার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। বিরোধী দলীয় কবিদের সুবিধে একটু বেশি। কারণ দেশের প্রতিষ্ঠিত সরকারকে আক্রমণ করা সহজ এবং তা করে অনায়াসে পাঠক বাহবা লাভ করা যায়। বিরোধী দলের কবিরা যদি শ্লোগান উচ্চারণ করেন, প্রকৃত কবিতা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঠেকিয়ে দিতে পারে।

মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদ কবিতার কিছুই বোঝেন না। তথাপি তাঁকে সরকার ঘেঁষা কবিদের বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হওয়ার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বাংলার প্রবীণ অধ্যাপক সরকার ঘেঁষা কবিদের সংগঠনটির সভাপতি। তিনি আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিতে আবু জুনায়েদের দল করে থাকেন। ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদকসহ এসে ড. (কবি) মনিরুল আলম যখন ধরে বসলেন আবু জুনায়েদ না করতে পারলেন না। সভা-সমিতিতে কথা বলতে বলতে এককালীন মুখচোরা লাজুক মানুষ আবু জুনায়েদের জিহ্বাটি ওই সময়ের মধ্যে অসম্ভব রকমের ধারালো হয়ে উঠেছে। যে কোনো সভায় কোনোরকম পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া ঝাড়া আড়াই ঘণ্টা বক্তৃতা দিতে পারেন। উপাচার্য হওয়ার প্রথম দিকে সভা-সমিতিতে কথা বলতে উঠলে তাঁর হাত পা কাঁপত, গলা শুকিয়ে আসত। এখন কথা বলতে গেলে জিহ্বাটি আপনা থেকে নেচে উঠতে চায়। শব্দগুলো বাকযন্ত্রের মুখে পুঁটি মাছের মতো আপনিই উজিয়ে আসে। তথাপি কোনো জটিল বিষয়ে বক্তৃতা দেয়ার প্রশ্ন উঠলেই ব্যক্তিগত সহকারীকে ডেকে সে বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজখবর করতে নির্দেশ করতেন। মোটের ওপর একটা প্রস্তুতি গ্রহণ করেই সভা-সমিতিতে যেতেন। এই কবিদের সভাটিতে যাওয়ার সময় সহকারীকে ডাকার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। আবু জুনায়েদ নিশ্চিতভাবে জানতেন বাংলা সাহিত্য বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী জানাশোনার তাঁর চাইতে অনেক কম। সুতরাং, শুধুমাত্র আত্মপ্রত্যয়ের ওপর নির্ভর করে সরকার ঘেঁষা কবি সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে একটা মজার বক্তৃতা দিয়ে বসলেন।

তিনি তাঁর বক্তৃতার এক জায়গায় বলে বসলেন, কাজী নজরুল ইসলাম যদি দীর্ঘকাল সুস্থ থাকতে পারতেন তিনিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো নোবেল প্রাইজটি

পেয়ে যেতেন। হিন্দুরা ষড়যন্ত্র করে নজরুলের মাথাটি খারাপ করে দিয়েছিল, তাই তাঁর ভাগ্যে নোবেল পুরস্কারটি জোটেনি।

নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি। আবু জুনায়েদ জাতীয় কবির সম্মান বৃদ্ধি করার জন্য যে অপূর্ব বক্তৃতা দিলেন, শুনে সরকারের চামচা কবিরা পর্যন্ত প্রমাদ গুনলেন। তাঁরা তাঁদের সম্মেলনটির ওজন বৃদ্ধি করার জন্য উপাচার্য আবু জুনায়েদকে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। আবু জুনায়েদ নজরুলকে বড় করে দেখাতে গিয়ে পূর্বাপর সম্পর্করহিত একটা বেঁফাস মন্তব্য করে তাঁদের গোটা সম্মেলনটাকে খেলো করে দিলেন। সভার শেষে ড. (কবি) মনিরুল আলম আবু জুনায়েদকে উদ্দেশ্য করে বললেন :

—স্যার নজরুলের ব্যাপারে এই অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি না করলেও পারতেন।

—কোন্ মন্তব্যের কথা বলছেন। আবু জুনায়েদের কণ্ঠে ঈষৎ বিরক্তির সুর।

—আপনি যে বলেছেন নজরুল সুস্থ থাকলে নোবেল পুরস্কার পেয়ে যেতেন এবং হিন্দুরা ষড়যন্ত্র করে তাঁর মাথা খারাপ করে দিয়েছিল।

—অন্যায় কী বলেছি। একজন কামেল এবং বুজুর্গ মানুষের কাছ থেকে আমি শুনেছি হিন্দুরা ষড়যন্ত্র করে নজরুলের মাথাটি খারাপ করে দিয়েছিল। শাহ্ সুফী খান বাহাদুর মরহুম রহমতুল্লাহ এম. এ. বিটি সাহেবের মুখ থেকে আমি ছাত্রজীবনে এই কথা শুনেছি। তিনি আমাদের হেডমাস্টার ছিলেন। আদর্শ শিক্ষক হিসেবে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে খান বাহাদুর টাইটেল দিয়েছিল। সেই যুগে গোটা জেলায় তাঁর মতো অমন বাঘা হেডমাস্টার একজনও ছিলেন না। তাঁকে কেউ কখনো একটিও বেহুদা কথা বলতে শোনেনি। জীবদ্দশায় তিনি তিন তিনবার পবিত্র মক্কা শরীফ জেয়ারত করেছিলেন। এন্তেকালের পর তাঁর কবরটা একটি দরগাতে পরিণত হয়েছে। তাঁর মুখ থেকে যে কথাটি অনেকবার শুনেছি আমি অকপটে বলেছি এতে দোষের কী থাকতে পারে।

এমন অকাট্য প্রমাণ হাজির করবার পর ড. (কবি) মনিরুল আলমের আর কিছু বলার রইল না। দুদিন না যেতেই বিরোধী দল সমর্থক সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্রটিতে আবু জুনায়েদের একটি কার্টুন চিত্র প্রকাশিত হল। আবু জুনায়েদের প্রতিকৃতি শূয়রের আকারে আঁকা হয়েছে, সামনে মাইক্রোফোন এবং তিনি কবিতা সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছেন।

উপাচার্য পদে আসীন হওয়ার পর থেকে মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদের একটি নতুন অভ্যেস জন্ম নিয়েছে। তিনি নিয়মিত শুক্রবারে মসজিদে যেয়ে জুমার নামাজটি আদায় করতে শুরু করেছেন। তাঁর মধ্যে কোনোরকম ধর্মপ্রীতি বা পরকালভীতি জন্ম নিয়েছে বলেই শুক্রবারে মসজিদে আসাআসি করছেন, সেটা সত্যি নয়। মসজিদে যেয়ে নামাজ পড়লে তাঁর প্রতি এক শ্রেণীর মানুষের ভক্তি শ্রদ্ধা বাড়ে, সেটা ঠিক। তবু আবু জুনায়েদ সঠিক বুঝে উঠতে পারেন না, কী কারণে তাঁর এ নতুন অভ্যেসটি জন্মেছে।

মসজিদে কিছুদিন যাওয়া আসার পর আবু জুনায়েদের উপলব্ধি করতে বাকি রইল না, এই একটি সাংঘাতিক ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই মসজিদে এসেই তিনি অনুধাবন করতে সক্ষম হন স্বঘোষিত নাস্তিক আহমদ তকির ওপর সাধারণ মুসল্লির কী পরিমাণ ঘৃণা রয়েছে। আহমদ তকি ভদ্রলোকটির সঙ্গে তাঁর এক ধরনের খাতির হয়েছিল। তকি সাহেব রস করে কথাবার্তা বলতে জানতেন এবং আবু জুনায়েদ সেটা উপভোগও করতেন। আর তাছাড়া অনেক ভালো কথাও তকি সাহেব বলে থাকেন। মসজিদে এসেই আবু জুনায়েদ টের পেয়ে যান যে, আহমদ তকি এই সময়ের মধ্যে আল্লাহ এবং তাঁর প্রিয় রসুলের খাস দুশমনে পরিণত হয়েছেন। সহজাত অনুভব দিয়েই আবু জুনায়েদ বুঝে গেলেন ভবিষ্যতে আহমদ তকির সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

আহমদ তকি আল্লাহ রসুলের পুরনো চিহ্নিত দুশমন। এই সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আল্লাহ রসুলের যে সকল নতুন দুশমন পয়দা হয়েছে, তাঁদের সকলের নাড়িনক্ষত্রের খবর জেনে গেছেন। আবু জুনায়েদ মনে করেন, একটা ব্যাপারে তিনি লাভবান হতে পেরেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনমতের হাওয়া কোনদিকে বইছে মসজিদে এলে তাঁর একটি পূর্বাভাস তিনি পেয়ে যান। হালে তাঁর মধ্যে একটা নতুন অন্তর্দৃষ্টি জন্মাতে আরম্ভ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিভিন্ন ব্যাপারে জনমত গঠন করার জন্য মসজিদ একটি মোক্ষম জায়গা।

এক শুক্রবারে তার মসজিদে আসতে একটু দেরি হয়েছিল। তিনি পেছনের কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করেছিলেন। কিন্তু নামাজ শেষ হওয়ায় অন্যান্য মুসুল্লীরা তাঁকে সামনে আসতে অনুরোধ করলেন। তিনি সামনে এলে চার পাঁচজন মুসল্লী একসঙ্গে কবিতা সম্মেলনে নজরুল ইসলাম সম্পর্কিত একেবারে বৈজ্ঞানিক সত্যটি (অর্থাৎ হিন্দুরা তাঁর মাথাটি খারাপ করে দিয়েছিল) প্রকাশ করার জন্য একসঙ্গে ধন্যবাদ জানালেন। ফার্সি ভাষার শিক্ষক (যে বিষয়ে একজনও ছাত্র নেই) মাওলানা আবদুর রহমান তালিব দাঁড়িয়ে তাঁর হস্ত চুম্বন করলেন এবং প্রকাশ্যে আলিঙ্গন দান করলেন। তারপর আবদুর রহমান তালিব সাহেব সমবেত মুসল্লিদের সামনে ঘোষণা দিয়ে বসলেন, এই এতদিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন পরহেজগার উপাচার্য এসেছেন। আল্লাহ তাঁর হায়াত দারাজ করুন। এই উপাচার্যকে দিয়ে ইসলামের অনেক খেদমত হবে। নামাজ শেষ করে বেরিয়ে আসছিলেন। মাওলানা আবদুর রহমান তালিব সাহেব অনুরোধ করলেন,

–হযরত আমি কি আপনার সঙ্গে আসতে পারি? আপনার দরবারে আমি পবিত্র ইসলামী উম্মাহর পক্ষ থেকে কিছু আরজি পেশ করতে চাই। আবু জুনায়েদ মাওলানা আবদুর রহমান তালিবকে গাড়িতে উঠিয়ে নিলেন।

উপাচার্য ভবনে আসার পর মাওলানা আবদুর রহমান তালিব জানালেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের শত্রুরা তৎপর হয়ে উঠেছে। তিনি যদি একটা শক্ত অবস্থান না নেন ইসলামের জানি দুশমনেরা মুসলিম উম্মাহর ক্ষতি করতে অধিকতর তৎপর হয়ে উঠবে।

ইসলামের ক্ষতি করার জন্য ইসলাম বিরোধীরা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করছে, সে বিষয়ে আবু জুনায়েদ কিছু জানতেন না। তিনি একটু বিশদ করতে বললেন। উত্তরে মাওলানা সাহেব জানালেন রামনাথ ছাত্রাবাসে হিন্দুরা বিবেকানন্দ না কোন একজন হিন্দুর মূর্তি তৈরি করেছে। এ ধরনের কাজ ব্রিটিশ আমলে সম্ভব হয়নি, পাকিস্তান আমলে সম্ভব হয়নি। অথচ স্বাধীন বাংলাদেশে যেখানে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম বিবেকানন্দ বাবুর পাথুরে মূর্তি বহাল তবিয়তে তৈরি হয়ে গেছে। এটা কি একটা ষড়যন্ত্রমূলক কাজ নয়?

আবু জুনায়েদ জানালেন, বিবেকানন্দের মূর্তিটা তিনিই উদ্বোধন করেছেন। মাওলানা সাহেব যেসব অভিযোগের কথা বলছেন, এসব কিছুই তাঁর মনে আসেনি। আর মূর্তিটা তৈরি করেছে একজন মুসলমান মহিলা ভাস্কর। এতে দোষের কী থাকতে পারে, তিনি ভেবে পান না।

মাওলানা সাহেব জবাবে জানালেন–

–আপনি খুব সরল মানুষ। মালাউনদের চক্রান্তটি ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি। একটি মুসলিম মহিলাকে দিয়ে মূর্তিটি তৈরি করিয়ে আপনাকে দিয়ে উদ্বোধন করাল, এখানেই চক্রান্তের খেলায় আমরা হেরে গেলাম। মূর্তি নির্মাণের টাকাটি দিয়েছে গোপনে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। তারা এতই চালাক যে, মুসলমানদের দিয়ে তাদের মূর্তি নির্মাণের রাজমিস্ত্রীর কাজটি করিয়েছে এবং আপনাকে দিয়ে উদ্বোধন করিয়ে মূর্তিটা আইনগতভাবে সিদ্ধ করে নিল। পূর্বে কখনো মালাউনেরা মুসলমানদের এভাবে ব্যাহার করেছে আমার জানা নেই। তাদের এক দাঁতের বুদ্ধি যদি থাকত কওমের কি এত দুর্দশা হয়?

আবু জুনায়েদ দু চোখ বন্ধ করে কিছু একটা চিন্তা করতে চেষ্টা করলেন। তাঁর মনে হল মাওলানা আবদুর রহমান তালিবের কথার মধ্যে কিছু পরিমাণ হলেও সত্যি থাকা অস্বাভাবিক নয়। তিনি বললেন :

কাজটা তো করা হয়ে গেছে। এখন কি কিছু করার উপায় আছে? আপনারা এ কথা আগে বলেননি কেন?

মাওলানা তালিব সাহেব জানালেন,

–আগে তো আমরা জানতাম না আপনার ঈমান এমন সাচ্চা। আমরা ধরে নিয়েছিলাম আপনি দিলরুবা খানমের লোক। ওই বেটির সঙ্গে মালাউনদের গলায় গলায় ভাব।

–এখন কী করতে হবে সেটা বলুন, যা হবার তো হয়ে গেছে। বললেন আবু জুনায়েদ।

মাওলানা সাহেব সাড়া দিয়ে জানালেন–আপনি যদি একটা দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন, আমরা ইসলামের জন্য অনেক কিছু করতে পারি।

সে অনেক কিছুর মধ্যে কোন্ কাজগুলো পড়ে? জানতে চাইলেন আবু জুনায়েদ।

মাওলানা অবদুর রহমান তালিব ফিসফিস করে বললেন–হাবিবুল্লাহ মুসলিম ছাত্রাবাস এবং এর ফরমানুল হক মুসলিম ছাত্রাবাস দুটো থেকে একাত্তুর সালের পর

মুসলিম নাম বাদ দেয়া হয়েছে. আমরা মুসলিম নাম যোগ করার আন্দোলন চালাব এবং দাবি তুলব বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম ইসলামসম্মত নয়, সেটা পাল্টাতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম পাল্টাতে বলছেন আপনারা, সেটা কি সম্ভব। মাওলানার প্রতি প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন।

মাওলানা জবাবে বললেন :

–কেন সম্ভব নয়, বিবেকানন্দ বাবুর মূর্তি যদি তৈরি হতে পারে, মনোগ্রাম পাল্টানো যাবে না কেন? খোঁজ করে দেখুন ভারতবর্ষে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিবেকানন্দের মূর্তি বসানো হয়নি। অথচ আপনারা এখানে পূজা আরম্ভ করে দিয়েছেন।

এবার জুনায়েদের মুখে ভয়ার্ত ভাব ফুটে উঠল। যথাসম্ভব কণ্ঠস্বর সংযত করে বললেন–

–আমি কিন্তু এসবের মধ্যে থাকতে পারব না।

মাওলানা আবদুর রহমান কণ্ঠে দরদ ঢেলে বললেন :

আমরা আপনার অবস্থা বুঝি। আপনাকে বিপদে ফেলার কোনো খায়েশ আমাদের নেই। কিন্তু আমরা যখন কোনো আন্দোলন শুরু করব আপনি সমর্থন না করতে পারেন, কিন্তু বাধা দেবেন না।

আবু জুনায়েদ মাথা নাড়লেন। এর অর্থ হ্যাঁ হতে পারে, আবার নাও হতে পারে।

মাওলানা আবদুর রহমান তালিব উঠে দাঁড়িয়ে আবার বসে পড়লেন।

–আপনার কাছে আমি আরো দুটো আর্জি পেশ করতে চাই।

আবু জুনায়েদ বললেন, বলুন।

মাওলানা সাহেব জানালেন, কলাভবনের ছাদে গুণ্ডা বদমায়েশরা নানা জায়গা থেকে মেয়েছেলে নিয়ে সারা রাত মৌজ করে কাটায়। দারোয়ানরা কোনো বাধাই দেয় না। বরঞ্চ টাকা-পয়সা নিয়ে বদমায়েশদের সহযোগিতা করে। ও জিনিসটি আপনাকে বন্ধ করতে হবে।

আবু জুনায়েদ বললেন :

দারোয়ানরা যদি এই কাণ্ড করে আমি কী করে বাধা দিতে পারি।

–মাঝে-মাঝে এক আধবার আপনি নিজে গিয়ে চেক করেন, ভয় পেয়ে দারোয়ানরা বন্ধ করে দেবে। বললেন মাওলানা তালিব।

–সেটা কি উপাচার্যের পক্ষে সম্ভব? বললেন আবু জুনায়েদ।

–কেন সম্ভব নয়? ইসলামের খলিফারা এভাবেই তো খারাপ কাজের সংবাদ নিতেন। মাওলানা আবদুর রহমান আঙুলে দাড়ি নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন :

উপাচার্য ভবনের পশ্চিম দিকে যে রাস্তাটা আছে তার ডানে বামে রজবতী মহিলারা তাদের হায়েজ নেফাজের পুরিন্দাগুলো ফেলে দিয়ে যায়। এটা অত্যন্ত জঘন্য কাজ। এই পথ দিয়ে যারাই যাওয়া আসা করে তাদের কাপড়চোপড় থেকে

শুরু করে সারা শরীর নাপাক হয়ে যায়। গোটা এলাকার পবিত্রতা বজায় রাখতে হলে রাস্তার পাশে পুরিন্দাটি ফেলার কাজ বন্ধ করতে হবে।

মাওলানা আবদুর রহমান তালিবের দ্বিতীয় প্রস্তাবটি শুনে একদিকে যেমন আবু জুনায়েদের হাসি সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াল তেমনি অন্যদিকে ভীষণ রাগ হচ্ছিল। তিনি মাওলানা সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন :

–মহিলারা ম্যানাস্ট্রসনের প্যাড কোথায় ফেলবেন, তাও আমাকে পাহারা দিতে বলেন? সেটাও কি উপাচার্যের কাজ? মাওলানা সাহেব বললেন, আপনি অকারণে রেগে যাচ্ছেন। আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি একটা নোটিশ লটকে দিন। এই রাস্তার পাশে পুরিন্দা ফেলা বেআইনী এবং অনৈসলামিক। এই পথ দিয়ে অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান যাতায়াত করে থাকেন। পুরিন্দার কারণে তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অনেক সময় তামাম শরীর অপবিত্র হয়ে যায়। যারা পুরিন্দা ফেলে যায়, আখিরাতে তাদের আজাব ভোগ করতে হবে।

ছয়

শেখ তবারক আলীর সঙ্গে আবু জুনায়েদের পরিচয় ঘটল। এটা তাঁর উপাচার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর সবচাইতে স্মরণীয় ঘটনা। তবারক আলী ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকাদার। তিনি দায়িত্ব নেয়ার পর মহিলা ছাত্রীনিবাসের নির্মাণ কাজ দেখতে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে পাজামা-পাঞ্জাবি পরিহিত কানপুরি টুপি মাথায় এক ধোপদুরস্ত বুড়োমতো ভদ্রলোক এগিয়ে এসে তাঁকে সালাম দিয়েছিলেন। ভদ্রলোকের মুখে অল্প অল্প দাড়ি। একহারা দীঘল চেহারা। বয়েস হলেও ভদ্রলোক শিরদাঁড়ার ওপর ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন। এই দাঁড়ানোর ভঙ্গি ছাড়া আরো দুটো জিনিস আবু জুনায়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। একটা হল ভদ্রলোকের তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। অন্যটা গলার আওয়াজ। এমন শান্ত অনুত্তেজিত কণ্ঠস্বর আবু জুনায়েদ কখনো শুনেছেন মনে পড়ে না।

তবারক সাহেবের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ভদ্রলোক বলতে আরম্ভ করলেন। তিনি এবং আবু জুনায়েদের স্বর্গগত শ্বশুর, আল্লাহ্ তাকে বেহেশত নসিব করুন, একই সময়ে ঠিকাদারী ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন। বলা যেতে পারে আবু জুনায়েদের শ্বশুর সাহেবই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তবারক আলীকে ঠিকাদারী পেশায় টেনে এনেছিলেন। কর্ম জীবনে তাঁর কাছে এক পয়সা মূলধন ছিল না। মরহুম আব্দুল গোফরানের লোক চেনার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। একবার চোখের দেখা দেখেই ঠিক ধরে নিতে পারতেন, কে কাজের মানুষ, কে ফালতু। আর জুনায়েদের শ্বশুর সাহেব কপর্দকহীন শেখ তবারক আলীকে ওয়ার্কিং পার্টনার হিসেবে গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ করেননি। আজকে যে তিনি ছেলে মেয়ে নিয়ে আল্লাহর রহমতে দুটো নুন-ভাত খেয়ে জীবন চালাতে পারছেন, তার পেছনে গোফরান ভাইয়ের মস্ত একটা ভূমিকা রয়েছে। যতদিন জীবিত ছিলেন, তিনি গোফরান সাহেবকে আপন মায়ের পেটের বড় ভাইয়ের চাইতেও অধিক শ্রদ্ধা-সম্মান করে এসেছেন। তবারক সাহেব আবু জুনায়েদের স্ত্রী নুরুন্নাহার বানুকে আপন মেয়ের মতো জ্ঞান করেন। মরহুম গোফরান ভাই কত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন, তার একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদকে নুরুন্নাহার বানুর পাত্র নির্বাচন করার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলেন। কত বড় বড় খানদানি পরিবারের ছেলের সঙ্গে বানুর মানে নুরুন্নাহারের

বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল। গোফরান ভাই এক কথায় সবাইকে বিদেয় করে বানুর পাত্র হিসেবে আবু জুনায়েদকে পছন্দ করেছিলেন। আজকে যদি গোফরান ভাই জীবিত থাকতেন, নিজেই দেখতে পেতেন, তাঁর পছন্দ কত সঠিক ছিল। বানুর বর আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছেন। তাঁর দুচোখের কোণা চিকচিক করে উঠল। বুঝি তখনই কেঁদে ফেলবেন। আবু জুনায়েদের ভীষণ ভয় করতে লাগল। এই তবারক বেটা তাহলে তাঁর বিষয়ে সবকিছু জানে। তাঁর স্বর্গগত পাতানো বড় ভাইয়ের মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে যদি বলে বসেন, আবু জুনায়েদ শ্বশুরের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে লেখাপড়া করেছেন তাহলে লোকজনের সামনে তাঁর মাথাটা কাটা যাবে। তাঁর হৃদয়স্পন্দন দ্রুততর হল, বুক দুরুদুরু করতে থাকল।

শেখ তবারক আলীকে কিছু একটা বলে কথার মোড় ঘুরিয়ে দেবেন সে রকম কোনো বিষয়ও তিনি খুঁজে পেলেন না। আবু জুনায়েদের পা দুটো মাটির সঙ্গে গেঁথে যাচ্ছিল। ঠোঁট শুষ্ক হয়ে আসছিল। বারবার তিনি জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছিলেন। অবশেষে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। শেখ তবারক আলী জানালেন, তিনি মরার আগে বানুর স্বামীকে উপাচার্যের আসনে দেখে গেলেন এটাই তাঁর সান্ত্বনা। তবারক আলীর প্রতি আবু জুনায়েদের মনোভাবটাই পাল্টে গেল। তবারক আলী ইচ্ছে করলে মাত্র একটি বাক্য উচ্চারণ করে আবু জুনায়েদের মান ইজ্জত ধুলোয় লুটিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি কথাটি বলেননি। আবু জুনায়েদ তবারক আলীকে অত্যন্ত মহানুভব মানুষ মনে করলেন। ছাত্রীনিবাসের নির্মাণ কাজ দেখে ফিরে আসার সময় তিনি শেখ তবারক আলীকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন। শেখ তবারকও সেই নিমন্ত্রণ কবুল করেছিলেন।

তারপর সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন পরিস্থিতিতে আবু জুনায়েদের সঙ্গে শেখ তবারক আলীর মুলাকাত ঘটল। একদিন তিনি তাঁর অফিসে ফ্যাকাল্টির ডীনদের নিয়ে বহিরাগত মস্তানদের উৎপাত ঠেকানোর উপায় উদ্ভাবন করার বিষয়ে মিটিং করছিলেন। মিটিং চলাকালীন সময়ে একেবারে দরজা ঠেলে শেখ তবারক অফিস কক্ষে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন এবং বললেন আমাকে বাঁচান। তাঁর চুল উস্কো খুস্‌কো। পাজামার অর্ধেক কাদায় ভরে গেছে। শরীর থরথর করে কাঁপছিল। মুখ দিয়ে ঠিকমতো স্বর বেরুচ্ছিল না। ঠিকাদার সাহেবের এই করুণ অবস্থা দেখে সকলে ভীষণ হতবাক হয়ে গেলেন। আলোচনায় আপনাআপনিই ছেদ পড়ে গেল। সকলেই উৎকণ্ঠাসহকারে জানতে চাইলেন, কী ঘটেছে? শেখ তবারক আলী বললেন, তিনি পানি খাবেন। এক গ্লাস পানি এনে তাঁকে দেয়া হল। সবটা পানি নিঃশেষ করার পর বললেন, আরো এক গ্লাস পানি। আরো এক গ্লাস তাকে দেয়া হল, তারপর আরেক গ্লাস।

শেখ তবারক আলীর নিশ্বাস-প্রশ্বাস কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। শরীরের কাঁপুনিও অনেকটা কমেছে। কিন্তু চোখ থেকে আতঙ্কের ভাবটা এখনো কাটেনি। যা হোক, কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি পুরোপুরি বোধশক্তি ফিরে পেলেন। এই অবস্থায় তাঁকে সুসজ্জিত অফিসে দেখে তিনি ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। ঝোঁকের বশে

তিনি একপেয়ে জুতো নিয়ে উপাচার্যের অফিসে চলে এসেছেন। বাকি একপাটি জুতো কোথায় ফেলে এসেছেন বলতে পারেন না। মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদ তাঁকে আশ্বস্ত করার জন্য বললেন–

আপনি বিচলিত হবেন না। কী হয়েছে বলুন–

স্যার এই মাত্র আমার একজন ওভারসীয়রের ডান পায়ে গুলি করা হয়েছে। তাকে হাসপাতালেও নিয়ে যেতে দিচ্ছে না। এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকা ক্যাশ তাদের হাতে তুলে না দিলে, তারা আহত ওভারসীয়রের কাছে কাউকে ঘেঁষতেও দিচ্ছে না। এই মুহূর্তে আমার হাতে অত টাকা নেই। অনেক কাকুতিমিনতি করেছি। কোনো কথাই কানে তুলছে না। বেচারী বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। এই হারে রক্তপাত চলতে থাকলে মারা যাবে। আপনারা দয়া করে কিছু একটা করুন।

সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ডীন ড : শামসুল হুদা জিজ্ঞেস করলেন–

আপনি পুলিশকে জানাননি?

পুলিশকে জানাব কি? পুলিশের চোখের সামনেই তো তারা ওভারসীয়রকে টেনে নিয়ে ডান পায়ে গুলি করেছে এবং ঘোষণা দিয়েছে আড়াইটার মধ্যে যদি তাদের দাবি না মেটাই তাহলে তারা বাম পায়েও গুলি করবে। আমাকেও খোঁজাখুঁজি করছিল কিন্তু পালিয়ে আসতে পেরেছি।

পুলিশ যেখানে কিছু করছে না, আমরা কী করতে পারি? আমাদের এখতিয়ারে তো আর এমন সৈন্য-সামন্ত নেই যে, মস্তান-গুণ্ডাদের ঠেকাতে পারি। আপনি আইজির কাছে যান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে যান, প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়ে নালিশ করুন, তাঁরা একটা বিহিত করবেন। আমরা কী করব, কী করতে পারি?

ড. হুদার এই বক্তব্যের জবাবে শেখ তবারক আলী অনেক কথা বলতে পারতেন। তিনি বলতে পারতেন আইজির কাছে গেলে আইজি বলবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো কিছু ঘটলে সেখানে পুলিশের নাক গলানোর অধিকার নেই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ৩ দিনে পাওয়া যাবে না। তাঁর মতো একজন সামান্য ঠিকাদার কী করে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। সেসব কিছুই উল্লেখ না করে বললেন–স্যার একজন মানুষের জীবন, আপনারা এ মুহূর্তে কিছু না করলে ছেলেটা মারা যাবে। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত দিয়ে সরাসরি উপাচার্যের পা দুটো চেপে ধরলেন।

আহ্ করেন কী বলে আবু জুনায়েদ তিড়িং করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আবু জুনায়েদের কাছ থেকে যে আচরণ স্বপ্নেও কেউ আশা করেননি তাই করে বসলেন। তিনি বললেন–

হুদা সাহেব দয়া করে আমার সঙ্গে চলুন, বজলু সাহেব আসুন, একজন মানুষ মারা যাচ্ছে কী করে আমরা চুপ করে থাকতে পারি।

স্যার ওই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় তো সব সময়েই মানুষ মারা যাচ্ছে, কী করতে পেরেছি আমরা? গেলে আমাদেরও তো গুলি করতে পারে। তাদের দাবি টাকা, ভালো কথা শুনবে কেন?

আবু জুনায়েদ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, রাখেন হুদা সাহেব আপনার দার্শনিক বক্তব্য। আমাদের কিছু একটা এ মুহূর্তে করতে হবে। তারপর তিনি গট গট করে হেঁটে অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন। সেই সভায় আগত মাননীয় ডীনদের সকলকে অগত্যা আবু জুনায়েদের পিছু পিছু আসতে হল। উপাচার্যের অফিসের পিয়ন, চাপরাশি, দারোয়ান, কেরানী থেকে শুরু করে সমস্ত অফিসার কেউ কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে, কেউ চাকরিগত বাধ্যবাধকতার কারণে আবু জুনায়েদকে অনুসরণ করলেন। বের হবার আগে আবু জুনায়েদ ব্যক্তিগত সহকারীকে হাসপাতালে ফোন করে এ্যাম্বুলেন্স পাঠাতে বললেন। সকলে বেরিয়ে যাচ্ছেন, অথচ শেখ তবারক আলী চৌকাঠ ধরে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আবু জুনায়েদ শেখ তবারককে উদ্দেশ করে বললেন–

একি আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে। শেখ তবারক আবার আবু জুনায়েদের পা ধরতে উদ্যত হলেন। আবু জুনায়েদ একটু সরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন–

আপনি এসব করেন কী?

স্যার আপনাদের সঙ্গে আমাকে দেখলে মনে করবে আমি আপনাদের ডেকে নিয়ে এসেছি। তারা চটে গিয়ে আমার বাড়িতে হামলা করবে। আমার পুত্র-কন্যাদের খুন করে ফেলবে।

সেদিন আবু জুনায়েদের হস্তক্ষেপে ওভারসীয়রটি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। তিনি আহত ব্যক্তিকে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে যাওয়ার আগে হাসপাতালে পাঠাতে পেরেছিলেন। আবু জুনায়েদের শত্রুরাও স্বীকার করেন এটা আবু জুনায়েদের একটা সাহসী কাজ। এই কাজটি কেন তিনি করতে পেরেছিলেন, আবু জুনায়েদের একটি নিজস্ব ব্যাখ্যা আছে। তিনি যখন বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেন, এভাবে যুক্তি দাঁড় করান। শেখ তবারক আলী সেদিন ইচ্ছে করলে তার মান-সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দিতে পারতেন। তিনি ফাঁস করে দিতে পারতেন আবু জুনায়েদ শ্বশুরের টাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন। বলতে পারতেন একেবারে সাধারণ খেটে খাওয়া পরিবার থেকে তিনি এসেছেন। আবু জুনায়েদের জীবন বৃত্তান্ত যে বিশ্ববিদ্যালয়ের তাঁর সহকর্মীদের কাছে অজানা এটা মোটেও সত্যি নয়। এখানে সকলে সকলের হাঁড়ির খবর জানেন। প্রকৃত সত্যটা অনেক সময় রঙচঙে হয়ে প্রকাশ পায়। আবু জুনায়েদের বিপক্ষের লোকেরা তাঁর নামে সাম্প্রতিককালে যে অপপ্রচার চালাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে প্রকৃত তথ্যের অনেক গড়মিল আছে। বিরুদ্ধবাদীরা বলে থাকেন, আবু জুনায়েদ অন্যের টাকায় পড়াশোনা করেছেন, একথা সঠিক। কিন্তু তিনি মেয়েটিকে বিয়ে না করে কন্যার পিতা ভদ্রলোককে প্রতারিত করেছেন। যা হোক, আবু জুনায়েদ মনে করেন শেখ তবারক তাঁর একটা উপকার করেছেন। তিনি ওভারসীয়রকে হাসপাতালে পাঠিয়ে একটু প্রত্যুপকার করেছেন মাত্র। তার সঙ্গে সাহস মহানুভবতা ওসবের কোনোই যোগ নেই।

একদিন রাত ন'টার দিকে শেখ তবারক আলী মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদকে টেলিফোন করলেন। ধরেছিলেন নুরুন্নাহার বানু হ্যালো কে বলতেই ও প্রান্ত থেকে দরদী মোলায়েম কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল।

–কে বানু?

নুরুন্নাহার বানু একটু চমকালেন। আব্বা মারা যাওয়ার পর তাঁকে এ নামে সম্বোধন করার কোনো মানুষ এ দুনিয়াতে আছে তিনি জানতেন না। আম্মা তাঁকে বানু টানু বলেন না। সরাসরি নুরুন্নাহার বলেই ডাকেন। ইদানীং টেলিফোনে তাঁর বিরক্ত বিরক্ত কর্তৃত্বব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর প্রকাশ করে এক ধরনের গোপন আনন্দ অনুভব করতেন। একটু রাগত স্বর, একটু বিরক্তি, একটু কর্তৃত্বের ভাব না দেখালে মানুষ তাঁকে আলাদা করে চিনে নেবে কীভাবে। নুরুন্নাহার বানুর ধারণা উপাচার্যের স্ত্রীদের কণ্ঠস্বর একটু উত্তাপ একটু ঝাঁঝ থাকা ভালো। আবু জুনায়েদ টেলিফোনের রিসিভার কানে লাগিয়ে যেভাবে বিনয়ে বিগলিত হয়ে মিনি মিনি করে কথা বলেন, দেখলে নুরুন্নাহার বানুর পিত্তি জ্বলে যাওয়ার উপক্রম হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কর্মচারী সব মিলিয়ে তিরিশ পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষের নায়ক এবং চালক হলেন মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদ। নুরুন্নাহার বানু মনে করেন, তুমি যদি একটু ধমক ধামক দিতে না পারো, একটু রাগ একটু হুঙ্কার না দিতে পারো, তাহলে উপাচার্য হওয়ার মজা কোথায়। নুরুন্নাহার বানু বালিকা বয়সে থানার একজন সামান্য দারোগাকেও বাঘের মতো হুঙ্কার ছাড়তে দেখেছেন। আবু জুনায়েদ এত বড় একটি বিশ্বব্যিালয়ের এক নম্বর মানুষ, অথচ তাঁর কণ্ঠে রাগ ঝাল নেই।

আবু জুনায়েদের স্থলে নুরুন্নাহার বানু যদি দায়িত্বভার গ্রহণ করতেন, তাহলে প্রথম চোটেই তিনি যে সকল মেয়ে ঘরে ঢুকে তাঁকে অপমান করে গেছে তাদের খোঁপার চুল কেটে কপালে লোহা পুড়িয়ে সারা জীবন অক্ষয় থাকে এমন দাগ বসিয়ে দেয়ার হুকুম দিতেন। খারাপ মানুষদের কপালে একটা স্থায়ী দাগ থাকা উচিত। নুরুন্নাহার বানু মনে করেন, যে সকল মেয়ে তাঁর বাড়িতে চড়াও হয়েছিল, বাথরুমের কমোড, জানালার কাচ এবং ডাইনিং হলের বেসিন চুরমার করেছে আর নুরুন্নাহার বানুকে বিবস্ত্র করে ফেলেছিলেন, তাদের বেশিরভাগই নষ্টা এবং খারাপ মেয়ে মানুষ। নষ্টা না হলে কি কেউ আচমকা এসে এমন জঘন্য কাণ্ড করতে পারে। এভাবে চিন্তা করলে নুরুন্নাহার শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা অনেক দীর্ঘ হয়ে দাঁড়ায়। তার মধ্যে প্রথমে আসবেন তাঁদের পাশের ফ্ল্যাটে যে ফাত্তাহ সাহেব থাকতেন তাঁর স্ত্রী রহিমা খাতুন। রহিমা খাতুনের ছাগল একাধিকবার তাঁর তরকারী বাগান খেয়ে ছারখার করেছে। নালিশ করলে জবাবে রহিমা খাতুন সোজা সাপটা জানিয়ে দিয়েছিলেন নুরুন্নাহারের বাগান ভক্ষণ করার জন্যেই রহিমা খাতুন ছাগল পুষেছেন। তারপরে আসে ওপরতলার সালমা বেগম। সালমা বেগমের পোষা মুরগি একবার ঘরে ঢুকে নুরুন্নাহার বানুর কালোজিরে চাল সবটা খেয়ে ফেলেছিল। নুরুন্নাহার বানু যদি চাল ডাল এসব মুরগির নাগালের বাইরে রাখেন তাহলে কষ্ট

করে পুনরায় তাঁকে নালিশ করতে আসতে হবে না এই বাঁজা মহিলাটির এমন জবাব শুনে নুরুন্নাহার বানুর ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে উঠেছিল, কিন্তু বাদানুবাদ করেননি। ঠিক করেছিলেন সুযোগ পেলে আস্ত মুরগিটাই জবাই করে হালাল করবেন। সেই পুণ্য কর্মটি সমাধা না করেই তাঁকে উপাচার্য ভবনে চলে আসতে হয়েছে।

নুরুন্নাহার বানুর সবচেয়ে বেশি আক্রোশ আবু আবদুল্লাহর মাকাল চেহারার ঢ্যাঙা ছেলেটির ওপর। একদিন চারদিক থেকে অন্ধকার ঝেঁপে এসেছে। সেই কার্তিকের মিহি হিমের সন্ধ্যেয় দেখেছেন তার আদরের মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে আবু আবদুল্লাহর মাকাল ছেলেটা চুমু খাচ্ছে। আর মেয়েটি বাঁশের কঞ্চির মতো এঁকে বেঁকে যাচ্ছে। এই সংবাদটি তিনি আবু জুনায়েদের কাছেও প্রকাশ করতে পারেননি। কেবল মেয়েটিকে চুল ধরে টেনে এনে মারতে মারতে আধমরা করে ছেড়েছিলেন। আবু আবদুল্লাহর মাকাল ছেলেটিকে তার ফাঁসিতে লটকাবার ইচ্ছে হয়েছিল। সে আকাঙ্ক্ষাটিও এখনো মরেনি। এরকম ছোট বড় অনেক খেদ অনেক ক্ষোভ তাঁর মনে ফোস্কা ফেলতে থাকে। তাঁর স্বামীরত্নটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কিন্তু তাঁকে দিয়ে নুরুন্নাহার বানুর কোন কাজটি হয়েছে, কোন শখটি পূরণ হয়েছে? নুরুন্নাহার বানু মনে করেন, একেবারে চালচুলোহীন পরিবারের সন্তান বলেই তাঁর স্বামীটির এমন মেন্দামারা স্বভাব। স্বামীটি ওরকমই থেকে যাবে। নুরুন্নাহার বানুকে মনের জ্বালা, মনের ভেতর পুষে যেতে হবে। টেলিফোনে তাঁর কণ্ঠস্বরে ঝাঁজ এবং বিরক্তি প্রকাশ হয়ে পড়ে, কারণ তাঁর অবদমিত দুঃখ যন্ত্রণাগুলো প্রাণ পেয়ে উঠতে চায়।

শেখ তবারক আলীর বানু সম্বোধন শুনতে পেয়ে নুরুন্নাহার বানুর সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে ঢেউ খেলে গেল। একটি আওয়াজ শোনামাত্রই তাঁর শৈশব, তাঁর কৈশোর দৃষ্টির সামনে মূর্তিমান হয়ে উঠল। শরীর ভেদ করে প্রথম রক্তপাতের ঘটনাটি তাঁর মনে পড়ে গেল। বানু, বানু, কে ডাকে, কে ডাকে? সেই ভাবাবেশমাখা কণ্ঠেই জবাব দিলেন :

–জ্বী আমি বানু, আপনি কে বলছেন?

–আমি তোমার তবারক চাচা, আমার কথা তোমার মনে আছে?

–কী যে বলেন চাচা আপনার কথা মনে থাকবে না? কতদিন পর আপনার গলার আওয়াজ শুনলাম। আনন্দে নুরুন্নাহার বানুর নাচতে ইচ্ছে হল, দুঃখে কাঁদতে ইচ্ছে হল।

–হ্যাঁ মা দিন বসে থাকে না। তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল তোমার বিয়ের দিন। প্রায় চব্বিশ পঁচিশ বছর হয়ে গেল।

–চাচা আপনি কোত্থেকে বলছেন, চলে আসুন আমার আপনাকে দেখার খুব ইচ্ছে করছে।

—শেখ তবারক জবাব দিলেন আমি মতিঝিলে আমার অফিস থেকে বলছি। জামাই মিয়া কি আমার কথা কিছু বলেননি

—আপনাদের জামাইয়ের সঙ্গে দেখা হল কখন?

—বানু আমি তো এখন জামাইর অধীনে কাজ করছি।

—চাচা আপনি কী যে বলেন—

—ঠিকই বলছি বানু, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কনস্ট্রাকশন কাজ করছি। জামাই আমাকে তোমার বাড়িতে খাওয়ার দাওয়াত করেছিলেন। সব সময় টেনশনের মধ্যে থাকেন, বোধহয় ভুলে গিয়ে থাকবেন। নুরুন্নাহার বানু মনে করলেন, তবারক চাচার কাছে আবু জুনায়েদের হয়ে কিছু সাফাই গাওয়া উচিত। তাই তিনি বললেন :

—ছেড়ে দেন চাচা আপনাদের জামাইর কথা। এরকম ভোলামনের মানুষ দ্বিতীয়টি আমি চোখে দেখিনি। কাজে-কর্মে এত ব্যস্ত থাকেন যে কোনো কোনো সময়ে এক পায়ে মোজা পরে অফিসে চলে যান। থাকুক আপনাদের জামাইর কথা। আপনি এক্ষুনি চলে আসুন। আমি আপনাকে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াব। এই আমি রান্নাঘরে গেলাম। নুরুন্নাহার মনে করলেন, এই একটা চমৎকার সুযোগ। তবারক চাচা এলে এই বিশাল প্রাসাদের সবগুলো ঘর ঘুরে ঘুরে দেখাবেন। কত ধরনের চীনামাটির সুন্দর সুন্দর বাসনপত্র, ছুরি, কাঁটাচামচ, ডিনার সেট, কফি সেট সব দেখিয়ে অবাক করে দেবেন। তৈজসপত্র সব দেখানো হয়ে গেলে তিনি তাঁকে ঘুরিয়ে গোটা বাড়ির কম্পাউন্ড দেখাবেন। সামনের ফুল বাগান, পেছনের তরকারি বাগান, চার পাশের ডালপালা প্রসারিত শিশু গাছের সারি সব দেখলে তবারক চাচার চোখে ধাঁধা লেগে যাবে। পোশাক পরা চাপরাশি, মালি, আয়া, খিদমতগার সব যখন নিজের চোখে দেখবেন, চাচা ঠিকই মনে করবেন নুরুন্নাহারটি রাণীর ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিল।

নিজের সৌভাগ্য এবং ঐশ্বর্যের কথা অপরকে জানাতে এত সুখ, এত আনন্দ এতদিন একথা নুরুন্নাহারের মনে যে উদয় হয়নি একথা ঠিক নয়। বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টার্সের শিক্ষকদের স্ত্রীদের নিমন্ত্রণ করার কথা চিন্তা করছিলেন। এ সমস্ত ফুটানিমারা মহিলারা এসে খাবেন এবং খেতে খেতে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বাঁকা তেরছা মন্তব্য করবেন, শুনলে নুরুন্নাহার বানুর মাথায় রক্ত চড়ে যাবে, সে আশঙ্কায় তিনি তাঁদের খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে পয়সা খরচ করার পরিকল্পনাটি বাতিল করেছেন। তাঁর ভাই এবং ভ্রাতৃবধূদের দেখানোর ইচ্ছেও মাঠে মারা গেছে। মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদ উপাচার্য হওয়ার পর দু'তিনবার তাঁরা আসা-যাওয়া করেছেন। ভাইয়ের বউদের সঙ্গে নুরুন্নাহার বানুর একটা অঘোষিত বিবাদ রয়েছে। ভাই দুজন আব্বাজান এন্তেকাল করার পর ঠিকাদারী করে অঢেল পয়সার মালিক হয়েছেন। তাঁদের বাড়ি আছে, গাড়ি আছে। বউরাও এসেছেন বাড়িঅলা, গাড়িঅলা পরিবার থেকে। মাপা মাইনের সংসারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্ল্যাট বাড়িতে নানা উপলক্ষে যখনই এসেছেন তার সংসারে এটা নেই, ওটা নেই একথা প্রচ্ছন্নভাবে নুরুন্নাহার বানুকে

জানিয়ে দিয়েছেন। দীর্ঘদিন থেকে তিনি ভ্রাতৃবধূদের সূক্ষ্ম খোঁচাগুলো সহ্য করে আসছেন। আবু জুনায়েদ উপাচার্য হওয়ার পর ভাই ভ্রাতৃবধূদের, তাঁদের ছেলেমেয়েসহ খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে এনেছেন। নুরুন্নাহারের ইচ্ছে ছিল ভ্রাতৃবধূদের সঙ্গে এই বাড়িটির পরিচয় করিয়ে দেবেন। বলবেন ওই রকম বাড়ি সারা বাংলাদেশে এই একটাই আছে। এ ধরনের বাড়িকে গথিক বাড়ি বলা হয়। চীনামাটির বাসন পেয়ালা যেগুলোতে খাবার পরিবেশন করা হয়েছে এগুলো কেনা হয়েছিল সাহেব উপাচার্যের আমলে। বিলেতের প্রধানমন্ত্রী ডিনার এবং লাঞ্চ খাওয়ার সময় এ ধরনের বাসন পেয়ালা এখনো ব্যবহার করেন।

নুরুন্নাহার বানু তাঁর কথা বলার কোনো সুযোগ করে উঠতে পারলেন না। বড় ভাইয়ের বউ খাওয়ার সময় ভিসিপিতে সদ্য দেখা অমিতাভ বচ্চন এবং মাধুরী দীক্ষিতের একটা ছবি নিয়ে বকবক করতে লাগলেন। নুরুন্নাহার বানু মতলব করেছিলেন খাওয়া-দাওয়া শেষ হওয়ার পর পুরুষ মানুষেরা যখন আলাদা হয়ে পড়বেন, পান চিবুতে চিবুতে তাঁর সৌভাগ্য সম্পদের কথা ভ্রাতৃবধূদের সামনে সবিস্তারে তুলে ধরবেন। কিন্তু খাওয়া শেষ হওয়ার পর পান মুখে দেয়ার আগেই ছোট ভাইয়ের আহলাদী বউটি আমেরিকার লসএঞ্জেলস শহরে তাঁর ভাইয়ের মেম বিয়ে করার কাহিনী নিয়ে মেতে উঠলেন। আমেরিকা থেকে বিয়ের যে ভিডিও ছবিটি পাঠিয়েছেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করতে থাকলেন। ভায়ের গাড়ি, ভায়ের বাড়ি, কুকুর, বাগান, বউয়ের শুভ বিয়ের গাউন, নীল সুন্দর আয়ত নয়ন এবং লসএঞ্জেলস শহরের আকাশ ঠেকা অট্টালিকার সারি, বিরাট বিরাট গাড়ির মিছিল, শীতের তুষারপাত এসবের এমন জমকালো বর্ণনা দিতে থাকলেন, স্বয়ং নুরুন্নাহার বানুও মুগ্ধ হয়ে কাহিনীটা না শুনে পারলেন না। তারপরেও একটা ক্ষীণ আশা ছিল, শান-শওকতের কথা না হোক অন্তত এই বাড়ির একটা ঐতিহ্য আছে সেটা বুঝিয়ে দেবেন। বিয়ের গল্প শেষ হওয়ার পর বড় ভাইয়ের বোনের মেয়েটি মা এবং চাচির সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়ে বসল। বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য এমন চিৎকার এবং কান্না জুড়ে দিল যে ভাই এবং ভ্রাতৃবধূরা বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। নুরুন্নাহার বানু ভাই, ভ্রাতৃবধূদের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। তাঁদের গাড়ি রাস্তা দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেলে তিনি অনুভব করলেন, ভ্রাতৃবধূরা তাঁকে একটা মস্তরকম দাগা দিয়ে গেলেন।

নুরুন্নাহার বানু একজন মনের মতো মানুষের সন্ধান করছিলেন, যার কাছে হৃদয় বেদনার কথা প্রকাশ করে মনের ভার লাঘব করবেন। সুখ, ঐশ্বর্য, আড়ম্বর এসবের কথা কাউকে বলতে না পারা, তার বেদনা কী অল্প! আমি স্বর্গে যেয়ে আরাম-আয়েশ ভোগ করে লাভ কী, যদি আমার প্রতিবেশী সেগুলোর প্রতি ঈর্ষাতুর দৃষ্টিপাত না করে। সুতরাং নুরুন্নাহার বানু মনে মনে একজন মানুষের সন্ধান করছিলেন। তবারক চাচা নিঃসন্দেহে নুরুন্নাহার বানুর সেই মনের মানুষটি হবেন

ছোটবেলায় পাকা কুল খাওয়ার আবদার ধরে তাঁকে কুল গাছে চড়তে বাধ্য করেছেন। একবার পেয়ারা গাছে চড়তে গিয়ে ডাল ভেঙে পা মচকে গিয়েছিল। পছন্দমতো ফ্রক, সালোয়ার, কামিজ চাইতে গিয়ে আব্বা-আম্মার কাছে ধমক খেয়ে যখনই তবারক চাচাকে ধরেছেন, তিনি তাঁকে পছন্দসই জামা কাপড় কিনে দিয়েছেন। এরকম কত কাহিনী তাঁর মনে পড়ে গেল। তিনি শেখ তবারক আলীকে টেলিফোনে জিজ্ঞেস করলেন :

–চাচা আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছি। আপনার কতক্ষণ লাগবে?

–বানু, বেটি আমার, এত উতলা হওয়ার কী আছে? আমি তো সর্বক্ষণ তোমার বাড়ির পাশেই থাকি। যে কোনোদিন যাওয়া যাবে।

–তাহলে চাচা আপনি আজ আসবেন না? নুরুন্নাহার বানুর উৎসাহ-উদ্দীপনা দপ করে নিভে গেল। তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, বসে পড়লেন। মনে হল টেলিফোনের রিসিভারটা ছুড়ে দেবেন। ও প্রান্ত থেকে শেখ তবারকের কণ্ঠ ভেসে এল :

–বানু, মা আমি কি জন্য টেলিফোন করেছি সে কথাটি আগে শুনে নাও।

ক্ষুণ্নকণ্ঠে নুরুন্নাহার বানু বললেন :

–বলুন।

–আগামী শুক্রবার আমার ছোট ছেলের বাচ্চার আকিকার তারিখ। ঐদিন রাত আটটায় তুমি, তোমার মেয়ে এবং জামাই মিয়াসহ আমার বাড়িতে এসে দুটো দানাপানি গ্রহণ করবে। না এলে তোমার বুড়ো চাচার মনে খুব কষ্ট হবে। জামাই মিয়াকে বলতাম, ভাবলাম মেয়ে থাকতে আবার জামাই কেন। মেয়ে ছিল বলেই তো জামাই পেয়েছি। আসবে তো?

–নুরুন্নাহার বানু বললেন :

–চাচা কেমন করে যাব, আপনার বাড়ি তো আমরা কেউ চিনি না। আর আপনার জামাইয়ের নানা মিটিং থাকে। এখানে সেখানে সভা-সমিতিতে যেতে হয়। সময় আছে কি না আমি তো বলতে পারব না।

–বানু, একজন উপাচার্যকে কত ব্যস্ত থাকতে হয়, তা কি আমি জানিনে। কিন্তু আমি ভালো করে খবর নিয়েছি ঐদিন জামাই মিয়া মোটামুটি ফ্রি আছেন। আর আমার বাড়ি চেনার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি লোক পাঠিয়ে নিয়ে আসব।

–দেখি চাচা আপনার জামাইয়ের সঙ্গে আলাপ করে দেখি।

–জামাইয়ের কাজ থাকে আসবেন না। তুমি আসতে চাও কি না বলো।

–কী যে বলেন চাচা, আমার ইচ্ছে হচ্ছে এক্ষুনি চলে যাই।

–কোনো ভাবনা নেই বেটি, আজ বুধবার, পরশু শুক্রবার। মাঝখানে বৃহস্পতিবার একটি দিন। পরশু তো তোমাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হচ্ছেই।

শেখ তবারক আলীর বাড়িতে আকিকার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবেন কি না একটু দ্বিধার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন আবু জুনায়েদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

ঠিকাদারের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবেন, একথা নিশ্চয়ই জানাজানি হবে। এখানে কোন কথাটি গোপন থাকে? আবু জুনায়েদ মিয়ার অজানা নেই, অবশ্যই পাঁচজনে পাঁচ কথা বলবে। অতীতে ঠিকাদারদের সঙ্গে উপাচার্যের সম্পর্ক নিয়ে অনেক কেলেঙ্কারি হয়েছে। আবু জুনায়েদ সেসব জানেন না তা নয়। তথাপি তাঁকে মত দিতে হল। নুরুন্নাহার বানু জেদ করলেও তিনি রাজি হতেন না। নুরুন্নাহার বানুর প্রভাব খাটাবার কতটুকু অধিকার তার সীমারেখাটি আকারে ইঙ্গিতে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আসল কথা হল শেখ তবারক আলী মানুষটিকে তাঁর পছন্দ হয়েছে। এজন্যেই তিনি যাবেন বলে কথা দিলেন।

শুক্রবার দিন আবু জুনায়েদ, নুরুন্নাহার বানু এবং তাঁদের কন্যা দীলু সেজেগুঁজে অপেক্ষা করছিলেন। নুরুন্নাহার বানুর মনে একটুখানি অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল ইদানীং তাঁর মনে একটা কুসংস্কার জন্মেছে। নির্বিঘ্নে তাঁর কোনো কাজ সমাধা হয় না। কোথা থেকে না কোথা থেকে একটা বাধা এসে হাজির হয়। তাঁর শরীরে অল্প অল্প ঘাম দিচ্ছিল।

ঠিক আটটা বাজতেই খবর দেয়া হল তাঁদের নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি এসে হাজির। নুরুন্নাহার বানুর মনে অন্যরকম একটা পরিকল্পনা ছিল। উপাচর্যের গাড়িটি নিয়ে যেতে পারলে বেশ হত। তবারক চাচাকে দেখানো যেত, তাঁরা এখন কত বড় গাড়িতে চলাফেরা করেন। নিচে নেমে নুরুন্নাহার বানুর ভিমরি খাওয়ার যোগাড়। বাড়ির সামনে একেবারে চকচকে নতুন একটি পাজেরো গাড়ি তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। নুরুন্নাহার বানু ভাবলেন নিশ্চয়ই তবারক চাচার অনেক টাকা হয়েছে। গাড়িটি যে ভদ্রলোক চালিয়ে নিয়ে এসেছেন, তাঁকেও পেশাদার ড্রাইভার মনে হল না। উনারা কাছাকাছি আসতেই ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে সালাম দিলেন। দীর্ঘদিন পশ্চিম দেশে থাকলে বাংলা উচ্চারণের মধ্যে যে ধাতবতা পরিলক্ষিত হয়, ভদ্রলোকের কথাবার্তার মধ্যে তেমনি একটি আভাস পাওয়া গেল। এই সুদর্শন তরুণটিকে দেখে নুরুন্নাহার বানুর একটা কৌতূহল জেগে গিয়েছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন :

—আপনি তবারক চাচার কে হন?

ভদ্রলোক একটুখানি ঢোক গিলে বললেন :

—জ্বী উনি আমার শ্বশুর।

নুরুন্নাহার বানু ফের জানতে চাইলেন :

—আপনি কি আমেরিকা থাকেন? আমেরিকা দেশটির প্রতি তাঁর ভারি আকর্ষণ। ছোট ভাইয়ের বউয়ের ভাই আমেরিকার লসএঞ্জেলস শহরে থাকে। তাঁদের ফ্ল্যাটের ওপর তলার কুদসিয়া বেগমের স্বামী সম্প্রতি আমেরিকা থেকে গাড়ি, ফ্রিজ, ভিসিপি,ওয়াশিং মেশিন কত কিছু নিয়ে ফিরেছেন। নুরুন্নাহার বানুর কপালে বিদেশ দেখার সুযোগ নেই। যাক আবু জুনায়েদের সঙ্গে বিয়েটা যদি ডক্টরেট করার আগে

হত, অন্তত বিলেত দেশটা দর্শন করা থেকে তিনি বঞ্চিত হতেন না। এখন বিদেশের কথা উঠলেই চাপা দীর্ঘনিশ্বাস বুকের ভেতর জমিয়ে রাখেন। যা হোক, ভদ্রলোক জবাব দিলেন :

–এখন চলে এসেছি, চার বছর ছিলাম এবার কথোপকথনে আবু জুনায়েদ যোগ দিলেন।

–আমেরিকার কোন শহরে ছিলেন?

–এখানে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মাস্টার্স শেষ করেছিলাম। ওখানে বিজনেস ম্যানেজমেন্টে লেখাপড়া করেছি।

গাড়ি নিউমার্কেট ছাড়িয়ে গেছে। হঠাৎ আবু জুনায়েদের খেয়াল হল, তবারক সাহেবের জামাতার নামটা জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন।

–ভাই তোমার নামটা জানা হয়নি। তুমি বললাম, রাগ করলে?

অল্প বয়সের কারো সঙ্গে আলাপ হলে আপনা-আপনি তুমি বেরিয়ে আসে, মাস্টারি করার এটাই দোষ।

–স্যার, তুমিই তো বলবেন। এক সময়ে আমি আপনার ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হয়েছিলাম। বেশ কিছুদিন ক্লাস করেছি। পরে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে চান্স পেয়ে চলে গেছি। আমার নাম আবেদ হোসেন।

–আচ্ছা আবেদ তোমার সঙ্গে তবারক সাহেবের মেয়ের বিয়ে হয়েছে কতদিন?

–সে অনেক আগে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আমরা ক্লাসফ্রেন্ড ছিলাম।

–তোমার স্ত্রীও ইঞ্জিনিয়ার?

–হ্যাঁ স্যার ইঞ্জিনিয়ার, বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারি করে।

আবু জুনায়েদ মনে মনে হিসেব মেলাতে চেষ্টা করেন। তিনি তবারক আলীকে শিক্ষা-সংস্কৃতি হীন সাধারণ একজন ঠিকাদার ধরে নিয়েছিলেন। পাজেরো গাড়ি, মার্কিন দেশ ফেরত জামাতা এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষক কন্যার কথা শুনে শেখ তবারক আলী সম্পর্কে লালিত ধারণাটি ভেঙে যাচ্ছিল। নুরুন্নাহার বানুর মুখে তো কথাই নেই। তিনি ভেবেছিলেন, তবারক চাচাকে তাক লাগিয়ে দেবেন। সেটি আর হচ্ছে না বুঝতে পারলেন। আরো কত বিস্ময় তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে কে জানে।

আবু জুনায়েদ জিজ্ঞেস করলেন :

–আবেদ তুমি কি চাকরি করো?

আগে তো আমরা হাজবেন্ড এ্যান্ড ওয়াইফ এক সঙ্গে একই ডিপার্টমেন্টে কাজ করতাম। কিন্তু আব্বা আমাকে চাকরি ছাড়তে বাধ্য করলেন। আব্বার তাগিদেই তো আমাকে আবার বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশনে পড়াশোনা করতে হল।

–বিশ্ববিদ্যালয়ে তো আমাদের সামান্য কাজ। আমরা চিটাগাং পোর্ট ট্রাস্টে কাজ করি। হাউজিংয়ে কাজ করি। রোডস এ্যান্ড হাইওয়েজে কাজ করি। রিভার ড্রেজিং-এ কাজ করি।

আবু জুনায়েদের আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না। নুরুন্নাহার বানু জানতে চাইলেন :

–আপনার কয় ছেলেমেয়ে?

–আমার একটি ছেলে, একটি মেয়ে।

–কত বয়স?

–ছেলেটি কেজিতে পড়ছে। মেয়েটি দেড় বছরের।

গাড়ি সংসদ ভবন ছাড়িয়ে আগারগাঁওয়ের দিকে মোড় নিয়েছে। শেরে বাংলানগর এবং মীরপুরের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছে গাড়ি আবার বাঁ দিকে মোড় নিল। দুপাশে সার সার বস্তি। আবেদ হোসেন জানালেন আমরা এসে পড়েছি।

আবু জুনায়েদ ভাবলেন এত জায়গা থাকতে শেখ তবারক আলী এই নোংরা বস্তির মধ্যে বাড়ি করতে আসলেন কেন? আসলে ঠিকাদারদের যতই টাকা-পয়সা হোক, দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টায় না। কোটি টাকার মালিক হলেও নোংরা জিনিসের প্রতি আকর্ষণ তারা ছাড়তে পারে না। আবু জুনায়েদ এরকম এক বড় লোকের কথা শুনেছেন। বড় লোকটি বারে গিয়ে বিলেতি মদের বদলে বাংলা মদ পান করে। বারের পরিবেশনকারীর সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করে রেখেছে, সে পূর্ব থেকেই বাংলা মদ সংগ্রহ করে রাখে। এ কারণে সে মোটা বখশিস পায়।

একটা বিরাট গেটের কাছে এসে গাড়ি দাঁড়াল। আবু জুনায়েদ লক্ষ্য করে দেখেন, বাড়িটির চারপাশে গোল কম্পাউন্ড। কম্পাউন্ডের প্রাচীর ঘেঁষে একটার পাশে একটা লাগানো ঘন বস্তির ভিড়। ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় গাছ মাথা তুলেছে। খুব ভালো করে না তাকালে কারো চোখে পড়ার কথাই নয়, এই সবের ভেতর একটা বড় বাড়ি আত্মগোপন করে আছে। বাড়িটার গেট পেরিয়ে কম্পাউন্ডের ভেতর প্রবেশ করল। আওয়াজ শুনে শেখ তবারক নিজে থেকে এগিয়ে এসে নিজে দরজা খুলে দিয়ে সালাম দিলেন।

–স্যার তাহলে এলেন, গরিবের বাড়িতে পায়ের ধুলো পড়ল। বানু মেয়ে আমার, নুরুন্নাহার বানুকে হাত ধরে নামালেন।

আবু জুনায়েদের ইচ্ছে হল বাড়িতে প্রবেশ করার আগে একটা বিষয়ে ফয়সালা করে ফেলবেন। তিনি শেখ তবারক আলীকে উদ্দেশ্য করে বললেন :

–আপনি আমার বয়সে বড়, মুরুব্বী, আমাকে স্যার বলেন কেন? তুমি বলবেন।

–জামাই বাবাজি ওই কথাটি বলবেন না। সবচাইতে বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে আমি যদি স্যার না বলি আল্লাহতায়ালা অসন্তুষ্ট হবেন। আল্লাহ আপনাকে ইজ্জত দিয়েছেন, আমি সম্মান না দেখানোর কে? আমার কপাল আমার কন্যার স্বামীকে আমি স্যার ডাকতে পারছি। গোফরান ভাই বেঁচে থাকলেও বাবা আপনাকে স্যার বলতেন। মা বানু জানে, আমরা দুজন একই মায়ের পেটের ভাইয়ের মতো ছিলাম।

দুপাশে বাগান, মাঝখান দিয়ে পীচ করা রাস্তা সে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। আবছা আলোতে সবকিছু ভালো করে দেখাও যায় না বাড়ির কাছাকাছি এসে আবু জুনায়েদ শেখ তবারকের প্রতি একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন।

—আপনার বাড়িটা দেখতে খুবই সুন্দর। অথচ হাল আমলের বাড়ির মতো নয়। এ ধরনের চৌকোণা চক মেলানো বাড়ি বানাবার কথা আপনার মনে এল কেমন করে?

ঠিক সেই সময়ে বিদ্যুৎ নিভে গেল। শেখ তবারক তাঁর জামাতাকে বললেন :

—বাবা আবেদ, বাতি কখন আসে তার কোনো ঠিকানা নেই। ডায়নামোটা চালু করতে বলো।

আবু জুনায়েদকে বললেন :

স্যার একটা মিনিট দাঁড়াবেন দয়া করে। আগে আলোটা আসুক,

তারপর এ ধরনের অন্যরকম বাড়ি বানানোর খেয়াল কেন তাঁর মাথায় চাপাল সে কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন।

—আমি তাজমহলের সৌন্দর্য দেখে একরকম পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। প্রতি বছরই সুযোগ পেলে একবার আগ্রা ছুটে যেতাম। পাঁচ সাত দিন থেকে যেতাম। বার বার ঘুরে ফিরে তাজমহলের নির্মাণ কৌশল বুঝতে চেষ্টা করতাম। মোটামুটি একটা ধারণা যখন করতে পারলাম, আমার মাথায় একটা পাগলা খেয়াল চাপল। তাজমহলের নকশার একটা বাড়ি আমি নিজেই বানাব। এটা তো নিছক পাগলামী। কোথায় বাদশাহ শাহজাহান, কোথায় তবারক আলী আপনাদের মতো দশজনের দয়ায় কোনোরকমে দুটো ভাত খেয়ে টিকে আছি। আমার মনের কথাটা যখন আর্কিটেক্টরদের কাছে খুলে বললাম, তাঁরা মনে করলেন আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। কেউ কি তাজমহলের মতো বাড়ি বানাবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে! আমি বললাম, কেন পারবে না, তাজমহল যারা বানিয়েছিল তারাও তো মানুষ। শাজাহানের তাজমহল বানানো সম্ভব নয় বুঝলাম, আমি বললাম আপনারা আমাকে একখানি তবারক আলীর তাজমহল বানিয়ে দেন। তা আর্কিটেক্টদের দিয়ে কিছু করানো গেল না। আমিও দমে যাওয়ার ছেলে নই। নিজে নিজে এই বাড়ির নকশা করেছি।

শেখ তবারক আলীর কথা শুনে আবু জুনায়েদের মনের মধ্যে একটা মস্ত ধাক্কা লাগল। তিনি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন এই মানুষটির চিন্তার পরিধি কতদূর প্রসারিত। কিন্তু একটা ব্যাপারে তিনি ঠিক পাচ্ছিলেন না তাই জানতে চাইলেন :

—এত সুন্দর বাড়ি, ঢাকা শহরের একটা দর্শনীয় জিনিস। কিন্তু বস্তির ভিড় এবং ঝোপঝাড়ের কারণে বাড়ির চেহারাটি বাইর থেকে কারো নজরেই আসে না। এগুলো কি পরিষ্কার করা যায় না? আবু জুনায়েদ বললেন।

—স্যার কথাটা হল সেখানেই। আমাদের এটা কি দেশ? এই দেশে কি মানুষ বাস করতে পারে? এখানে কি কোনো আইন-শৃঙ্খলা আছে? প্রেসিডেন্ট এরশাদের

বিরুদ্ধে লোকজন যখন আন্দোলন শুরু করল, পশ্চিম দিকের কম্পাউন্ড ওয়াল ভেঙে এক অংশে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। অনেক কষ্টে থামাতে পেরেছি। এরশাদ পাপ করেছে তবারককে কেন শাস্তি ভোগ করতে হবে? বোঝেন অবস্থাটা। আমরা ঠিকাদারি করে খাই। যে সরকারই আসুক না কেন আমাদের তো সম্পর্ক রাখতে হবে। কারো কাছ থেকে ভাড়াপত্তর কিছুই আদায় করিনে। বিপদে-আপদে একটু সামনে এসে দাঁড়ায়।

তিন চার মিনিট শেখ তবারকের কথা শুনে আবু জুনায়েদের ইচ্ছে হল তিনি তাঁর পায়ের ধুলো নেবেন। সারা জীবন ধরে মনে মনে এরকম একটি মানুষের সন্ধান করছিলেন। তিনি যে তাঁকে অনুগ্রহ করে নিমন্ত্রণে ডেকেছেন, সেজন্য মনে মনে কৃতার্থ বোধ করলেন। এ সময়ে বাতি জ্বলে উঠল। তিনি ডায়নামোর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলেন।

শেখ তবারক তাঁর জামাতা আবেদকে বললেন :

বাবা আবেদ তুমি মা বানু এবং আমার নাতনিকে ভেতরে নিয়ে যাও। আমি স্যারকে মেহমানদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

বড় হল ঘরটিতে যখন ঢুকলেন আবু জুনায়েদের চোখ ছানাবড়া হওয়ার উপক্রম। হলভর্তি ছড়ানো সোফা সেট। অনেক মানুষ। কেউ হুইস্কি টানছেন, কারো সামনে বিয়ারের গ্লাস। আবু জুনায়েদের জন্য এটা একটা নতুন জগৎ। উপবিষ্ট অতিথিদের চেহারা দেখেই আবু জুনায়েদ অনুভব করতে পারলেন, এঁরা নিশ্চয়ই সমাজের কেষ্টবিষ্টু হবেন। মাত্র একজন ভদ্রলোককেই চিনতে পারলেন। তিনি হলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সাদেক আলী খান। হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিলেন আর ডানহিল টানছিলেন। আবু জুনায়েদ একটু অবাক হয়ে গেলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহেবের সঙ্গে তাঁর তিনবার দেখা হয়েছে। প্রতিবারই বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে ডেকে নেয়া হয়েছিল। প্রতিবারই তিনি তাঁকে ইসলাম সম্পর্কে অনেক হেদায়েত করেছেন। বারবারই বলেছেন, ইসলাম থেকে সরে এসেছে বলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অনাচার চলছে। আবু জুনায়েদের খুব ভয় হতে লাগল। যদি ক্ষমতা থাকত এক দৌড়ে তিনি এখান থেকে পালিয়ে যেতেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহেবকে হুইস্কি পান করতে দেখে তাঁর মনে কোনো ঘৃণা জন্মেছে সে কারণে পালিয়ে যাওয়ার কথা তাঁর মনে আসেনি। ইসলাম প্রচারক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহেবকে তিনি নির্জলা হুইস্কি পান করতে দেখেছেন মন্ত্রী সাহেব এটা জানতে পারলে তাঁর ক্ষতি করতে পারেন এ আশঙ্কাই তাঁর মনে জেগেছে। আবু জুনায়েদ একটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থার মধ্যে পড়ে গেলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহেব হুইস্কির গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে তাঁকে আহ্বান করলেন–

–এই যে উপাচার্য সাহেব, এদিকে আসুন। আপনার স্কুলে আজ কি ফুটুস ফাটুস কিছু হয়নি? বাচ্চালোগ সব শান্ত হয়ে গেছে।

সামনের ভদ্রলোকটিকে বললেন, আপনি একটু ওদিকের সোফাটায় বসুন দয়া করে। উপাচার্য সাহেবকে আমার কাছে বসতে দিন।

আবু জুনায়েদের জানু কাঁপছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আহ্বান তাঁকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে নিয়ে গেল। কোনো রকমে মন্ত্রী সাহেবের বিপরীত দিকের সোফাটিতে নিজেকে স্থাপন করলেন আবু জুনায়েদ তাঁর মনে প্রবল আতঙ্ক। কখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহেব বেয়াদবি ধরে বসেন। জেনারেল মানুষ। যদি রেগে যান। তরল পানীয়ের প্রতিক্রিয়ায় মন্ত্রী সাহেব দিলদরিয়া মেজাজে ছিলেন। পরিবেশনকারীকে হুকুম দিলেন–

–ওখানে আরেকটা গ্লাস দাও। পরিবেশনকারী হুইস্কি কাজু এবং বরফ দিয়ে গেলে মন্ত্রী সাহেব নিজেই সোডার সঙ্গে হুইস্কি মেশালেন, তারপর কুচি ঢেলে দিয়ে বললেন–

–এবার চেখে দেখেন উপাচার্য সাহেব।

আবু জুনায়েদ মস্ত ফাঁপড়ে পড়ে গেলেন। জীবনে তিনি কোনোদিন মদ মুখে দেননি। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অসন্তুষ্ট করার সাহসও তাঁর নেই। তাই তিনি অত্যন্ত কাতর স্বরে বললেন–

–স্যার জীবনে আমি কোনোদিন মদ খাইনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন–

–নাউ আই আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াই ইউ আর সো নার্ভাস। ইউ ডোন্ট নো হাউ টু থ্রো এ্যাওয়ে দ্য প্রেসার অব ওঅর্ক হ্যাজার্ড। প্লিজ হ্যাভ এ সিপ, এ্যান্ড ইউ উইল ফিস হোয়াই ইট ইজ। বুঝলেন সব ফর্সা। সবকিছু ফর্সা। নো ভাবনা, নো দুশ্চিন্তা এ্যান্ড এ ব্রিসফুল সিপ্ল।

অগত্যা আবু জুনায়েদ গ্লাসটা তুলে একটা ঢোক গলার মধ্যে চালান করে দিলেন। তাঁর মনে হল পেটের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে। বমি করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। অন্য জায়গায় হলে গলগল করে বমি করে দিতেন। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভয়ে মুখ দিয়ে বমি নির্গত হচ্ছিল না। তাঁকে উদ্ধার করলেন শেখ তবারক আলী। তিনি এগিয়ে এসে বললেন–

–জেনারেল সাহেব, উপাচার্য আমার ভাইঝি জামাই। অতি নির্মল স্বভাবের ছেলে। আপনার সঙ্গে পাল্লা দেয়া উনার কাজ নয়। তাঁকে মাফ করতে হবে।

শেখ তবারক আলী আবু জুনায়েদকে হাত ধরে টেনে নিয়ে সমাগত অতিথিদেরর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে থাকলেন। অভ্যাগতদের মধ্যে তিনজন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আছেন, দুজন মাননীয় সচিব, তিনজন শিল্পপতি, পুলিশের আইজি–এমনকি দুজন কুখ্যাত ছাত্রনেতাও রয়েছেন। তাদের একজনকে সম্প্রতি সরকারি ছাত্রদল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে এবং সে বিরোধী দলে যোগ দিয়েছে। অন্যজন বিরোধী দল সমর্থক। বিশ্ববিদ্যালয়ে টেন্ডার বক্স দখল নিয়ে যত খুন জখম হয়েছে তাঁর সঙ্গে এ দুজন একেবারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এই দুজনের চেলারা টেন্ডার খোলার দিন একে অপরের মাথা ফাঁক করে ফেলতে উদ্যত হয়। অথচ এখানে দুজন টেবিলে মুখোমুখি বসে পরস্পরের সঙ্গে খোশগল্প করছে,

যেন কতকালের বন্ধু। আবু জুনায়েদ তাদের টেবিলের পাশ দিয়ে যেতে স্প্রিংয়ের পুতুলের মতো দুজনেই উঠে দাঁড়িয়ে খুব নরম স্বরে সালাম দিল। একজন তো বলেই বসল–

–স্যার আসবেন জানতাম, তবারক সাহেব আগে জানিয়েছিলেন।

অন্যজন হুইস্কির গ্লাসে ঝুঁকে পড়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখা যায় কি না পরখ করে দেখছিল। সালামের জবাবে আবু জুনায়েদের মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুল না। তিনি আমতা আমতা করতে লাগলেন। একটা আড়ষ্টতাবোধে জিভটা শক্ত হয়ে রইল। শেখ তবারক আলী আবু জুনায়েদকে বললেন–

–মা বানু আর তার মেয়ে নিশ্চয়ই একটুখানি ব্যস্ত রয়েছে। কতদিন পরে তার চাচীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। ছেলের বউ, মেয়ে সকলে এসেছে। একটু আমোদ-আহলাদ, গাল-গল্প করবে। চলুন আমরা ততক্ষণ পাশের ঘরটাতে গিয়ে একটু কথাবার্তা বলি।

দরজা ঠেলে দুজন ছোট্ট ঘরটিতে ঢুকলেন। ছিমছাম সাজানো সুন্দর ঘর। একপাশে টেলিফোন, ফ্যাক্স মেশিন। ফটোকপিয়ার। শেখ তবারক বললেন–

–স্যার এটা আমার অফিস ঘর। মতিঝিলে আরেকটা বড় অফিস আছে। আজকাল শরীরে কুলোয় না। বাইরে বেরোতে ক্লান্তি লাগে। বাড়িতে বসে যতটুকু পারি, কাজকর্ম দেখাশোনা করি।

আবু জুনায়েদ যতই দেখছিলেন অবাক হয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করার জন্য তাঁর জিভ চুলচুল করছিল। শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেই বসলেন।

–আজকে এখানে দুজন মাস্তান ছাত্রকে দেখলাম। তারাই তো টেন্ডার ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত। তারা কী করে আপনার এখানে এল?

শেখ তবারক আলী বললেন–

–স্যার বলব, অনেক কথাই বলব। সেজন্যই তো এ ঘরে এসেছি। তার আগে একটু বেয়াদবি করব, যদি এজাজত দেন।

–আরে বলুন, আপনি এমন করে কথা বলেন আমি খুব বেকায়দায় পড়ে যাই।

শেখ তবারক আলী জানালেন, তিনি একটু তামাক সেবন করার ইচ্ছে করছেন। আবু জুনায়েদ যদি অনুমতি দেন, চাকরকে হুঁকা আনার হুকুম দিতে পারেন।

আবু জুনায়েদ বললেন–

–আপনি অবশ্যই তামাক খাবেন, তার জন্য অনুমতির কী প্রয়োজন। আপনি তো আমার মুরুব্বী।

জবাব শুনে শেখ তবারক খুব খুশি হলেন। চাকরকে ডেকে তামাক আনতে হুকুম দিলেন। তারপর আবু জুনায়েদকে জিজ্ঞেস করলেন–

–স্যার আপনাকে সিগারেট দিতে বলি।

–আমি সিগারেট খাইনে। একটু খয়ের জর্দা দেয়া পান হলেই আমার চলবে।

চাকর তামাক দিয়ে গেল। শেখ তবারক হুকায় একটা লম্বা টান দিয়ে ঢোক গিললেন। গলগল করে নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন–

–স্যার আপনি মাস্তান ছাত্র দুটোর কথা বলছেন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ বছর ধরে কনস্ট্রাকশনের কাজ করছি। এরকম হারামজাদা মার কানের সোনা চুরি করে খায় যুবক আমি বেশি দেখিনি। কিন্তু কী করব আমাকে তো এ কাজ করেই বেঁচে থাকতে হয়। এই গর্ভস্রাব হারামজাদাদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখলে চলবে কেমন করে। তারাই তো আজকের গোটা বাংলাদেশটা হাতের তালুর তলায় চেপে রেখেছে।

তারপর আবু জুনায়েদ হতবাক হয়ে শুনলেন। এই মাস্তানদেরকে শেখ তবারক আলীর মাসে পাঁচ হাজার টাকা করে মাসোহারা দিতে হয়। তাছাড়া মদ, মেয়ে মানুষ, খাবার দাবার এটা সেটা কত কিছুর খরচ যোগাতে হয় তার কোনো হিসেব নেই। আরো জানতে পারলেন, ইদানীং বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো একটি দল জন্ম নিয়েছে। তাদের হাতেও পিস্তল কাটা রাইফেল ইত্যাদি আছে। এসব অস্ত্রশস্ত্র কোথেকে আসছে, তিনি ভালোরকম জানেন, কিন্তু প্রকাশ করেন না। কারণ তাতে বিপদের আশঙ্কা আছে। এই দলটির দাবি মেটাতে রাজি হননি বলেই সেদিন টেন্ডার বক্স খোলার সময়ে ডান পায়ে ওভারসীয়রকে গুলি করেছিল। আবু জুনায়েদ জিজ্ঞেস করলেন–

–ওরাও কি আপনার কাছ থেকে টাকাকড়ি পায়?

–কিছু তো দিতে হয়। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করব কেমন করে? বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন সবখানেই সন্ত্রাসীরা ছড়িয়ে আছে। এদের না হলে ক্ষমতাসীন দলের চলে না, বিরোধী দলের চলে না। ছোটখাটো রাজনৈতিক দলগুলোকেও মাস্ত ানির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হয়। আমি একজন সামান্য ঠিকাদার মানুষ আমি কোন সাহসে ওদের সঙ্গে বিবাদে নামব?

শেখ তবারক আলীও বোধহয় হুইস্কি পান করেছেন। আবু জুনায়েদ নিজের চোখে দেখেননি। কিন্তু মুখ থেকে ওরকম গন্ধ পাচ্ছিলেন। হুঁকোর নলে টান দিয়ে মাঝে-মাঝে চোখ বন্ধ করতে চেষ্টা করেন। ধোঁয়া ছেড়ে কথা বলতে থাকেন। নেশার ঘোরে কি না আবু জুনায়েদ বলতে পারবেন না, শেখ তবারক আলীকে কথা বলায় পেয়ে বসেছে। আবু জুনায়েদ রুদ্ধশ্বাস বিস্ময়ে শুনে যেতে লাগলেন।

শেখ তবারক আলীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চীফ ইঞ্জিনিয়ার, সাব ইঞ্জিনিয়ার, ওভারসীয়র, কেরানী, একাউন্ট্যান্ট সবাইকে নিয়মিত পয়সা দিয়ে হয়। নয়ত তারা একটা অনর্থক ঘাপলা বাঁধিয়ে দেয়। বাজার থেকে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মাল কিনে দিলেও বাগড়া দিয়ে বসবে, বলবে ইট ভালো নয়, বালুর মধ্যে কাঁকড়া আছে, রডগুলো মাপে দুই সুতো কম আছে। শেখ তবারক আলীর কাজ কী এই সমস্ত ছোটলোকের বাচ্চাদের সঙ্গে ঘাপলা করে। তাই কিছু কিছু দিয়ে ছোটলোকের বাচ্চাদের মুখ বন্ধ রাখতে হয়।

শেখ তবারক তামাক টানছিলেন। ফানের বাতাসে কল্কে থেকে স্ফুলিঙ্গগুলো এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ছিল। তাঁর মুখ থেকে অবলীলায় কথা বেরিয়ে আসছিল। আবু জুনায়েদ এই প্রথম জানতে পারলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের হেড ওভারসীয়র দেখতে যাকে মনে হবে মুসল্লী মানুষ, কপালে নামাজ পড়তে পড়তে দাগ পড়ে গেছে, এই শহরের নানা জায়গায় তার পাঁচটি বাড়ি এবং তিনটি দোকান আছে। ইচ্ছে করলে হেড ওভারসীয়র কফিল উদ্দিন পাঁচ পাঁচ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে মাইনে দিয়ে পুষতে পারে। দেখে কি চেনার কোনো উপায় আছে? আবু জুনায়েদ আরো শুনলেন, একজন উপাচার্য তাঁর কাছ থেকে মেয়ের বিয়ের সমস্ত নিমন্ত্রিত অতিথিদের খাওয়ার খরচটা গলায় পা দিয়ে আদায় করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে এত গলিঘুঁড়ি বারান্দা, চোরাগলি, সুড়ঙ্গ, গোপন লেনদেনের এত পাকা বন্দোবস্ত দীর্ঘকাল থেকে তৈরি হয়ে রয়েছে এ ব্যাপারে আবু জুনায়েদ কিছুই জানতেন না। তাঁর মনে হতে থাকল, এতকাল শূন্যের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছিলেন। শেখ তবারক আলীর কথায় হঠাৎ করে তাঁর জ্ঞান নেত্রের উন্মীলন ঘটতে থাকল। তবারক আলী বলে যেতে লাগলেন, কর্মচারীরা এত টাকা আদায় করে নেয়, সে তুলনায় মাস্তানদের আর কত দিতে হয়। এরই মধ্যে টেলিফোনটা বেজে উঠল। শেখ উঠে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন।

—স্যার আজ শুধু আপনার সঙ্গেই কথা বলব। টেলিফোন রিসিভ করব না। মনের কথা বলার মানুষ পাইনে। মাঝে-মাঝে পাগল হয়ে যেতে ইচ্ছে হয়। দেশটা কোথায় যাচ্ছে। মোটা অঙ্কের টাকা সরকারি দলকে দিতে হয়। বিরোধী দলকে দিতে হয়। আমলাদের দিতে হয়, মাস্তানদের দিতে হয়। আমাদের মতো সৎ ব্যবসায়ী যারা পলিটিক্যাল ব্যাকিংয়ে রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছে পরিণত হয়নি, ঘরের টাকা ঢেলে ব্যবসাপাতি করে থাকে, তাদের কি টিকে থাকার কোনো উপায় আছে? ব্যাঙ্কগুলোতে যেয়ে দেখুন, ব্যাঙ্কের ষাট ভাগ টাকা নানা রকম প্রভাব প্রতিপত্তি খাটিয়ে ফাটকাবাজ ব্যবসায়ীরা নিয়ে গেছে। কলকারখানার নাম করে টাকা নিয়েছে। যেয়ে দেখুন একটা কম্পাউন্ড ছাড়া কিছু নয় ভেতরে ফাঁকা। কোনো যন্ত্রপাতি বসেনি। ব্যাঙ্ক থেকে লোনটা নিয়ে প্রথম চোটেই গুলশান, বনানী কিংবা বারিধারায় বৌয়ের নামে বাড়ি বানিয়ে ওপরতলা ভাড়া দিয়ে নিচের তলায় স্থায়ীভাবে বাস করার ব্যবস্থা করেছে, অধিকাংশ মানুষ। ব্যাঙ্ক যখন টাকা দাবি করে, সুদ দাবি করে, অজুহাত দেখিয়ে বসে লেবার ট্রাবলের জন্য প্রোডাকশন কিছুই হয়নি। সুতরাং সুদ মওকুফ করতে হবে। ব্যাঙ্ক যখন আসল দাবি করে, জবাব দেয় আপনারা গোটা কারখানাটাই নিয়ে যান। ব্যাঙ্ক যখন কারখানার দখল নিতে যায় দেখে লোনের টাকার দশ ভাগের এক ভাগও সেখানে বিনিয়োগ করা হয়নি। বাড়িঘর, নিলাম করে নেয়ার ক্ষমতাও ব্যাঙ্কের নেই। এই হল ব্যাপার, এভাবেই বাংলাদেশ চলছে। মাঝে-মাঝে ভাবি চাষারা লাঙলের মুঠি ধরে দেশটা টিকিয়ে রেখেছে। নয়ত অসাধু আমলা, দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক এবং ফাটকা ব্যবসায়ীরা দেশের সমস্ত মাটি মন মেপে বিদেশে চালান করে দিত।

আবু জুনায়েদ শেখ তবারক আলীর মধ্যে ক্রমশ সমুদ্রের গভীরতা আবিষ্কার করছিলেন। যতই শুনছিলেন তিনি যেন তলিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর দেশপ্রেমের সংবাদ যখন জানতে পারলেন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা অনেক গুণেই বেড়ে গেল। জর্দার নেশায় তাঁর মাথাটা একটু একটু ঘুরছিল। উত্তর দিকের জানালা খুলে তিনি মুখের পিকটা ফেলে এলেন। রুমালে মুখ মুছে তিনি বললেন–

–এবারে আপনার সম্বন্ধে কিছু বলুন। আপনি কত ধরনের ব্যবসা করেন।

শেখ তবারক আলী বললেন–

–আমি নেহায়েতই চুনোপুটি। ঠিকাদারি দিয়ে শুরু করেছিলাম। এখনো ঠিকাদারি আঁকড়ে ধরে রয়েছি। ছেলেমেয়েরা এটা ওটা বানাবার জন্য শিল্প-কারখানা গড়ে তোলার কথা বলে। আমি কোনোরকমে বুঝিয়ে সুজিয়ে বারণ করে রেখেছি। আমি বলি বাবা ওদিকে যাবে না, গেলে মারা পড়বে। ঠিকাদারী না করতে চাও ট্রেডিং করো, বিদেশ থেকে সিমেন্ট আনো, গাড়ি আনো যা প্রাণ চায় আনো এবং বাজারে বেচো। মুনাফা বেশি না হোক তোমার মূলধন মারা যাবে না। তুমি কলকারখানা বসিয়ে কিছু একটা বানাতে গিয়েছ কি মরেছ। কে কিনবে তোমার জিনিস। হাল আমলের ছেলে সব সময় বুড়ো বাপের কথা শুনতে চায় না। তিনি আরো জানালেন, শুধু নগদ টাকা থাকলে ব্যবস্থা হয় একথা মোটেই ঠিক নয়। তোমার ধৈর্য থাকতে হবে, মেজাজ থাকতে হবে এবং পরিশ্রম করার অভ্যেস থাকতে হবে। ব্যবসাও একটা এবাদতের মতো ব্যাপার। সকলকে দিয়ে ব্যবসা হয় না। মাঝে-মাঝে ছেলেদের মতিগতি দেখে তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়েন। জামাইটা ছিল বলেই ব্যবসাটা টিকে আছে। ভারি ঠাণ্ডা মেজাজের ছেলে। আর মাথাটাও খুব পরিষ্কার। তিনি জামাতার একটা সাম্প্রতিক বিচক্ষণতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন। ওয়াটার বোর্ড থেকে বুড়িগঙ্গা ড্রেজিংয়ের কন্ট্রাক্ট নিয়েছিল জামাই। পাশাপাশি পূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে মীরপুরের নিচু জমি ভরাট করার কাজটাও আদায় করে নিয়েছিল। এখন বুড়িগঙ্গার ড্রেজিং করা মাটি দিয়েই নিচু জমি ভরাট করার কাজটি চলছে। নদী ড্রেজিং এবং নিচু জমি ভরাট করা দুটি মিশালে যে একটি চমৎকার বড় ব্যবসা হয়, এই জিনিসটি প্রথম জামাইর মাথায় এসেছিল। আড়াই কোটি এবং তিন কোটি টাকার কাজ। কোনোক্রমে যদি উঠিয়ে দিতে পারা যায় তাহলে তিন গুণ লাভ হওয়ার সম্ভাবনা। সব টাকা কি তিনি ঘরে তুলতে পারবেন? তিন ভাগের এক ভাগ রাঘব বোয়ালদের পেটেই চলে যাবে।

আবু জুনায়েদ শেখ তবারক আলীর মুখের কথা রূপকথার গল্পের মতো মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনছিলেন। আর তাঁর মুখের হাঁ'টি ক্রমশ বড় হয়ে যাচ্ছিল।

চাকর নতুন করে তামাক দিয়ে গেল। শেখ তবারক আলী দুটো এলাচদানা মুখে পুরলেন এবং গুড়গুড়িতে টান দিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন–দিনকাল পাল্টে যাচ্ছে। নতুন জমানার অনেক কিছুই বুঝিনে। ঠিকাদারিও আমাকে দিয়ে আর বেশি দিন চলবে না। বয়স তো হয়েছে। ছেলে এবং জামাইয়ের ওপর ছেড়ে দিয়েছি, তারা যা

পারে করবে। না পারলে করবে না। আমি এই বুড়ো বয়সে আবার বাপের পেশায় ফিরে যাচ্ছি। গুলশান এবং বাড্ডার মাঝখানে আমার তিনশো বিঘের মতো জমি আছে। জায়গাটা জলা। সারা বর্ষাকাল পানির তলায় ডুবে থাকে। শীতের শেষে যখন পানি শুকিয়ে আসে বোরো ধান চাষ করি হাজার দশেক মন ধান পাই। ঐ এলাকার গরিব লোকদের দিয়ে চাষ করাই। তারা কিছু নিয়ে যায়, আমি কিছু আনি। বর্ষাকালে সমস্ত বিলটা পানিতে যখন সয়লাব হয়ে যায়, আমার স্পীড বোটে চড়ে ঘুরে বেড়াতে বেশ লাগে। একবার সময় সুযোগ করে আপনাকে, মা বানুকে এবং আমার নাতনিকে ঘুরে ঘুরে জায়গাটা দেখাব। আপনাদের ভালো লাগবে। এই জমিটার ওপর দেশী-বিদেশী অনেকেরই কড়া নজর। অনেক দাম দিয়ে আমার কাছ থেকে কিনে নিয়ে দালান কোঠার কমপ্লেক্স বানাতে চায়। ছেলে এবং জামাই অনেকবার বলেছে ঐ জমি কিনে বেচে শিল্প-কারখানায় ইনভেস্ট করতে। আমি সাফ সাফ বলে দিয়েছি, আমার জীবদ্দশায় এটি হচ্ছে না। যতদিন বেঁচে আছি চাষ করে যাব।

আবু জুনায়েদ যখন শেখ তবারক আলীর মুখ থেকে শুনলেন বাড্ডার মাঝখানে তাঁর তিনশো বিঘে জমি আছে এবং সেখানে তিনি রীতিমতো ধান চাষ করেন, তাঁর বুকের ভেতর জমির ক্ষুধাটা প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। তাঁর মনের একটা গোপন দরজা খুলে গেল। শরীরের সমস্ত রক্ত সভা করে উজানে উঠে আসতে চাইল। মুসা নবীর লোহিত সাগরের বুক দর্শন করে যে রকম অনুভূতি হয়েছিল সে রকম একটা ভাবাবেগ তাঁর মনে ঢেউ খেলতে থাকল। মনে করতে থাকল, কামনা সমুদ্রের তীরে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। শেখ তবারক আলীকে স্বর্গ থেকে নেমে আসা আকাঙ্ক্ষা পূরণের বার্তাবাহক বলে ভাবতে থাকলেন।

শেখ তবারক আলীর তামাক ফুরিয়ে গিয়েছে। তিনি নলটা একপাশে সরিয়ে রাখলেন। আবু জুনায়েদ অত্যন্ত বিনীতভাবে জানালেন–

–আমার একটি শখের কথা আপনাকে জানাতে খুব ইচ্ছে করে, কিন্তু লজ্জা লাগে।

–স্যার, আপনি আমাকে এখনো আপনা মানুষ হিসেবে ভাবতে পারছেন না শুনে আমার খুব দুঃখ হচ্ছে। আপনি তো আবেদের মতো আমার আরেকজন জামাই। কীসের শখ আপনি মুখ খুলে জানাবেন। নইলে এ বুড়ো মানুষটি কষ্ট পাবে।

আবু জুনায়েদ এবার তাঁর মনের কথা প্রকাশ করলেন।

–ছোটবেলা থেকে আমার একটা গাইগরু পোষার খুব শখ। গোটা চাকরি জীবন তো ফ্ল্যাট বাড়িতে কাটাতে হল। জায়গার অভাবে সে শখটা অপূর্ণ থেকে গেছে। এখন জায়গা আছে, ঘাসও বেশ আছে। আমার মনে হচ্ছে একটা গরু আমি পুষতে পারি। গরু কোথায় বেচাকেনা হয়, কীভাবে পছন্দ করে কিনতে হয় কিছুই জানিনে। আপনার হাতে লোকজন আছে, যদি একটা গরু দেখেশুনে কেনার ব্যবস্থা করে দিতেন। আপনার হাতে কি সেরকম সময় আছে?

শেখ তবারক আলী বললেন–

–আপনার শখটি খুব উত্তম শখ। গাই গরু পোষা সৌভাগ্যের লক্ষণ। শুনে আমার খুব ভালো লেগেছে। মেয়ে নাতনি জুমাইকে একটা কিনে দেয়ার তৌফিক আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। কিন্তু একটি কথা গরু যে কিনবেন, রাখবেন কোথায়, চিন্তা করেছেন?

–না সে ব্যাপারে একেবারে কিছুই চিন্তা করিনি। আপনার চাষবাসের কথা শুনে আমার গরু পোষার কথাটা মনের মধ্যে জেগে উঠল। আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল গরু পুষতে গেলে গোয়াল আগে।

আবু জুনায়েদ একটুখানি নিরাশ হয়ে পড়লেন। শেখ তবারক আলীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আবু জুনায়েদের মুখের ভাব লক্ষ্য করে বললেন:

ঠিক আছে গরু আর গোয়ালের ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না। কাল নটার দিকে আমার মিস্ত্রি আপনার বাড়িতে যাবে, কোথায় গোয়াল ঘর বানাতে চান, জায়গাটা দেখিয়ে দেবেন, বাকি দায়িত্ব মিস্ত্রির। তারপর বললেন, চলুন একটু ভেতরে যাই, ছেলে মেয়ে, বউ এবং আপনার চাচীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই।

ভেতরের ঘরে গিয়ে শুনলেন, শেখ তবারক আলীর ছেলে দুজন অধিক রাত হচ্ছে দেখে চলে গেছে। তাদের একজন থাকে গুলশানে, অন্যজন বারিধারায়। যে নাতিটির আকিকা উপলক্ষে যাওয়া, তাকে দোয়া করার সুযোগও পেলেন না আবু জুনায়েদ। ইঞ্জিনিয়ার মেয়ে তাহমিনা, তার স্বামী আবেদ এবং শেখ তবারক আলীর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় হল। আবু জুনায়েদের ইচ্ছে করছিল, এই বুড়ো মহিলার পদধূলি নেবেন। উপাচার্যের পোশাকটা তাঁকে এটা করতে দিল না। শেখ তবারক আলী তাঁর স্ত্রীকে বললেন–

–এই হল মা বানুর স্বামী আমার উপাচার্য জামাই।

আবু জুনায়েদ সালাম করলেন।

–সুখে থাকো বাবা। বললেন মহিলা।

আবু জুনায়েদের মেয়ে দীলু হরিণ শিশুর মতো ছুটোছুটি করছিল। আবু জুনায়েদের গা ঘেঁষে আবদেরে গলায় বলল–

–এই দেখো আমাকে এবং মাকে নানি কী সব দিয়েছেন।

দীলু বাক্স খুলে দেখাল তাকে সোনার লেডিজ ঘড়ি, পার্কার ফাউন্টেন কলম, একটা চমৎকার বেনারশী শাড়ি এবং নুরুন্নাহার বানুকে দেয়া জড়োয়া গয়নার সেটটি দেখালেন।

–এসব দিতে গেলেন কেন? আবু জুনায়েদের কেমন বাধো বাধো ঠেকছিল।

শেখ তবারক আলীর স্ত্রী নরম সুরে বললেন–

–জামাই মিয়া এগুলো মেয়ে নাতনির কাছে নানির সামান্য উপহার।

সে রাত্রে ফিরে আসার সময় নুরুন্নাহারের ঠোঁটে তবারক চাচার কথা লেগেই রইল। ভীষণ আকর্ষণীয় এবং খুশি খুশি দেখাচ্ছিল তাঁকে।

সাত

শেখ তবারক আলী এক কথার মানুষ। পরের দিন ন'টা বাজতেই ট্রাক এসে উপাচার্য ভবনের গেটের সামনে হর্ন দিতে থাকল। দারোয়ান গেট খুলতে রাজি ছিল না। ইট-সিমেন্ট, রড বালুতে ভর্তি তিন তিনটি ট্রাকের এই সকালবেলায় আগমনের হেতু দারোয়ান জানত না। ট্রাকগুলো বারবার হর্ন দিতে থাকল। বাধ্য হয়ে দারোয়ানকে উপাচার্য সাহেবকে খবর দিতে ওপরে যেতে হল। আবু জুনায়েদ স্যুট টাই পরে অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে পায়চারি করছিলেন। দারোয়ানকে ওপরে উঠে আসতে দেখে তিনি রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী চাই?

–স্যার তবারক সাহেব ইটা বালু ভর্তি তিনটি ট্রাক পাঠিয়ে দিয়েছেন। ট্রাকগুলো ভেতরে ঢুকতে চাইছে, জবাব দিল দারোয়ান।

আবু জুনায়েদের মনে পড়ে গেল। আগের রাতে শেখ তবারক আলী তাঁকে বলেছিলেন, ঠিক ন'টার সময় তবারক সাহেবের লোকজন ট্রাক নিয়ে তাঁর বাড়ির গেটে এসে হাজির হবে। সাড়ে ন'টার সময়ে তাঁর একটি মিটিংয়ে বসার কথা। আজ রসায়ন বিভাগের লেকচারার নিয়োগের ইন্টারভ্যুর তারিখ। সাধারণত আবু জুনায়েদ প্রফেসর এবং এসোসিয়েট প্রফেসর ছাড়া নিচের দিকের পোস্টগুলো ইন্টারভ্যুর সময়ে উপস্থিত থাকেন না। যেহেতু রসায়ন তাঁর একেবারে নিজস্ব ডিপার্টমেন্ট, তাই তিনি আপনা থেকেই প্রস্তাব করেছিলেন, লেকচারারদের ইন্টারভ্যুর সময় তিনি স্বয়ং হাজির থাকবেন। কথা দিয়েছেন অথচ এদিকে ট্রাক এসে হাজির। তিনি যদি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে জায়গা দেখিয়ে না দেন, কী রকম ঘর তৈরি করতে হবে ভালো করে বুঝিয়ে না দেন, তাহলে পরে অসুবিধেয় পড়ে যেতে হবে। ট্রাকসহ লোকজনদের আজ চলে যেতে বলবেন কি না একটুখানি চিন্তা করে দেখলেন। তিনি উপস্থিত না থাকলে বড় রকমের ক্ষতি হওয়ার কথা নয়। তার বদলে টেলিফোনে উপ-উপাচার্যকে ডেকে ইন্টারভ্যুটা চালিয়ে নিতে বললে কাজ চলে যায়। তারপরেও একটা ব্যাপারে আবু জুনায়েদের মনের মধ্যে একটা সংশয় থেকে গেল। আবু জুনায়েদ বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছেন, আজকে যে সকল প্রার্থীর ইন্টারভ্যু হবে, তার মধ্যে ড. করিমের একজন নিকটাত্মীয় রয়েছে। বর্তমানে ড. করিম একইসঙ্গে রসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান এবং ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্সের ডীন। উপ-উপচার্য ড.

খয়রাত হোসেন হলেন ড. করিমের বেয়াই তবু জুনায়েদের অনুপস্থিতিতে ড. করিম এবং ড. খয়রাত হোসেন মিলে ড. করিমের আত্মীয়টিকেই বেছে নেবেন। আবু জুনায়েদ জেনেছেন ড. করিমের আত্মীয়টির চাইতে একাধিক উজ্জ্বল প্রার্থী আছে। বোর্ডে যখন বসবেন ড. করিম এবং খয়রাত হোসেন মিলে আত্মীয়টির মধ্যে এত সব প্লাস পয়েন্ট খুঁজে বের করবেন, অধিকতর যোগ্য প্রার্থীদের মনোনয়ন পাওয়ার সম্ভাবনা মাঠে মারা যাবে। আরো একজন অযোগ্য প্রার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপত্র পাবে। তা পাক, আবু জুনায়েদের কিছু করার নেই। তাঁর চোখের সামনেই কত অন্যায় ঘটে যায়। ক'টা তিনি ঠেকাতে পেরেছেন। ঠিক করলেন, আজ তিনি যাবেনই না। ব্যক্তিগত সহকারীকে ফোন করে বললেন, তাঁর নাম করে যেন উপ-উপাচার্যকে জানানো হয়, আজ তাঁর শরীরটা বিশেষ ভালো নেই। দয়া করে খয়রাত সাহেব যেন রসায়ন বিভাগের লেকচারের ইন্টারভ্যুর সময় উপস্থিত থাকেন। তিনি দারোয়ানকে ট্রাক ভেতরে নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন বাড়ির একেবারে পেছনের ফাঁকা জায়গাটিতে ইট-সিমেন্ট, রড ওসব যেন নামানো হয়। তিনটি ট্রাক ভেতরে এল বটে, কিন্তু একটা গোলমাল বেঁধে গেল। বাড়ির পেছনদিকে যদি যেতে হয় একসারি শীতকালীন পুষ্প পিষ্ট করে ট্রাকদের যেতে হয়। হেড মালি কিছুতেই সেটি হতে দেবেন না। শেখ তবারক আলীর একজন ওভারসীয়র ট্রাক থেকে নেমে এসে মালিকে ধমক দিয়ে বললেন–

–স্বয়ং উপাচার্য সাহেব পারমিশন দিয়েছেন, ট্রাক আটকাবার তুমি কে?

–আমি ওই বাগানের হেড মালি। আমার ফুলের গাছ নষ্ট করার অধিকার তোমাদের নেই। ফুল অনেক কষ্ট করে ফোটাতে হয়। তুমি ঠিকাদারের মানুষ রদ্দি মালের কারবারি, ফুলগাছ নষ্ট হওয়ার কষ্ট তুমি কী বুঝবে, বললেন হেড মালি।

–মালি বেটার ফুটানি কত, সরে দাঁড়াও, ট্রাক ওইদিক দিয়েই যাবে, উত্তরে বলল ওভারসীয়র। হেড মালি ওভারসীয়রের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা শুনে ভীষণ তেতে উঠল।

–দেখি ওভারসীয়রের বেটা তুমি ট্রাক চালিয়ে নিয়ে যাও এই আমি শুয়ে পড়লাম। সত্যি সত্যি হেড মালি ফুল গাছের সারির পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। ব্যাপারটা আরো গুরুতর রূপ নিতে পারত। শেখ তবারক আলীর জামাতা আবেদ হোসেন ঘটনাস্থলে এসে পড়ায় একটা মীমাংসা হয়ে গেল। ফুল গাছের সারি দুটো রক্ষা পেল। অনেকদূর ঘুরে ট্রাককে বাড়ির পেছনে যেতে হল।

আজ আবু জুনায়েদের একটা বিশেষ দিন। তাঁর জীবনের একটি প্রিয় স্বপ্ন পূর্ণ হতে চলেছে। তাঁর বাড়িতে একটা গরু আসার উপলক্ষ দেখা দিয়েছে। এখন সেই গরুর গোয়াল তৈরি হতে যাচ্ছে। এর চাইতে প্রিয় ব্যাপার আর কী হতে পারে? তিনি শরীর থেকে স্যুট টাই অপসারণ করে পায়জামা-পাঞ্জাবি পড়ে বেশ ঝরঝরে হয়ে উঠলেন। নিচে যাওয়ার জন্য স্লিপারে পা চালিয়েছেন। অমনি মনে হল আগে সংবাদটা নুরুন্নাহার বানুকে জানানো প্রয়োজন। তিনি শোবার ঘরে গেলেন। দরজা

পেরিয়ে ঘরে প্রবেশ করার আগেই লম্বাটে আয়নাটিতে নুরুন্নাহার বানুর প্রতিফলিত চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। গেল রাতে শেখ তবারক আলীর স্ত্রী তাদের কন্যা দীলুকে যে বেনারশিখানা দিয়েছেন নুরুন্নাহার বানু সেটি পরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছেন। তাঁর হাতে গলায় তবারক আলীর স্ত্রীর দেয়া সোনার অলঙ্কারগুলো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। আবু জুনায়েদ দৃষ্টি ফেরাতে পারলেন না। নতুন বেনারশি এবং অলঙ্কারের সৌষ্ঠবে নুরুন্নাহার বানুকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। আবু জুনায়েদ পা টিপে টিপে এসে নুরুন্নাহার বানুর চোখ দুটো চেপে ধরে দুই গালে চুমো খেলেন। নুরুন্নাহার বানু বেঁকে চুরে আবু জুনায়েদের নাগালের বাইরে চলে গেলেন। তারপর আবু জুনায়েদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। সেই পাষাণ গলানো হাসি দেখে আবু জুনায়েদের কী একটা যেন ঘটে গেল। হাজার বছরের সুপ্ত পিপাসা তাঁর সারা শরীরে জেগে উঠল। তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। দু'হাতে নুরুন্নাহার বানুকে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিতে লাগলেন।

নুরুন্নাহার বানু এবং আবু জুনায়েদ হাত ধরাধরি করে নিচে নামলেন। বাইরে লোকজনের দঙ্গল দেখে ফেলে এই ভয়ে পরস্পরের হাত ছাড়িয়ে নিলেন। ইটের স্তূপ, রডের রাশি এবং সিমেন্টের ইতস্তত ছড়ানো বস্তাগুলো দেখে আবু জুনায়েদের চোখ কপালে ওঠার উপক্রম। তবারক সাহেব একেবারে ঘর বানাবার মাল সরঞ্জাম সব পাঠিয়ে দিয়েছেন। মাল এখনো নামানো হয়নি। ঝটপটে মাল নামানোর কাজ চলছে। শেখ তবারক আলীর জামাই আবেদ হোসেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাল নামানো তদারক করছেন। আবু জুনায়েদ এবং নুরুন্নাহার বানু নিকটে এলে আবেদ হোসেন তাদের সালাম দিলেন। আবু জুনায়েদ অনেকটা অনুযোগের ভঙ্গিতে বললেন,

–আবেদ তুমি ঘরে না এসে বাইরে কেন দাঁড়িয়ে রয়েছ?

–স্যার এদিকটার কাজকর্মের একটা গতি হোক আগে। জবাব দিলেন তবারক আলীর জামাতা।

–তাহলে তবারক সাহেব একেবারে গোয়াল ঘর তৈরি করেই ছাড়লেন। কথার পিঠে কথা বললেন আবু জুনায়েদ।

–স্যার, আব্বার কড়া হুকুম, সাত দিনের মধ্যে গোয়াল ঘর বানিয়ে ফেলতে হবে। এখন কথা হল আপনি কী ধরনের ঘর পছন্দ করবেন সেটা জানার প্রয়োজন আছে। আপনি যে রকম চাইবেন মিস্ত্রিরা বানিয়ে দেবেন। আবেদ হোসেনের কথার উত্তরে জানালেন–

আমার আবার পছন্দ অপছন্দ কী? একখানা গোয়ালঘর হলেই আমার চলে। যে কোনো রকমের একখানা গোয়ালঘর। আমার আব্বা পাটের বেড়া এবং খড়ের চালা দিয়ে গোয়ালঘর বানিয়েছিলেন, সেখানেই সারা জীবন গরু রেখেছেন।

আবেদ হোসেন বললেন,

–স্যার এখন কি আর পাটখড়ির যুগ আছে? তাছাড়া এই মনুমেন্টাল বিল্ডিংয়ের পেছনে যেমন তেমন একটা স্ট্রাকচার খাড়া করে দিলে তো আর চলবে না। আব্বা

বলে দিয়েছেন, এমন ঘর তৈরি করতে হবে যাতে গোটা পরিবেশের সঙ্গে চমৎকারভাবে মানিয়ে যায়।

আবু জুনায়েদ বললেন,

–ভাই আবেদ, তুমি তো জানো বার বছর মাস্টারি করলে মানুষ গাধা হয়ে যায়। আমার পঁচিশ বছর চলছে। তোমাদের যা মন লয় করো, আমার কিছুই মনে আসছে না।

আবেদ জানালেন শেখ তবারক আলী সাহেব দশ বাই বার ফিট ঘরের একটা নকশা এঁকে দিয়েছেন। ঘরটা দেখতে চৌকোমতো হবে। চার পাশের দেয়াল পর্যন্ত উঁচু হবে। সর্বসাকুল্যে উচ্চতা দাঁড়াবে দশফুট। বাকিটা কলাম করতে হবে। ছয়টা ফাঁক থাকবে। দুটো ফাঁকে দুটো দরজা বসবে। সামনের দরজাটা হবে বড়, পেছনের দরজা অপেক্ষাকৃত ছোট। কলামের ফাঁকে ফাঁকে চারটি কাচের জানালা হবে। ঘরে যাতে প্রচুর আলো-বাতাস খেলতে পারে, সেজন্য জানালাগুলো যাতে খোলা এবং বন্ধ করা যায় সে ব্যবস্থা থাকবে। ছাদটা হবে টিনের। কিন্তু নিচে বাঁশের বেড়া ফিট করে দিতে হবে। নইলে গরম কালে খুব গরম হবে। আর দক্ষিণ দিকে ঘরের লাগোয়া একটি টিনের শেড থাকবে। দিনের বেলা গরু এই শেডের নিচে থাকবে। এই পাশে খইল কুড়োর গামলা এবং ঘাস বিচালির 'আড়া' বানানো হবে। আপনারা যাতে মাঝে-মাঝে এসে গোয়ালঘরের পাশে এসে কিছুটা সময় ব্যয় করতে পারেন, সেজন্য উত্তর দিকে আরো একটা শেড নির্মাণ করা হবে। সেখানে সিমেন্ট দিয়ে একটা মস্ত বড় গোল টেবিল বানানো হবে, যার চারপাশে বসার ব্যবস্থা থাকবে।

শেখ তবারক আলীর গোয়ালঘর বানানোর পরিকল্পনা শুনে আবু জুনায়েদ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি বললেন,

–এই রকম একটা বাড়ি পেলে ভাই আবেদ আমিই তো বাস করতে চলে আসি।

আবেদ হোসেন আবু জুনায়েদের কথায় কোনো জবাব দিলেন না। তারপর একটু ঢোক গিলে বললেন,

–গরুটার কথা তো স্যার আপনাকে চিন্তা করতে হবে। সাভার ডেয়ারি ফার্মে সুইডিশ এবং অস্ট্রেলিয়ান গরুর মধ্যে ক্রস ঘটিয়ে একটা বাচ্চা জন্মানো সম্ভব হয়েছে। আব্বা ওই গরুটিই আপনার গোয়ালে পাঠাবার কথা চিন্তা করছেন।

আবু জুনায়েদ কোনো মন্তব্য করলেন না। এতক্ষণ নুরুন্নাহার বানু একটি কথাও বলেননি। তার দুটি কারণ। প্রাতঃমৈথুনের আনন্দের রেশটি তখনো কাটেনি। দ্বিতীয়ত এত কুলি কামিনের মধ্যে মুখ খুললে তিনি মনে করেন, অনাবশ্যক নিজেকে খেলো করে তুলবেন। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ চুপ করে থাকা নুরুন্নাহার বানুর ধাতের মধ্যে নেই। এবার তিনি কথা বলতে আরম্ভ করলেন। বিশেষত আবু জুনায়েদের সে কথাটির প্রতিবাদ করা প্রয়োজন মনে করলেন। আবু জুনায়েদ এক পর্যায়ে বলে ফেলেছেন, প্রস্তাবিত গরুর ঘরটির মতো একটা ঘর পেলে নিজে বাস

করতে আসবেন। আবু জুনায়েদ ফকির মানুষের বেটা। কথায় কথায় ফকিরালি স্বভাবটি তাঁর বেরিয়ে আসে। তবারক চাচার জামাইয়ের কাছে এই কথাটা বলা মোটেই আবু জুনায়েদের উচিত হয়নি। নুরুন্নাহার বানুর মনেও বড় একটি সুন্দর বাড়ি তৈরি করার ইচ্ছে আছে। সেই ব্যাপারটি জানিয়ে দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করলেন।

–আবেদ, তুমি তো আমার ছোট বোনের বর, সুতরাং তোমাকে তুমিই বলব। তুমি কি রাগ করবে?

না আপা রাগ করব কেন, অবশ্যই তুমি বলবেন। জবাব দিলেন আবেদ হোসেন।

নুরুন্নাহার বানু বললেন,

–উত্তরাতে আমাদের বার কাঠা জমি আছে। বাড়ি বানানোর সময়ে চাচাকে ধরে বলব, চাচা আপনি একটা সুন্দর নকশা এঁকে দেন। চাচা সুন্দর সুন্দর বাড়ির নকশা করতে পারেন।

আবেদ বললেন,

–আব্বা বাড়ির প্ল্যান করতে ওস্তাদ। তাঁর সামনে বিদেশী স্থপতি পর্যন্ত পেন্সিল ধরতে সাহস পান না।

এরই মধ্যে মাল সরঞ্জাম নামিয়ে স্তূপ করে রাখা হয়েছে। হেড মিস্ত্রি কোন্ জায়গায় ঘরটা ওঠানো হবে সীমানা নির্দেশ করতে বললেন। আবু জুনায়েদ স্থান নির্বাচন করতে গিয়ে একটু গোলের মধ্যে পড়ে গেলেন। তাঁর ইচ্ছে হল উপাচার্য ভবনের লাগোয়া পেছন দিকটাতেই গোয়াল ঘরটা বানানো ভালো হয়। তিনি পেছনের দরজা খুলে যখন ইচ্ছে গরুটা দেখতে ছুটে আসতে পারেন। কিন্তু মুশকিল হল, চারপাশে ফাঁকা জায়গার মাঝখানে একটা বর্বর হর্তুকি গাছ আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আবু জুনায়েদ বললেন–

ওই হর্তুকি গাছটা কেটে ফেলে এখানে ঘরটা তুললে ভালো হয়। তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন।

আবেদ হোসেন বললেন,

–স্যার আমার একটা কথা আছে। ঢাকা শহরে হর্তুকি বিরলপ্রজাতির বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। সুতরাং গাছটা কাটা ঠিক হবে না। তাছাড়া বসত বাড়ির অত সন্নিকটে গোয়াল ঘর থাকাও উচিত নয়। গরুর গোবর, প্রস্রাবের ঘ্রাণ এসব পীড়াদায়ক বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তার চাইতে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে যে খালি জায়গাটি আছে, সেখানে ঘরটি তৈরি করলে সবদিকে উত্তম হয়।

–আবু জুনায়েদ বললেন,

–আবেদ জায়গাটি উত্তম, কিন্তু অসুবিধের কথা হল কী জানো, গেটের বহির্ভাগের সারা মাঠটা প্যাঁক কাদায় একেবারে ফকফকে হয়ে থাকে। এই এতটা পথ গরুর দেখাশোনার জন্য গোয়াল ঘরে আসা-যাওয়া একটা কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

আবু জুনায়েদের আশঙ্কার জবাবে আবেদ হোসেন বললেন,

–স্যার প্যাঁক কাদা নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। সমস্ত রাস্তাটাই আমরা কংক্রীট দিয়ে বাঁধিয়ে দেব।

ঠিক হল আবেদ হোসেনের নির্দেশিত স্থানে গোয়ালঘর বানানো হবে।

মিস্ত্রিরা ফিতা টেনে জায়গাটা চিহ্নিত করে ফেললেন। আবেদ হোসেন শেখ তবারক আলীর স্বহস্তে আঁকা নকশাখানা ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন। সাত-আটজন মজুর একসঙ্গে দেয়াল বানাবার জন্য মাটি কাটতে লেগে গেল। মাটি কাটাকাটি করতে দেখলে আবু জুনায়েদের খুব ভালো লাগে। বালক বয়সে তাঁরা একটি কুয়ো খনন করেছিলেন। আবু জুনায়েদ সারা দিন বসে থেকে মজুরদের মাটি তোলা দেখতেন। পৃথিবীর গভীরে আরো গভীরে কী আছে জানার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠত। বার বার আব্বাকে প্রশ্ন করতেন,

–আব্বা মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে একেবারে পৃথিবীর বুক ভেদ করে অপর পাড়ে যাওয়া যায় কি না। আব্বা হাসতেন। আবু জুনায়েদ বার বার জানতে চাইতেন। অবশেষে বিরক্ত হয়ে বলতেন,

–দূর পাগলা এমন কথা কেউ বলে নাকি।

মাটি খোড়াখুড়ি করতে দেখলে আবু জুনায়েদের এসব কথা মনে পড়ে যায়।

নুরুন্নাহার বানু তাঁর গায়ে ঠেলা দিয়ে বললেন, তুমি এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি? আবেদকে একবারও চা খেতে বলবে না নাকি?

স্ত্রীর কথা শুনে মনে হল মস্ত অন্যায় হয়ে গেছে। শেখ তবারক আলী সাহেবের জামাইকে একবারও ঘরে যেতে বলেননি। অনেকটা মাফ চাইবার ভঙ্গিতে বললেন–

–ভাই আবেদ রাগ করবে না। আগেই তো বলেছি বার বছর মাস্টারি করলে যে কোনো মানুষ গাধা হয়ে যায়। চলো ঘরে চলো। আবেদ স্মিথ হেসে বললেন,

–স্যার আজ থাক অন্যদিন আসব। এখন আমাকে বুড়িগঙ্গার পাড়ে ছুটতে হবে। একখানি ড্রেজার অচল হয়ে গেছে।

মিস্ত্রিদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে অপেক্ষমাণ পাজেরোতে উঠে স্টার্ট দিল। আবেদ চলে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত আবু জুনায়েদ মজুরদের কাজ দেখতে থাকলেন। তাঁর মনের মধ্যে একটা ছুটির হাওয়া দোলা দিতে থাকল। স্কুল পালানো বালকের মতো একটা নির্মল আনন্দে তাঁর সারা মনপ্রাণ ভরে গেছে। নুরুন্নাহার বানু তাঁর পাঞ্জাবির কোণা আকর্ষণ করে বলল, চলো ঘরে যাই। নুরুন্নাহার বানুর পেছন পেছন তিনি বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলেন। নুরুন্নাহার বানু জানতে চাইলেন–

–আজ কি তোমার অফিস নেই?

–অফিস আছে, কিন্তু ও বেলা যাব। জবাব দিলেন আবু জুনায়েদ।

–ঠিক আছে গোসল সেরে একটু পাক-পরিষ্কার হয়ে নাও, তারপর দুটি খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিয়ে একেবারে বিকেল বেলা অফিসে যাবে।

নুরুন্নাহার বানুর কথার জবাবে আবু জুনায়েদ বললেন,

–আবার গোসল কেন, সকালে তো একবার করেছি।

–গোসল কেন আবার বুঝিয়ে দিতে হবে। নুরুন্নাহার বানু একটা ইঙ্গিত করলেন, নুরুন্নাহার বানু বললেন, চলো আমার সারা গা কুট কুট করছে। তোমার রাতদিন কোনো জ্ঞান নেই।

আট

দু'দিনের মধ্যেই লাল ইটের দেয়াল মাটি ছাড়িয়ে উঠে গেল। সাত আটজন মিস্ত্রি কাজ করছে। সারা দিন তো কাজ করেই হ্যাজাক জ্বালিয়ে আঁধারাত পর্যন্ত কাজ চলতে থাকে। আবু জুনায়েদের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা তাঁর স্বপ্নের গোয়াল ঘর তৈরি হতে যাচ্ছে। ইট গাঁথা হচ্ছে, সিমেন্টে বালু মেশানো হচ্ছে, নির্মীয়মাণ গোয়ালঘরের কোনাকানচিগুলো স্পষ্ট আকার ধারণ করছে। সবকিছুর মধ্য দিয়ে আবু জুনায়েদের আজন্মলালিত স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পেতে যাচ্ছে। গোয়ালঘর তৈরি হবে এবং সেই ঘরে বাস করতে একটি গাভী আসবে। প্রচণ্ড একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার। আবু জুনায়েদের ফুরসৎ খুবই কম। তবু দিনে দুতিনবার গিয়ে মিস্ত্রিদের কাজ দেখে আসেন। অফিসে যাওয়ার আগে একবার দেখেন। দুপুরে খেতে এলে গাড়ি থেকে নেমেই ছুটে যান। বিকেলে যেদিন কাজ থাকে না, ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে পত্রিকা পড়তে পড়তে মিস্ত্রিদের কাজ দেখতে থাকেন। এই অল্প ক'দিনের মধ্যেই দেয়ালগুলোর উচ্চতা চারফুট উঠে গেছে। এখন কলাম বসবে। কলামের ফাঁকে ফাঁকে জানালা। ভেতরে ভেতরে যে উত্তেজনা তিনি অনুভব করছেন, নুরুন্নাহার বানুর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পূর্বেও সে রকম অনুভূতি তাঁর হয়নি।

নুরুন্নাহার বানুর সঙ্গেও তাঁর সম্পর্কটা এখন খুবই ভালো। কোনো দাম্পত্য কলহ নেই, পারিবারিক জীবনে কোনো খিটিমিটি নেই। দুজন যখন একান্তে আলাপ করেন তখন গরুর কথাটা আপনি এসে পড়ে। নুরুন্নাহার যখন প্রথম বাচ্চা পেটে ধরেছিলেন, ওনিয়েও দুজনের মধ্যে এমন সহমর্মিতা দেখা যায়নি। প্রথমবারের গর্ভবতী হওয়ার পর নুরুন্নাহার বানুর মেজাজ সব সময়ে খাট্টা হয়ে থাকত। একটুতেই তিনি রেগে যেতেন, কেঁদে বুক ভাসাতেন এবং আবু জুনায়েদকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করতেন। কেননা আবু জুনায়েদই তাঁর এই ভোগান্তির কারণ। শেখ তবারক আলীর বাড়ি থেকে ফেরার পরপরই নুরুন্নাহার বানুর মনটা নতুন করে আবু জুনায়েদের দিকে ঢলতে আরম্ভ করেছে। নুরুন্নাহার বানুর সাজ পোশাকের বহর এখন অনেক বেড়ে গেছে। প্রতিদিন নতুন করে ভাজভাঙা শাড়ি পরেন। তবারক আলীর স্ত্রীর কাছ থেকে যে সকল অলঙ্কার উপহার পেয়েছেন, পারতপক্ষে সেগুলো শরীর থেকে নামান না। নুরুন্নাহার বানু কীভাবে রাণী রাণী ভঙ্গি সৃষ্টি করা যায়, আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। নুরুন্নাহার বানুর এই সার্বক্ষণিক সাজগোজের ঘটা

দেখে মেয়েটা ভীষণ বিরক্ত হয়ে গেছে। তার একটা প্রত্যক্ষ কারণ অবশ্য আছে। তবারক আলীর স্ত্রী দীলুকে যে বেনারশিখানা উপহার দিয়েছেন, সে কাপড়টার প্রতি নুরুন্নাহার বানুর ভীষণ লোভ। যখন তখন সেই শাড়িটাই পরে বসেন। একদিন মেয়ে বলেই বসল,

আম্মা নানি আমাকে যে শাড়িখানা দিয়েছেন সেটা তুমি যখন তখন পরে বসো কেন? ওটা তো আমার। নুরুন্নাহার বানু মেয়ের কথা গায়ে মাখেন না বিশেষ। দীলু চেচামেচি করলে জবাব দেন,

–তুই তো সারাক্ষণ সালোয়ার কামিজ পরে থাকিস। আমি শাড়িটা এক আধটু পরলে কি তোর শাড়ি ছিঁড়ে যাবে। তোর শাড়ি তো তোরই থাকবে।

–আম্মা ছিঁড়ে না যাক আমার কাপড় তুমি যখন তখন পরে বসবে না। তোমার যদি খুব শখ হয়, তাহলে নানিকে বলো যেন তোমাকেও একখানা কিনে দেন।

মেয়ের কথার কোনো জবাব দেন না নুরুন্নাহার বানু। ঠিক এই রঙের নয়, এই জাতীয় একখানি শাড়ি যদি চাচি তাঁকেও দিতেন খুব ভালো হত। হার, ব্রেসলেট, ইয়ারিং এবং হাতের চুড়ির সঙ্গে এই শাড়িটাই মানায় চমৎকার। চাচির কাছে ওরকম আরেকখান শাড়ি চাইবেন কি না ভেবে দেখেন। না সম্ভব নয়। সেটি তিনি করতে পারবেন না। তিনি উপাচার্যের বেগম। কারু কাছ থেকে কিছু চাওয়ার মধ্যে একটা কাঙালপনা আছে। সেটি তিনি করতে পারবেন না। নুরুন্নাহার বানুর হাতে যখন কোনো কাজ-কর্ম থাকে না, দূরের আত্মীয়দের কাছে টেলিফোন করে সুসংবাদটা প্রকাশ করেন। তবারক চাচা তাঁকে একই সঙ্গে গরু এবং গোয়াল দুটিই উপহার দিতে চাচ্ছেন। নুরুন্নাহার বানুর বাবা যখন বেঁচে ছিলেন তাঁর বড় এবং মেজো দুবোনকেই প্রথম বাচ্চা হওয়ার পর আস্ত গাইগরু উপহার দিয়েছিলেন। প্রথম বাচ্চা হওয়ার পর মেয়েরা স্বাভাবিকভাবেই বাবার কাছে গাভি পাওয়ার প্রত্যাশা করে। এ প্রত্যাশা নুরুন্নাহার বানুরও ছিল। কিন্তু তিনি চাইতে পারেননি। চাইলে বাবা অবশ্যই একটা দুধের গাই দিতেন, যাতে নাতি নাতনিরা দুধ খেতে পারে। তিনি মুখ ফুটে চাইতে পারেননি। কারণ বাবা যদি বলে বসেন, বানু গাই কিনে দিলে তুমি রাখবে কোথায়। তোমার তো মোটে দু'খানা ঘর। যেখানে খাওয়া সেখানে শোয়া, সেখানে রান্না। বাবা মারা গেছেন। তবারক চাচা আছেন, আল্লাহ তাঁকে তৌফিক দিয়েছেন। আর নুরুন্নাহার বানুদের একটা গাই পোষার ক্ষমতা হয়েছে। বাবার দায়িত্ব চাচা পালন করছেন। শেখ তবারক আলী তাঁর বাবার আপন ভাই না হোক, তার চাইতে অনেক বেশি। নুরুন্নাহারের আপন মায়ের পেটের ভায়েরা তার জন্য কতটুকু করে? আব্বার বিষয় সম্পত্তি সব লুটে-পুটে খাচ্ছে। বোনের কথা কি তাদের খেয়াল আছে। বউরা তাদের ভেড়ুয়া বানিয়ে রেখেছে। আল্লাহর কাছে হাজার শোকর, তবারক চাচার সঙ্গে নতুন করে পরিচয় হয়েছে। বাবার মৃত্যুর পর তিনি যে শোক পেয়েছিলেন, তবারক চাচা তার অনেকখানিই ভরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তবারক চাচাকে একখানি দিলও দিয়েছেন। ফাঁকে ফাঁকে তিনি আবু জুনায়েদের কথাও চিন্তা করেন। মানুষটা যেন কী? তবারক চাচা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকদিন ধরে কাজ

করেন, অথচ আবু জুনায়েদ তাঁর কোনো খবর রাখেন না। মানুষটা যেন কী? আগে হলে বলতেন আচাবুয়া গর্দভ। এখন তাঁর মূল্যায়নের ধরনটা একটু পাল্টেছে। এখন তিনি মনে করছেন আবু জুনায়েদ সব সময়ে ভাবের ঘোরে থাকেন। তাই ডানে বাঁয়ে কী ঘটছে সে বিষয়ে দৃষ্টি দিতে পারেন না। [illegible] এটাকে একটা চমৎকার গুণ মনে করেছেন। আবেদ হোসেন কথা দিয়েছিলেন আট দশ দিনে গোয়াল ঘর তৈরি করে ফেলবেন। কিন্তু তৈরি করতে পনের দিন লেগে গেল। তারপরেও কিছু কাজ বাকি পড়ে রইল। উত্তর দিকে যে শেডটা বানানোর কথা ছিল, এখনো অসমাপ্ত রয়ে গেছে। আবেদ হোসেন জানালেন তাঁর ক্যালকুলেশন কখনো ফেল হয় না। এবার হয়ে গেল, কারণ একটা অঘটন ঘটে গেছে। হেড মিস্ত্রির মেয়ে শ্বশুর বাড়িতে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করেছে। হেড মিস্ত্রির জামাই পণের টাকার দাবি নিয়ে অনেকদিন থেকেই মেয়েটার ওপর অত্যাচার করছিল। শেষমেশ অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মেয়েটি আত্মহত্যা করে পণের টাকার দায় থেকে আত্মরক্ষা করেছে। হেড মিস্ত্রিকে মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে ছুটে যেতে হয়েছিল এবং থানা পুলিশ অনেক কিছু করতে হয়েছে। উত্তর দিকের শেডটা আবেদ হোসেন খুব সুন্দরভাবে বানাতে চান। শেখ তবারক আলী তাঁকে সেরকমই নির্দেশ দিয়েছেন। মামুলি মিস্ত্রি দিয়ে সুন্দর জিনিস বানানো যায় না। তাই এ বিলম্ব এবং সেজন্য তিনি লজ্জিত। যা হোক, হেড মিস্ত্রি যখন ঝামেলা মিটিয়ে চলে আসতে পেরেছে, আর দুশ্চিন্তা নেই। এই দু'চারদিনের মধ্যেই সব কমপ্লিট হয়ে যাবে। আবেদ হোসেনের দু'চারদিন দশদিনে গিয়ে দাঁড়াল। একটু বেশি সময় নিল, তারপরেও যে গোয়াল ঘর তৈরি হল, দেখে আবু জুনায়েদের মন প্রশান্তিতে ভরে গেল। আল্লাহ এতদিনে তাঁর একটা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছেন।

আবু জুনায়েদের ইচ্ছে হল এই নতুন বানানো গোয়ালঘরটা তাঁর কিছু বন্ধু-বান্ধবকে দেখাবেন। এমনিতে আবু জুনায়েদের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা তাঁর দল করেন, প্রশাসনিক বিষয়ে নানা ব্যাপারে যাঁরা তাঁকে সাহায্য করেন, তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার হলে যাঁরা তাঁর পক্ষ হয়ে প্রতিবাদ করেন, ইদানীং আবু জুনায়েদ তাঁদের মধ্যে বিশেষ কাউকে কাউকে বন্ধু মনে করতে আরম্ভ করেছেন। আবু জুনায়েদ একটি বিশেষ কারণে সদ্যনির্মিত গোয়াল ঘরখানা সকলকে দেখাতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। সত্যি বটে এটি গোয়াল ঘর এবং আগামীতে এই ঘরটিতে একটি চতুষ্পদ প্রাণী বসবাস করতে যাচ্ছে। কিন্তু ঘরটির নির্মাণশৈলী এত চমৎকার দেখলে চোখটা আপনা থেকেই জুড়িয়ে যায়। পাখির বাসার মতো এই এক টুকরো একখানি ঘর। ঢেউটিনের চালসহ গোটা ঘরখানি যেন মাটি ফুঁড়ে আচমকা সুন্দর একটা মাশরুমের মতো ফুটে বেরিয়ে এসেছে। উপাচার্য ভবনের অসামান্য গাম্ভীর্যের পটভূমিতে এই ছোট্ট ঘরখানা একটি স্বপ্নবিন্দুর মতো ফুটে উঠেছে। আবু জুনায়েদ যখন ভাবেন মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে ঘরটি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবেন না, মনটা বিষাদে ছেয়ে যায়

আবু জুনায়েদ মনে করেন, একই সঙ্গে গরু গোয়াল দুটিই দেখিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দেবেন। যেদিন গরুটা গোয়ালে আসবে কয়েকজনকে সন্ধ্যেবেলা চায়ের নিমন্ত্রণ করবেন। উত্তরদিকে যে শেডটা বানানো হয়েছে সেখানে চেয়ার টেবিল পেতে অতিথিদের নিয়ে বসবেন। কিন্তু গরুটা কখন আসবে? কখন আসবে? এই মহামান্য অতিথি কখন সাধের গোয়ালঘর আলো করতে আসবেন। নিষ্ঠাবান সাধক মন্দির নির্মাণের পর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য যেমন আকুলিত অন্তরে প্রতীক্ষা করতে থাকেন, আবু জুনায়েদের মনেও সে ধরনের আকুলি-বিকুলি জন্ম নিচ্ছিল। আবু জুনায়েদ ভেবে দেখলেন, গরুটা আকাশ থেকে তাঁর গোয়ালঘরের বাসিন্দা বনে যাবে না। শেখ তবারক আলী সাহেব কথা দিয়েছেন তাঁর ভাইঝি এবং নাতনিকে একটা গরু প্রেজেন্ট করবেন। প্রেজেন্ট করা গরু নিরাপদে বসবাস করতে পারে, সেজন্য এই গোয়ালঘর বানিয়ে দেবেন। গোয়ালঘর বানিয়ে তিনি কথা রেখেছেন, কিন্তু গরুটা কখন নিয়ে আসবেন? গরু বিহনে গোয়ালঘরটা যেন কাঁদছে, আবু জুনায়েদের এরকম মনে হল। আবু জুনায়েদ ভেবে দেখলেন গোয়ালঘর বানানোর পেছনে শেখ তবারক অনেক টাকা ব্যয় করে ফেলেছেন। গরু কিনতে আরো টাকার প্রয়োজন। এদিকটা আবু জুনায়েদের দেখার বিষয় নয়। এসব তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং নাতনিকে গিফট করছেন। সুতরাং টাকার অঙ্কে তিনি হিসেব করবেন কেন? কিন্তু গরুটা কখন আসবে? চট করে তাঁর মাথায় একটা চিন্তা খেলে গেল। তবারক সাহেব, তাঁর স্ত্রী, জামাই আবেদ হোসেন এবং কন্যাকে দাওয়াত করলে চমৎকার হয়। তাঁদেরকে একবার তবারক সাহেব দাওয়াত করে খাইয়েছেন, পাল্টা দাওয়াত করা তাঁর একটি সামাজিক কর্তব্য। দাওয়াত খেতে এলে গরুটা কখন আসবে সঠিক তারিখ জানা সম্ভব হবে। আসল তারিখটা জানতে পারলে বাড়তি উৎকণ্ঠার অবসান হবে।

সেদিনই রাতে জুনায়েদ শেখ তবারক আলীকে টেলিফোন করে বসলেন। তবারক সাহেব নিজেই রিসিভ করেছিলেন। আবু জুনায়েদ আগামী শুক্রবারে আবেদ হোসেন, তাঁর স্ত্রী এবং চাচা চাচিকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন। শেখ তবারক আলী বললেন,

–এত ঘটা করে দাওয়াত করার দরকার কী। মেয়ের বাড়ি যখন ইচ্ছে খেয়ে যাব। আবু জুনায়েদ একটু ধান্ধায় পড়ে গিয়েছিলেন। তবে কি তবারক সাহেব আবু জুনায়েদের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন? পরের ব্যাখ্যায় আবু জুনায়েদের কাছে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে গেল। শেখ তবারক আলী বললেন,

–শুনুন জামাই মিয়া দাওয়াত টাওয়াত ওগুলো এখন রাখেন। বানু এবং তার মেয়ে আমার এখানে যতবার ইচ্ছে যখন খুশি আসতে পারেন। এমনকি আপনি এলেও কিছু এসে যায় না। আমি বাস করি একেবারে মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। আমার এখানে কে এল কে গেল কে হিসেব রাখে। কিন্তু স্যার ভুলে যাবেন না আপনি দেশের সবচাইতে বড় বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য। আপনি কী করেন না

করেন শত শত চোখ তাকিয়ে আছে। একটুখানি খুঁত পেলেই আপনার নিজের পেশার মানুষেরাই আপনাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলবে। আপনার বাড়িতে খেলাম না খেলাম এ নিয়ে উতলা হবেন না। আমাদের ভেতরের যে সম্পর্ক সেটা তো তুচ্ছ কারণে নষ্ট হওয়ার নয়। আমি আপনার কাছ থেকে একটা জিনিসই জানতে চাইব।

আবু জুনায়েদ বললেন, বলুন কী বলতে চান?

–গোয়াল ঘরটা আপনার পছন্দ হয়েছে কি না।

আবু জুনায়েদ বললেন,

–হ্যাঁ খুবই পছন্দ হয়েছে। গরুর বদলে যে কোনো রুচিবান মানুষকে এই ঘরে বাস করতে বললে খুশি হয়ে রাজি হবে। আপনার পছন্দবোধ এত উন্নতমানের।

শেখ তবারক আলী বললেন,

–আপনি পছন্দ করেছেন শুনে আমার দিলটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বানুর কেমন লেগেছে?

–আপনাদের মেয়ে তো একেবারে পাগল। লোকজনকে ডেকে দেখাবার জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছে।

–শুনুন জামাই মিয়া, শেখ তবারক আলী বললেন,

–ওটি ঘটতে দেবেন না। এই সমস্ত জিনিস যত কম মানুষ জানে ততই উত্তম। আমি কী বলছি আপনি বুঝতে পারছেন তো?

আবু জুনায়েদ এক মিনিট থামলেন, তারপর বললেন,

–হ্যাঁ পারছি।

–আজ বৃহস্পতিবার। আগামী কাল শুক্রবার। রাত আটটার পরে আমার লোক গরুটা নিয়ে আপনার বাড়িতে যাবে। আপনাকে কিছুটা চিন্তা করতে হবে না। গরুর সঙ্গে খইল ভূষি কুড়া ঘাস সবই যাবে। যে লোক গরুর সঙ্গে যাবে সেই লোকটিই দেখাশোনার জন্য সেখানে থেকে যাবে। দক্ষিণ দিকের শেডটা সেজন্যই তৈরি করা হয়েছে। অনায়াসে বিছানা পেতে একজন মানুষ ঘুমোতে পারে। রাত সাড়ে ন'টা দশটার দিকে আমি এক ফাঁকে একবার দেখে আসব।

আবু জুনায়েদ অবাক হয়ে গেলেন। শেখ তবারক আলী মানুষটির বিশালতা ও সূক্ষ্ম চিন্তার পরিধি দেখে আবু জুনায়েদের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাওয়ার মতো অবস্থা। যে সকল ভাবনা-চিন্তা আবু জুনায়েদের মনে একবারও উদয় হয়নি, শেখ তবারক আলী সেগুলো থরে থরে ব্যাখ্যা করে গেলেন। শেখ তবারক আলী যে তাঁর স্ত্রী নুরুন্নাহার বানুর আপন চাচার অধিক সে কথা তলিয়ে বিচার করবে কে? লোকে যখন জানবে ঠিকাদার শেখ তবারক আলী নুরুন্নাহার বানুকে জড়োয়া গয়নার সেট উপহার দিয়েছেন, মেয়েকে বেনারশি এবং সোনার ঘড়ি দিয়েছেন, আর সুন্দর একটি গোয়ালঘর বানিয়ে দিয়ে একটি মহামূল্যবান গরু পর্যন্ত সেখানে ঢুকিয়ে দিয়েছেন, আবু জুনায়েদের প্রতি একান্ত সহানুভূতিশীল লোকদের মনও বিরূপ হয়ে যাবে। অলঙ্কার হোক, শাড়ি হোক, গোয়াল ঘর, গরু যাই হোক না সবকিছুর একটা

নগদ অর্থমূল্য রয়েছে। কেউ যদি আপত্তি উঠিয়ে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কনস্ট্রাকশন কাজে শেখ তবারককে অধিক সুবিধে দেয়ার জন্য আবু জুনায়েদ এসব ঘুষ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো উপায় থাকবে না। কতিপয় প্রাক্তন উপাচার্যের কেলেঙ্কারির কাহিনীতে ঠিকাদারদের নাম যুক্ত হয়েছিল, আবু জুনায়েদ বিলক্ষণ সেসব অবগত আছেন। তারপরেও আবু জুনায়েদ জেনেশুনে ওই আড্ডার সঙ্গে পড়ে গেলেন। তাঁর প্রতি লোমকূপ পর্যন্ত আঁৎকে শিউরে উঠল। লোকে শুনলে বলবে কী?

এই দুশ্চিন্তাটি মনে স্থায়ী হতে দিলেন না। শেখ তবারক আলী তাঁকে ঘুষ দেননি। তিনি কোনোরকম অর্থঘটিত কোনো কেলেঙ্কারি করবেন একথা স্বপ্নেও তাঁর মনে উদয় হয়নি। মানুষ যা ইচ্ছে বলুক। আবু জুনায়েদের বিবেক পরিষ্কার। শেখ তবারক আলী এ পর্যন্ত উপহার গোয়ালঘর এবং গরুর পেছনে যে অর্থ ব্যয় করেছেন, তার পেছনে ঠিকাদারি স্বার্থসিদ্ধির কোনো মতলব নেই। তাঁর জান্নাতবাসী শ্বশুর একসময়ে শেখ তবারক আলীকে জীবনের আসল বৃত্তিটি ধরিয়ে দিয়েছিলেন। আজ শেখ তবারকের পয়সাকড়ির অন্ত নেই। তার থেকে সামান্য অর্থ যদি জান্নাতবাসী অগ্রজপ্রতিম গোফরান ভাইয়ের কন্যা এবং নাতনির পেছনে ব্যয় করে উপকারের প্রতিদান দিয়ে থাকেন, কার কী বলার থাকতে পারে? তারপরেও যদি কেউ খারাপ কথা বলে তার জবাব দেয়ার ক্ষমতা মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদের আছে। তাঁর যে একেবারে শিরদাঁড়া নেই, একথা ভাবা মোটেও ঠিক হবে না। সব দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন। আগামী শুক্রবারে রাত আটটার পরে তবারক সাহেবের লোক গরু নিয়ে আসবে সংবাদটি নুরুন্নাহার বানুকে জানানো প্রয়োজন। যাতে নুরুন্নাহার বানু কোনো মেয়েলী ভুল করে না বসেন সেজন্য আগাম সতর্ক করে দেয়ার কথাটিও মনে রাখলেন।

শুক্রবার দিন সন্ধ্যা আটটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে আবু জুনায়েদ, নুরুন্নাহার বানু তাঁদের কন্যা দীলু গরুটাকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। আবু জুনায়েদ চাপা স্বভাবের মানুষ। নুরুন্নাহার বানু বারবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলেন। তাঁর সেই পুরনো কুসংস্কারটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে। তাঁর কোনো কাজ সহজে সম্পন্ন হয় না। কোথাও না কোথাও থেকে একটা বিঘ্ন এসে সব ভণ্ডুল করে ফেলে। তাঁর মনে নানারকম সন্দেহ রেখাপাত করে যাচ্ছিল। কী তবারক চাচা গরুটা কিনতে পারলেন কি না। যদিও কিনে থাকেন, গাড়ি ঘোড়ার ভিড় দেখে ভয় পেয়ে ছিঁড়ে কোথাও যদি চলে যায়। দীলু মেয়েটির উচ্ছ্বাস ধরে না। একবার আবু জুনায়েদকে জিজ্ঞেস করে। একবার নুরুন্নাহার বানুকে,

–আব্বা গরুটা আসবে তো। এই তো আটটা বেজে গেল। কখন আসবে। শুধোশুধি আমি টি. ভি. প্রোগ্রামটা মিস করলাম।

নুরুন্নাহার বানু এত বড় ধিঙ্গি মেয়ের আদেখলেপনা দেখে একটা কিল উঠিয়েছিলেন আবু জুনায়েদ তাঁর হাতটা চেপে ধরলেন। অতএব মেয়েটি কিল

খাওয়া থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। ঘড়ির কাঁটা সাড়ে আটটার ঘরে ঠেকেছে। আবু জুনায়েদ নিজেকেই প্রশ্ন করেন, কী ব্যাপার গরু আসে না কেন? এরকম তো হওয়ার কথা নয়। তবারক সাহেব এক কথার মানুষ এবং তাঁর সময়জ্ঞান অত্যন্ত প্রখর। তিনি ধরে নিয়েছিলেন, কোনো একটা অসুবিধে হয়েছে। আজ আর আসছে না।

এ সময়ে দারোয়ান এসে জানাল দুজন মানুষ একটা গরু নিয়ে এসেছে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল সকলের। আবু জুনায়েদ, নুরুন্নাহার বানু, মেয়ে দীলু, ছোকরা চাকর, কাজের বেটি সকলে হুড়োহুড়ি করে নিচে নেমে এলেন। গরুসহ মানুষ দুজন ভেতরে প্রবেশ করল। সত্যি সত্যি একটা গরু উপাচার্য ভবনের কমপাউন্ডের মধ্যে প্রবেশ করল। আবু জুনায়েদের কামনার ধন গরু। নতুন গরু কিনলে গোয়ালে ঢোকাবার আগে কতিপয় আচার পালন করতে হয়। আবু জুনায়েদের তার একটাও মনে নেই। তিনি এত খুশি হয়েছেন যে হঠাৎ করে তাঁর মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরুচ্ছিল না। মানুষ দুজন গরুটাকে বোগোন ভেলিয়ার ঝাড়ের নিচে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন, ছায়াছায়া অন্ধকারে পুরো চেহারাটা কারো চোখে ধরা পড়ছিল না।

নয়

তিনি একটা আলো আনতে বললেন। দারোয়ান ওপরে গিয়ে একটা চার্জার নিয়ে এল। এবার গরুর পুরো চেহারা সকলের নজরে এল। আবু জুনায়েদের ইচ্ছে হল তিনি চিৎকার করে উঠবেন। কী অপূর্ব সুন্দর গরুটি। গায়ের রঙ উজ্জ্বল লাল। মাঝে-মাঝে ডোরা কাটা দাগ। গরুটিকে পৌরাণিক বুররাকের মতো দেখাচ্ছে। যদি দুটি পাখা থাকত, তাহলে পশুটি আকাশের দিকে উড়াল দিত। ওলানটা অল্প অল্প মধু ভর্তি মৌচাকের মতো স্ফীত হওয়ার পথে। সবচেয়ে সুন্দর চোখ দুটি। একটা অসহায় ভাব দর্পণের মতো প্রতিফলিত হচ্ছে। লেজের চামড়াটা সাদা। গরুটা অসহায় এবং কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে লোকজনের দিকে তাকাচ্ছে। অল্প অল্প নড়াচড়া করছে এবং চারপাশ ভালো করে দেখে নিচ্ছে। যখনই গরুটা নড়াচড়া করে গলার ঘণ্টি থেকে টুং টুং টুং আওয়াজ বেরিয়ে আসে। শিকলটা ঝন ঝন ঝন করে বেজে ওঠে। আবু জুনায়েদের সারা জীবনের স্বপ্ন কামনা একটি গরুর আকার ধরে মূর্তিমান হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুল না। তিনি অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে গরুটি দেখছিলেন।

নুরুন্নাহার বানু শিকল ধরে দাঁড়ানো লোকটির কাছে জানতে চাইলেন,

–আচ্ছা গরুর কাছে গেলে ঢুঁসাতে আসবে না তো।

লোকটি উত্তর দিল,

–এ গরু ঢুঁসায় না। লাথি মারে না। ডরের কিছু নাই, যান কাছে যাইয়া আদর কইরা দেহেন।

নুরুন্নাহার বানু বললেন,

–থাক বাবা আমার সাহস হয় না। জানোয়ার তো কখন কী করে বসে।

নুরুন্নাহার বানুর মেয়েটি তাঁর চাইতে সাহসী। সে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে এসে গরুর গলায় হাত রাখল। গরুটি একটু ঘুরে গিয়ে লম্বা জিভ বের করে তার বাহু চাটতে আরম্ভ করল। মেয়েটির কাতুকাতু লাগছিল। দুপা পিছিয়ে এসে কলকণ্ঠে বলে উঠল,

–দেখো দেখো আব্বু গরুটি কেমন করে আমার বাহু চাটতে ছুটে আসছে।

আবু জুনায়েদ বললেন,

–তুমি সরে এলে কেন, চাটতে দাও না। বোঝা যাচ্ছে গরুটির বেশ দয়ামায়া আছে।

এবার উপাচার্য সাহেব এগিয়ে এসে গরুর পিঠে হাত রাখলেন। পশমের মতো সুন্দর কেশের স্পর্শসুখ অনুভব করলেন। গরুটি আবার আবু জুনায়েদের শরীরের অনাবৃত অংশ চাটবার জন্য জিভ বের করল। আবু জুনায়েদ পাঞ্জাবির আস্তিন গুটিয়ে নিয়ে হাতটি প্রসারিত করে দিয়ে বললেন,

–বেটি চাট।

আবু জুনায়েদের ইচ্ছে হল ওলানটা একটু ধরে দেখবেন। স্ত্রী এবং কন্যার উপস্থিতিতে সেটা করা সঙ্গত হবে না মনে হওয়ায় বিরত থাকলেন। তিনি নানা জায়গায় হাত বুলিয়ে গরুর শরীরের উত্তাপ অনুভব করছিলেন। তাঁর স্বামী একটা গরুকে নিয়ে লোকজনের সামনে এত আদিখ্যেতা করবেন, নুরুন্নাহার বানুর সেটা সহ্য হল না। কণ্ঠস্বরে ঝাঁঝ মিশিয়ে বললেন,

–পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করলেই চলবে নাকি! গরুকে তার জায়গায় নিয়ে যাও। খেতে দেবে কী সে কথা চিন্তা করো।

দড়ি ধরে থাকা লোকটি বলে বসল,

–একটা মশারির প্রয়োজন হবে। এই জাতের গরু মশার কামড় সহ্য করতে পারে না।

নুরুন্নাহার বানু বললেন,

–তুমি একটু ঠাণ্ডা হও, আমি দেখি কী করা যায়।

তারপর তিনি ডাক দিলেন,

–ওই বুয়া শুনে যা।

বুয়া এলে বললেন,

–আজ রাতের জন্যে তোমার মশারিটা গরুটাকে দিয়ে দাও। কাল সকালে অন্য ব্যবস্থা করা হবে।

বুয়া বিড়বিড় করে বলল,

–মানুষটাকে মশায় খাউক কুনু চিন্তা নাই। গরুর বাচ্চারে মশারি লাগাইয়া দাও। মাইনষের বিচার।

কিন্তু সে আট-দশ জায়গায় তালিমারা নিজের মশারিটা এনে দিল। লোকটি এক ঝলক দেখেই বলে দিল।

–ওই মশারি ত তিন হাত লম্বা দুই হাত পাশ। গরুটা কত লম্বা জানেন, পৌনে পাঁচহাত চলবে না।

আবু জুনায়েদ বললেন,

–আজকে কোনোরকমে থাকুক, কাল নতুন মশারির ব্যবস্থা করব।

নুরুন্নাহার বানু চটে গেলেন। তিনি কোনো কথা ভেতরে রাখতে পারেন না। লোকজনের সামনেই বলে বসলেন,

–বাড়িতে পারা দিতেই নতুন মশারির দাবি কাল সকাল হলে আরো কত কিছুর প্রয়োজন হবে। আবু জুনায়েদ অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। নুরুন্নাহার বানুর কথাগুলো তবারক সাহেবের কানে গেলে তিনি অসন্তুষ্ট হতে পারেন। তিনি বললেন,

–আঃ তুমি চুপ করো। আমি কিছু একটা ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করব। ভাই আপনি গরুটা ওই দিক দিয়ে গোয়াল ঘরে নিয়ে যান। দারোয়ান গোয়ালঘরের বাতিটি জ্বালিয়ে দাও তো।

দারোয়ান বলল,

–স্যার গোয়াল ঘরে তো আলোর বন্দোবস্ত করা হয়নি। আবু জুনায়েদ এই প্রথমে শেখ তবারক আলীর ব্যবস্থাপনার মধ্যে একটা ত্রুটি আবিষ্কার করলেন।

লোকটি বলল,

–স্যার এই জাতের গরু আন্দাইরে থাকতে পারে না।

আবু জুনায়েদ দিশেহারা হয়ে বললেন,

–কী করব বাবা তুমিই বলে দাও। শুনলে তো গোয়াল ঘরে আলো নেই।

লোকটি বলল,

–আমি একুয়া কথা কমু আপনের মন লয় কি না চিন্তা করবেন।

আবু জুনায়েদ বললেন,

–হা বাবা বলো।

–আজই রাইতে বড় দালানের বারান্দার একপাশে থাকুক।

আবু জুনায়েদ বললেন,

–ঠিক আছে বাবা ওই থামটার সঙ্গে বেঁধে রাখো।

নুরুন্নাহার বানু রেগে মেগে ওপরে চলে গেলেন। কিন্তু মেজাজটা প্রকাশ করলেন না। মনে মনে বলতে থাকলেন, লোকটি বললে গরুটিকে নুরুন্নাহার বানুর বিছানায় শোয়াতে হবে, আবু জুনায়েদ চতুষ্পদের বাচ্চাকে তাঁর খাটে উঠিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

গরুটা থামের সঙ্গে বেঁধে লোক দুজন চলে গেছে। আবু জুনায়েদ এই নিরিবিলি মুহূর্তটিতে সম্মুখ পাছ নানা দিক থেকে দেখছিলেন। এই সময়ে একটি কণ্ঠস্বর শুনলেন।

–স্যার বেয়াদবি মাফ করবেন। পারমিশন না নিয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম।

তিনি তাকিয়ে দেখেন সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তারই বিভাগ অর্থাৎ রসায়ন শাস্ত্রের এসোসিয়েট প্রফেসর আধপাগলা মুস্তাফিজুর রহমান। আবু জুনায়েদ বিরক্ত হয়েছেন। যা হোক, সেটা গোপন করে বললেন,

–কী খবর মুস্তাফিজুর এত রাতে। মুস্তাফিজুর রহমান বললেন,

–স্যার প্রথমেই আপনাকে জানানোর জন্য ছুটে এসেছি। কাজটি আপনার সঙ্গে পরামর্শ করেই শুরু করেছিলাম। এই এতদিনে প্রবলেমটার একটা সলিউশন পাওয়া

গেছে। এই যে দেখুন ইউ. এস. এ-র প্রিন্সটন য়ুনিভার্সিটি থেকে ড. রবার্টসন ফ্যাক্স করে জানিয়েছেন আমার সলিউশনটা কারেক্ট। এই লাইনে ড. রবার্টসন সর্বশ্রেষ্ঠ অথরিটি। কেমিস্ট্রির ইতিহাসে এটা বড় ঘটনা।

মুস্তাফিজ ফ্যাক্সের কপিটা আবু জুনায়েদের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, এই যে দেখুন। আবু জুনায়েদ কপিটা একবার দেখলেন বটে। কিন্তু পড়ে দেখার প্রবৃত্তি হল না। মুস্তাফিজ সাহেবকে বললেন,

–মুস্তাফিজ আমি এখন অন্য চিন্তায় মগ্ন আছি। একটা গরু সংগ্রহ করেছি। ভালো জাতের গরু। মশার আক্রমণ থেকে গরুকে রক্ষা করার জন্য একটি বড়সড় মশারি কোথায় পাওয়া যায়, সে ব্যাপারটা নিয়ে ব্যস্ত আছি। কাল সকালে আপনার ফ্যাক্স পড়ে দেখব। ফ্যাক্সের কপিটা রেখে যেতে পারেন, না নিয়ে যান। কাগজ পত্রের ভিড়ে হারিয়ে যাবে।

মুস্তাফিজ হতাশ ভঙ্গিতে টলতে টলতে বাইরে চলে এলেন। ওই এত রাতে ভুল জায়গায় কেন এলেন? মনে ভীষণ অনুতাপ জন্মাতে লাগল।

রাত সাড়ে দশটার সময়ে শেখ তবারক আলী উপাচার্য ভবনে এলেন। তিনি ছিপ নৌকোর মতো লম্বাটে একটি স্পোর্টস কারে চড়ে এসেছেন।

আবু জুনায়েদকে খবর দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে গরুটাকে নানাদিক থেকে দেখছিলেন। বড় সুন্দর গরু, দেখে দেখে আশ মিটে না। আবু জুনায়েদ বিস্ময় ভরা মুগ্ধতার ভেতরে এতই ডুবে ছিলেন যে শেখ তবারক আলী কখন তাঁর পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছেন, খেয়াল করতে পারেননি। শেখ তবারক কাঁধে হাত রাখলেন। তাঁকে দেখে চমকে উঠলেন। তবারক সাহেবের বদলে চাচা শব্দটি তাঁর মুখে এসেই গিয়েছিল প্রায়। কিন্তু ডাকা হল না। মাথা ঝুঁকিয়ে কদমবুসি করার ইচ্ছেও তাঁকে দমন করতে হল।

শেখ তবারক আলী জিজ্ঞেস করলেন,

–গরু পছন্দ হয়েছে?

–বারে পছন্দ হবে না, এত সুন্দর গরু, জবাব দিলেন আবু জুনায়েদ।

–মা বানু এবং দীলুর পছন্দ হয়েছে?

–সেসব আপনি তাদের কাছ থেকে শুনবেন। চলুন ওপরে যাই।

শেখ তবারক আলী আবু জুনায়েদের পিছে পিছে পা বাড়িয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে বসলেন, গোয়াল ঘরে না নিয়ে গরুটা এখানে বেঁধে রেখেছেন কেন?

–আবু জুনায়েদ জবাব দিলেন,

আপনার লোকটা বলল এই জাতের গরু অন্ধকারে থাকতে পারে না। তাই আজ রাতটা এখানেই রেখেছি।

–সে কি গোয়াল ঘরে কারেন্ট দেয়নি? শেখ তবারক আলী হতবাক হয়ে গেলেন। তারপর আক্ষেপের সুরে বললেন,

–এই সমস্ত ইডিয়টদের নিয়ে কাজ করে সুখ নেই। শেখ তবারক আলী আবু জুনায়েদের সঙ্গে ওপরে এলেন। দীলু নানা এসেছেন, নানা এসেছেন বলে শোরগোল শুরু করে দিল। মজা করে শেখ তবারকের মাথা থেকে টুপিটা তুলে নিয়ে নিজের মাথায় দিল। তিনি আদর করে নাতনির চুল ধরে টানলেন, নাক এবং গাল টিপে দিলেন, বললেন,

টুপিতে নাতনিকে সুন্দর মানিয়েছে।

নুরুন্নাহার বানু এসে চাচাকে সালাম করলেন। শেখ তবারক তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীর মাথায় হাত দিয়ে আদর করলেন, জিজ্ঞেস করলেন,

–কেমন আছ মা বানু?

নুরুন্নাহার বানু রাগত স্বরে বললেন,

–চাচা আপনার সঙ্গে কথা বলব না।

শেখ তবারক অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, কেন মা বানু পাগলি আমি আবার অন্যায়টা কী করলাম?

কথা বলব না তার প্রথম কারণ, আপনি আসবেন বলেছিলেন, আসেননি আর দ্বিতীয়টি থাক বলতে বলতে থেমে গেলেন।

শেখ তবারক আলী বললেন,

–এই তো মা আমি এসেছি, এখন দ্বিতীয় কারণটি বলো।

–চাচা আপনি একটা গরু পাঠিয়ে মস্ত ফ্যাসাদের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন, ঘরে না আসতেই গরুর দাবি জমকালো মশারি চাই। দুদিন পর গরুর জাবনা এবং বিচালি খাওয়ার জন্য রূপোর গামলার দরকার হবে। এসব আমি যোগাব কেমন করে?

নুরুন্নাহার বানুর কথা শুনে শেখ তবারক আলী মৃদু হাসলেন।

–মা বানু, এই নতুন এসেছে, তাই ঝামেলা মনে হচ্ছে, দুদিন যাক গরুটাকে ভালো লাগতে আরম্ভ করবে। তবে এটা খুবই কুলীন জাতের গরু, যত্ন আত্তি তো একটু করতে হবে। সকলের রাশিতে আবার গরু-ছাগল, পশুপাখি এদের বাড় বৃদ্ধি হয় না। পশুদেরও প্রাণের ভেতর থেকে ভালবাসতে হয়। অনাদর, অবহেলা, উপক্ষো এরা মানুষের চাইতে ভালো বুঝতে পারে। পশুপাখির কথা বাদ দাও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি, গাছপালাও অনাদর সহ্য করে না।

তারপর শেখ তবারক আলী গরুটার বংশবৃত্তান্ত বলতে আরম্ভ করলেন। সুইডিশ গাভি এবং অস্ট্রেলিয়ান ষাঁড়ের মধ্যে ক্রস ঘটিয়ে এই বাচ্চাটি জন্মানো হয়েছে। সরকারি লাইভস্টক বিভাগকে তার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। অনেকদিন থেকেই চেষ্টা করে আসছিলেন, একটি মাত্র সফল বাচ্চা জন্মানো সম্ভব হয়েছে। আর সেই বাচ্চাটি এখন বানুদের বাড়িতে এসেছে। ছিপ নৌকোর মতো লম্বা বলেই এই প্রজাতিটির নামকরণ করা হয়েছে তরণী।

দীলু বলল, নানা ঠিক আছে আমরা নতুন গরুটির নাম রাখলাম তরণী। ওকে তরণী নামেই ডাকব।

শেখ তবারক আলী বললেন, মাশাল্লাহ আমার ওই নাতনিটার বুদ্ধি-বিবেচনা ভারি পরিষ্কার। তারপরে শেখ তবারক আলী বলে যেতে থাকলেন, বাংলাদেশে এই প্রজাতির গরু এই একটিই আছে। বাচ্চা অবস্থা থেকে চতুষ্পদ শিশুটির প্রতি অনেকেরই নজর ছিল। গ্লোব ইন্টারন্যাশনালের মালিক নব্য ধনী খলিলুল্লাহ সাহেব নীলামের সময় পঁচাশি হাজার পর্যন্ত উঠেছিলেন। শেখ তবারক এক লাফে আরো পাঁচ হাজার টাকা বাড়িয়ে দিয়ে এই গো-কন্যাটিকে হস্তগত করেছেন তাঁর মেয়ে এবং নাতনির জন্য। এই গরুটির দাম নব্বুই হাজার টাকা। এই পরিমাণ টাকা নগদে শোধ করে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং নাতনির জন্য গরুটা কিনেছেন। শুনে আবু জুনায়েদের মুখের হাটা বড় হয়ে গেল। নুরুন্নাহার বানুর মুখে সহসা কোনো কথা জোগাল না। কেবল দীলু মন্তব্য করল,

–নানা আপনার দীলটা অনেক বড়।

–কত বড়, নাতনি বলো দেখি।

–অনেক বড়, বঙ্গোপসাগরের মতো।

গরুর সেবা-যত্নের বিষয়ে কিঞ্চিৎ পরামর্শ দিলেন শেখ তবারক আলী। তিনি বললেন, গরুটিকে সব সময় না ঠাণ্ডা না গরম জায়গায় রাখতে হবে। শীতের দিনে কুসুম গরম পানি দিয়ে প্রতিদিন গোসল করাতে হবে। আবার গরমের দিনে শীতল পানিতে গোসল করাতে হবে। কম্বল মশারি এসব তো অবশ্যই প্রয়োজন। দেশী ঘাসে গরুটির ভীষণ অরুচি। শেখ তবারক আলী লাইভ স্টক ডিপার্টমেন্টের খামার থেকে নিয়মিত ঘাস সরবরাহের একটা আপাত বন্দোবস্ত করেছেন। ওই জাতীয় ঘাস বাড়ির পেছনে চাষ করানো যায় কি না পরীক্ষা করিয়ে দেখবেন। গরমের দিন যখন আসবে, একটা এয়ারকুলার সেটা করার ইচ্ছেও তাঁর মাথায় আছে। আরো কতিপয় বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়ে শেখ তবারক আলী উঠে দাঁড়ালেন। অনেক সাধ্য সাধনা করেও নুরুন্নাহার বানু, আবু জুনায়েদ, দীলু তাঁকে এক চায়ের অধিক কিছু খাওয়াতে পারলেন না।

দশ

আবু জুনায়েদের দুলালি দীলু একটা মস্ত কাণ্ড করে বসল। আবেদ হোসেনকে দিয়ে গোয়ালঘরের দরজায় একটা নেমপ্লেট লাগিয়ে দেয়া হল। গরুটির যেহেতু তরণী নামকরণ করা হয়েছে, সুতরাং গোয়ালটির নাম হল তরণী নিবাস। আরো কিছু কথা যোগ করার ইচ্ছে দীলুর ছিল– যেমন এই প্রজাতির গরু বাংলাদেশে এই একটিই আছে এবং গরুটির মা-বাবা উভয়েই শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ভূক্ত। বাবা অস্ট্রেলিয়ান, মা সুইডিশ। আবেদ হোসেন দীলুকে বুঝাতে সক্ষম হলেন যে তার কোনোই প্রয়োজন নেই। গরুটি যে একবার দেখবে প্রথম দর্শনেই বুঝে যাবে এটা ভিন্ন জাতের গরু। বাংলাদেশের গরু সম্প্রদায়ের আত্মীয়স্বজন কেউ নয় : এই চতুষ্পদের বেটি। তারপরেও জাতীয়তার বিচারে তরুণীকে বাংলাদেশী বলতে হবে, কারণ তার জন্মস্থান বাংলাদেশ। অন্য কেউ হলে দীলুকে অত সহজে নিবৃত্ত করা যেত না। তবে আবেদ হোসেনের কথা আলাদা। আবেদ ভাই দেখতে কী হ্যান্ডসাম। আমেরিকায় পড়াশোনা করেছেন, অথচ একটুও অহঙ্কার নেই। কী রকম সপ্রতিভভাবে কথা বলেন। পাজেরোর স্টিয়ারিং হুইল ধরার ভঙ্গিটা কী চমৎকার। দীলুর তো ইচ্ছে করে আবেদ ভাইয়ের সঙ্গে একটু ঘুরে টুরে আসে।

তরণী, হ্যাঁ গরুটিকে এখন থেকে এ নামেই ডাকতে হবে। অস্ট্রেলীয় বাবার ঔরসে সুইডিশ মাতার গর্ভে যার জন্ম, বাংলাদেশের মাননীয় পশু বিশারদেরা দেশী নৌকার সঙ্গে যার আকৃতির সাদৃশ্য দেখতে পেয়ে এই চমৎকার নামটি দিয়েছেন, তার প্রতি সম্মান না দেখালে অন্যায় করা হবে। তরণী 'তরণী নিবাসে' আসার পর থেকে আবু জুনায়েদের পারিবারিক জীবনে নানারকম গণ্ডগোল ঘটতে আরম্ভ করল।

আবু জুনায়েদ অতিশয় কর্মব্যস্ত মানুষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্প্রদায়, কর্মচারীমণ্ডলী, ছাত্রছাত্রীর কাছে কোথাও না কোথাও একটা ঘাপলা প্রতিদিন লেগেই আছে। কোথাও খুন হচ্ছে, কোথাও ভাঙচুর চলছে, মাইনে বাড়ানো, পরীক্ষা পেছানো এই জাতীয় কত রকমের দাবি বর্শার চকচকে ফলার মতো ধারালো হয়ে জেগে উঠছে। সরকারের মন্ত্রিমহোদয় চোখ রাঙাচ্ছেন, বিরোধী দলের নেতা হুঙ্কার দিচ্ছেন, সবকিছুর দায়ভাগ শেষ পর্যন্ত আবু জুনায়েদকেই বইতে হয়। কোন্ দিক তিনি সামলাবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রুটিন বাঁধা প্রশাসনিক কাজের পরিমাণও অল্প

নয়। সামাল দিতে গিয়ে আবু জুনায়েদকে হিমশিম খেয়ে যেতে হয়। তার ওপর চারদিকে অসন্তোষ। তাঁর নিজের দলটির শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে ঝগড়া-ফ্যাসাদ লেগেই আছে। অনেক কিছুর আশায় যাঁরা ডোরাকাটা দলে যোগ দিয়ে আবু জুনায়েদকে সমর্থন করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনামুখর হয়ে উঠেছেন। দল ছেড়ে যাবেন বলে হুমকি দিচ্ছেন। তাঁর বিরুদ্ধপক্ষের লোকেরা প্রচার করতে আরম্ভ করেছেন, প্রাক্তন উপাচার্য আবু সালেহ পাঁচ বছরে যে পরিমাণ অনিয়ম করতে পারেননি আবু জুনায়েদ পাঁচ মাসে তার দুগুণ করে ফেলেছেন। শুধুমাত্র তাঁর দলের শিক্ষকদেরই পদোন্নতি ঘটেছে। বিদেশে যাওয়ার সুযোগ তাঁরাই হাতিয়ে নিয়েছেন, তাঁদের নামেই বাড়িগুলো বরাদ্দ হয়েছে। প্রভোস্ট, হাউস টিউটর থেকে শুরু করে দারোয়ান, মালি পর্যন্ত সবগুলো চাকরি আবু জুনায়েদের লোকেরা বাগিয়ে নিয়েছে। চারদিকের তাপ চাপে আবু জুনায়েদের ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। আবু জুনায়েদের নিশ্বাস ফেলার ফুরসত মেলে না। সকালে মিটিং, দুপুরে মিটিং, সন্ধ্যেয় মিটিং। সবগুলো মিটিংয়ে তাঁকে প্রিসাইড করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নম্বর ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও কোথাও নিজের মতামত আরোপ করতে পারেন না। প্রায় সময়ই আবু জুনায়েদকে নিজের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। মাঝে-মাঝে আবু জুনায়েদের মনে হয়, মাছঅলা তরকারিঅলার সঙ্গে দরাদরি করার সময় তিনি যে ব্যক্তিত্বের স্বাদ পেতেন, স্বাধীনতার যে উত্তাপ অনুভব করতেন, উপাচার্যের চেয়ারে বসার পর সেসব উধাও হয়ে গেছে। তিনি একটা যন্ত্রে পরিণত হয়েছেন। তিনি কিছুই করছেন না, তাঁকে দিয়ে করিয়ে নেয়া হচ্ছে। তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছে অনিচ্ছের কোনোও মূল্য নেই।

আবু জুনায়েদের মন মেজাজ ইদানীং খুব খিচরে থাকে। মন খুলে কথা বলার মতো কোনো বন্ধু তাঁর নেই। নুরুন্নাহার বানুর সঙ্গে তাঁর কোনোরকম ভাব বিনিময় সম্ভব নয়। এখন নুরুন্নাহার বানুর অধীনে অনেক চাকর বাকর। নিজের হাতে কুটোটি ছিঁড়তে হয় না। এই বাড়তি সময় তিনি রূপ চর্চার কাজে ব্যয় করেন। মেয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মুখে কাঁচা হলুদ, মশুর ডাল বাটা এসব মাখেন। শ্যাম্পু দিয়ে মাথার হাল্কা হয়ে আসা চুলগুলো ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে তোলেন। জুতোর হিলের উচ্চতা বৃদ্ধি করেই যাচ্ছেন। যখন তখন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যান, আবু জুনায়েদ প্রয়োজনের সময়ও গাড়ি পান না।

ভেতর বাইরে দুদিকের চাপ যখন প্রবল হয়ে ওঠে, আবু জুনায়েদ তরণী নিবাসে গরুটির কাছে ছুটে যান। ক্রমাগত যাওয়া-আসার ফলে গরুটি তাঁকে চিনে ফেলেছে। তিনি যখন সামনে গিয়ে দাঁড়ান, গরুটি তার দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকে। তিনি যে খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছেন, গরুটি বুঝতে পারে। আবু জুনায়েদ তরণীর মসৃণ পিঠে হাত বুলিয়ে দেন। কুচিকুচি করে কাটা ঘাসের চুপড়িটা সামনে ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। তরণী ধীরে-সুস্থে মন্থরভাবে অল্প অল্প ঘাস গলায় চালান করতে থাকে। তরণীর কাছে যতক্ষণ থাকেন তিনি সম্পূর্ণভাবে

ভিন্ন জগতের বাসিন্দা হয়ে যান। তাঁর মনে কোনো সন্তাপ, কোনো দুশ্চিন্তা থাকে না। তিনি নিজের কাছে অনেক পরিমাণে লঘু হয়ে উঠতে পারেন। শেখ তবারক আলী যে লোকটিকে নিয়োগ করেছেন, তার কাছ থেকে তরণী সংক্রান্ত নানা সংবাদ খুটিয়ে খুটিয়ে জানতে চেষ্টা করেন। তিনি জেনেছেন তরণী এখন তিনমাসের গাভিন। ছয় মাসের মধ্যে তার বাচ্চা হবে। তখন তরণী মাসে আধমন করে দুধ দেবে। কিন্তু গাভিন অবস্থায় এ ধরনের গরুকে খুব সাবধানে রাখতে হয়। গরুকে নিয়মিত হাঁটা চলা করানো প্রয়োজন, যাতে করে তার শরীরের সবগুলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সচল থাকে। প্রসব করার সময় যে কঠিন শ্রম করতে হবে, তার জন্য নানা পদ্ধতি প্রয়োগ করে আসন্ন গুরু দায়িত্বসম্পর্কে তরণীকে প্রস্তুত করতে হবে। কী কী করতে হবে, তার সবটা লোকটিরও জানা নেই। যখন সময় ঘনিয়ে আসবে তবারক সাহেব বলেছেন, নিয়মিত ডেয়ারি ফার্ম থেকে পশু ডাক্তার এসে দেখে যাবেন। তরণীর পেটের বাচ্চাটির সম্বন্ধেও আবু জুনায়েদ কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। স্থির করলেন কীভাবে নিরাপদ প্রসব করানো যায়, সে বিষয়ে তিনি খবরাখবর নেবেন।

এই চতুষ্পদ দুহিতার কাছে আসা-যাওয়া করতে গিয়ে আবু জুনায়েদের সামনে শব্দ এবং রূপের একটা নতুন জগৎ উন্মোচিত হল। আবু জুনায়েদ গ্রামের ছেলে। গ্রামে থাকতে তিনি কখনো পাখির ডাক শুনেছেন মনে পড়ে না। গাছে পাতা হয়, এ তথ্য তার অজানা ছিল না। কিন্তু মাঘ মাসে শীর্ণ গাছের শরীর থেকে কী করে পত্রাঙ্কুর বিকশিত হয়, তিনি দেখেননি। পড়ন্ত বিকেলে নিরিবিলি গরুটিকে সঙ্গ দান করতে গিয়ে গাছের ডালে ডালে পাখিদের ওড়াউড়ি প্রত্যক্ষ করেন। তিনি ঘুঘুদের গলা ফুলিয়ে ডাকতে শোনেন। বুলবুলির টুকরো টুকরো মিষ্টি আওয়াজ, শালিকের কিচির মিচির ডাক, দোয়েলের একটানা শিস শুনতে শুনতে আবু জুনায়েদ ভিন্ন জগতের মানুষ হয়ে যেতেন। তিনি ভাবতে থাকেন, মানুষের ভেতর এত প্রতিহিংসা, এত রেষারেষি, এত ইঁদুর দৌড় কেন? মানুষের জীবন কত সংক্ষিপ্ত। পাখিদের ডাক শুনেই তো একটা জীবন কাটিয়ে দেয়া সম্ভব। তরণী নিবাসের পাশের জারুল গাছটির ডালে পাতা গজাতে আরম্ভ করেছে। পয়লা রঙ ছিল বেগুনি, এখন সবুজ হয়ে উঠেছে। জন্মানো থেকে ঝরে পড়া পর্যন্ত গাছের পাতারও একটি নিজস্ব জীবন আছে। এ রকম সময়ে আবু জুনায়েদকে এক ধরনের দার্শনিকতায় পেয়ে বসে। ইতঃপূর্বে যে কথা তাঁর মনে আসেনি, সেসব বিষয় আস্তে আস্তে চিন্তার ভেতর ঘাই মারতে থাকে। মানুষের পরমায়ু কত সংক্ষিপ্ত এই যে মানব জীবন, তা কি একেবারে অর্থহীন? নাকি মানব জীবনের একটা লক্ষ্য আছে।

আবু জুনায়েদের জীবন নিজের অজান্তেই তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। নিয়মিত অফিসে যান, আসেন। নিজের দলের লোক তাঁকে অপদার্থ বলে সমালোচনা করেন। বিরুদ্ধ পক্ষের লোক তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগ এনে জনমত তৈরি করছেন সরকার ধাতানি দেন, বিরোধী দল হুমকি দেন। ছাত্রেরা প্রতিদিন চেপে ধরে স্পঞ্জের মতো রস বের করে ছাড়ছে। পাশাপাশি

রয়েছে তাঁর পারিবারিক জীবন। আবু জুনায়েদের তিনটি প্রাণী মাত্র। স্ত্রী নুরুন্নাহার বানু, মেয়ে দীলু এবং স্বয়ং তিনি। পারিবারিক জীবনেও আবু জুনায়েদ সুখী নন। নুরুন্নাহার বানুর চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়েই চলছে তাঁর দুর্মূল্য জড়োয়া গয়না হয়েছে। হুকুম তামিল করার চাকর-বাকর হয়েছে, এমনকি লাবণ্যও অনেকদূর বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিধি অনেকদূর বিস্তৃত। বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ার শিক্ষক গিন্নি যাঁরা অতীতে নুরুন্নাহার বানুর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেননি, দেখিয়ে দিতে চান, ফারাকটা কতদূর। নুরুন্নাহার বানু কোথায়, আর তাঁরা কোথায়? তাঁর ভাইরা যে সমস্ত ছোট লোকদের মেয়েদের বউ করে এনেছেন, তাদের সঙ্গেও একটা ফয়সালা করতে হবে বৈকি। সারা জীবন ভায়ের বউরা তাঁকে অবজ্ঞা করে এসেছে, এবার নুরুন্নাহার বানুর জবাব দেবার পালা। শেখ তবারক আলীর বাড়িতে যে অত্যাধুনিক বহুমূল্য গৃহ সরঞ্জাম দেখে এসেছেন, সে রকম সাজ সরঞ্জাম তাঁরও চাই। নুরুন্নাহার বানু মুখে না বললেও স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, সে রকম সাজ সরঞ্জাম তাঁর এই সমস্ত দাবি আবু জুনায়েদকেই পূরণ করতে হবে। তিনি তাঁর সমস্ত সাধ আহ্লাদ পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে লোকজনের সামনে কলেমা পড়ে বিয়ে করেছেন। আবু জুনায়েদ কোন মুখে কোন সাহসে এখন না করবেন। নুরুন্নাহার বানু কি যেমন তেমন বাপের বেটি। তাঁর আব্বা কি আবু জুনায়েদের লেখাপড়ার সমস্ত ব্যয় ভার বহন করেনি? দিনে দিনে আবু জুনায়েদের পারিবারিক জীবনটা একটা নরককুণ্ড হয়ে উঠল। অফিস এবং পারিবারিক জীবনের পাশাপাশি হালফিল আবু জুনায়েদ আরেকটা গোপন জীবনের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। আবু জুনায়েদ মনে করেন, এই দিকটি যদি তাঁর সামনে প্রকটিত না হত, তার জীবন আরো অনেক বেশি ব্যথা দীর্ণ হয়ে উঠত। মনে মনে আবু জুনায়েদ গরুটার কাজে ঋণী অনুভব করেন। গরুটা সময়মতো তাঁর গোয়ালে এসেছিল বলেই আবু জুনায়দের কাছে জীবন অনেকখানি সহনীয় হয়ে উঠেছে। তিনি রাতের বেলা ঘুমোতে যাবার আগে চিন্তা করেন সকালে ঘুম থেকে উঠে গরুটার মুখ দেখবেন। অফিসে যাওয়ার সময় ভাবেন, ফিরে এসে গরুটাকে দেখতে পাবেন। এমনি করে গরুকে কেন্দ্র করেই তাঁর গোটা জীবনের মধ্যে একটা চোরা আবর্ত সৃষ্টি হল।

একদিন বিকেল বেলা ফিন্যান্স কমিটির মিটিং ছিল। বরাবরের মতো আবু জুনায়েদ প্রিসাইড করছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন্ খাতে কত টাকা বরাদ্দ করা হবে, বাজেট তৈরির বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। এই মিটিংয়ে কোষাধ্যক্ষ সাহেবও ছিলেন। নিরপেক্ষ এবং ন্যায়বান শিক্ষক হিসেবে ড. আকরাম সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। আলোচনার এক পর্যায়ে ইতিহাস বিভাগের এক ফাজিল ছোকরা সরাসরি আবু জুনায়েদের চোখে চোখ রেখেই বলে বসলেন, আবু জুনায়েদের কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচুর অর্থের অপচয় হয়েছে। তিনি তাঁর দলভুক্ত কতিপয় অযোগ্য ব্যক্তিকে নানা প্রকল্পের পরিচালক করে দিয়েছিলেন বাজেটের টাকা শেষ হয়ে গেছে, অথচ কোনো প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি। ফসিউদ্দিনের কাছ থেকে আবু

জুনায়েদ ওরকম ব্যবহারই আশা করেছিলেন ফসিউদ্দিনের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছিল না। একটা থার্ডক্লাস এবং ব্রেক অব স্টাডি ছিল। একজন ছাত্রীর অভিভাবকও শিক্ষক সমিতির কাছে সরাসরি লিখিত অভিযোগ করেছিলেন যে তিনি তাঁর কন্যাকে উত্যক্ত করেছেন। এত সব সত্ত্বেও আবু জুনায়েদ একা এককাট্টা হয়ে তাঁকে প্রফেসর বানিয়েছেন। অনেক প্রবীণ ব্যক্তিদের পাশ কাটিয়ে তাঁকে ফিন্যান্স কমিটিতে নিয়ে এসেছেন। সেই লোকটি আজ মিটিংয়ে তাঁকে তুলোধুনো করে ছাড়লেন। সবচাইতে দুঃখের কথা হল, আকরাম সাহেব ফসিউদ্দিনের পক্ষেই কথা বলেছেন। কমিটির কেউ তাঁকে সমর্থন করতে এগিয়ে এলেন না।

আবু জুনায়েদ ঠাণ্ডা স্বভাবের মানুষ। মুখের ওপর গালমন্দ করলেও চটার স্বভাব তাঁর নয়। মেজাজের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য দিলরুবা খানম বলে থাকেন আবু জুনায়েদের শরীরে মাছের রক্ত। তাঁর মাথাটা অপেক্ষাকৃত ছোট বলেই দিলরুবা খানম ইদানীং বলতে আরম্ভ করেছেন, মানুষের শরীরে বোয়াল মাছের মাথা জুড়ে দিলে যেমন লাগে আবু জুনায়েদকে অবিকল সে রকম দেখায়। রসিকতাটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে গেছে। আবু জুনায়েদের কানেও এসেছে। বোবা প্রাণীর মতো সহ্য করা ছাড়া আবু জুনায়েদের করবারই বা কী আছে! কিন্তু আজকে ফিন্যান্স কমিটির মিটিংয়ে নাজেহাল হওয়ার ব্যাপারটি তাঁকে প্রচণ্ড রকম জখম করে ফেলল। তাঁর মনে হতে লাগল তিনি কতগুলো হিংস্র প্রাণীর সমাজে বাস করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যালুমনাই এসোসিয়েশনের সভায় বক্তৃতা দেয়ার কথা ছিল। তাঁর মনটা এত খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে ঠিক করলেন যাবেন না। ব্যক্তিগত সহকারীকে বলে দিলেন, যেন জানিয়ে দেয়া হয়, তিনি সুস্থ বোধ করছেন না, সুতরাং এ্যালুমনাই এসোসিয়েশনের সভায় যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। আবু জুনায়েদ সরাসরি বাড়িতে চলে এলেন।

বাড়িতে এসে দেখেন নুরুন্নাহার বানু রেগে আগুন হয়ে আছেন। আজ তাঁর বড় বোনের ছোট মেয়ের গায়ে হলুদের দিন। নুরুন্নাহার বানু গাড়িতে করে অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। তিনি বলে দিয়েছিলেন, ড্রাইভার যেন বেলা চারটার দিকে এসে নিয়ে যায়। ড্রাইভার তাঁকে আনতে যায়নি। এসে যখন কারণ জানতে চাইলেন ড্রাইভার একগাল হেসে জানাল সাহেব তাকে না করেছে। আসলে তিনি এরকম কিছু বলেননি। তিনি বলেছিলেন ফিন্যান্স কমিটির মিটিংয়ের শেষে তিনি এ্যালুমনাই এসোসিয়েশনের সভায় যাবেন। ড্রাইভারকে সেখানে তাঁকে নিয়ে যেতে হবে। মিটিং শেষ করে আবু জুনায়েদ ফিরে আসবেন, তারপর ড্রাইভারের ছুটি।

আবু জুনায়েদ বাড়িতে এসে দেখলেন, এই ভরসন্ধ্যে বেলা নুরুন্নাহার বানু খাটের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছেন। তিনি প্রমাদ গুনলেন। নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। ফাটাফাটি না বাঁধিয়ে নুরুন্নাহার বানু ছাড়বেন না। আবু জুনায়েদ ভীষণ শঙ্কিত হলেন। তিনি কপালে হাত রাখলেন। শরীর ঠাণ্ডা। আস্তে আস্তে গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলতে লাগলেন, এই ওঠো, এই সন্ধ্যে বেলায় শুয়ে থাকলে শরীর খারাপ করে। নুরুন্নাহার বানু ওইটুকুর অপেক্ষা করছিলেন। চিৎকার দিয়ে উঠলেন,

—আমার শরীর খারাপে তোমার কী আসে যায়। প্রতিদিন নিজে অপমান করো, আজ ড্রাইভার দিয়ে এই এতগুলো মানুষের সামনে অপমান করালে। তোমাকে ছোটলোকের বাচ্চা না বলে বলব কী? ছোটলোকের বাচ্চা নুরুন্নাহার বানু তাঁকে এই প্রথম বলছেন না, বিয়ের পর থেকেই এই ডাক শুনে আসছেন এবং শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না ড্রাইভার কীভাবে অপমান করতে পারে। তিনি ড্রাইভারের সন্ধানে গেলেন। দারোয়ান জানাল, ড্রাইভার গ্যারেজে গাড়ি রেখে চলে গেছে। আবু জুনায়েদকে ঘটনাটি মেয়ে দীলুর কাছ থেকে শুনতে হল। দীলু জানাল, কথামতো না যাওয়ায় তাকে এবং তার আম্মাকে বেবিট্যাক্সি করে মীর হাজির বাগ থেকে আসতে হয়েছে। আবু জুনায়েদ ভেবে দেখলেন, ড্রাইভার বেচারির কোনো দোষ নেই। আবু জুনায়েদের নিজের ভুলের জন্য এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তিনি মনে করলেন, এই কথাটা নুরুন্নাহার বানুকে বুঝিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করবেন। তিনি যখন ব্যাখ্যা করার জন্য ঘরে ঢুকলেন, দেখেন নুরুন্নাহার হাপুস হুপুস শব্দ করে কাঁদছেন। আবু জুনায়েদকে দেখামাত্র তাঁর মুখ ছুটে গেল। শ্রীমুখ থেকে নানা রকমের গালাগাল নির্গত হতে লাগল। নুরুন্নাহার বানুর সম্পর্কে একটা মজার ব্যাপার হল এই যে, কাপড়চোপড়ে বেশবিন্যাসের দিক দিয়ে তিনি শহরের অভিজাত মহিলাদের সঙ্গে পাল্লা দেয়ার কথা চিন্তা করলেও যখন প্রয়োজন হয়, সুপ্ত উৎস থেকে গ্রাম্য গালাগালগুলো তাঁর বাকযন্ত্র দিয়ে কই মাছের মতো উজিয়ে আসতে থাকে। মুখের সুখ মিটিয়ে শান্ত হলেন না। তারপর দেয়ালে মাথা ঠুকতে লাগলেন। অত যত্নে বিউটি পারলারে গিয়ে বাঁধানো খোপা খুলে যাওয়ার ভয়ে অধিক ঢুসাঢুসি করলেন না। রাগ প্রকাশের অধিকতর একটি কার্যকরী পন্থা বেছে নিলেন। পানির জগ, চায়ের পেয়ালা, পিরিচ, ফুলদানি যা হাতের কাছে পেলেন আছড়ে আছড়ে ভাঙতে থাকলেন। আবু জুনায়েদ টু শব্দটি করলেন না। চাকর বাকরেরা শোয়ার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে এই প্রলয় কাণ্ড দেখল। আবু জুনায়েদ সকলের সামনে দিয়ে দাগি আসামীর মতো মুখ করে শোয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁকে কারো কিছু বলার সাহস হল না।

সে রাতে আবু জুনায়েদ খাবার স্পর্শ করলেন না। কারো সঙ্গে কথা বললেন না। তিনি দোতলার বারান্দায় পায়চারি করতে থাকলেন। দুবার ফোন এসেছিল, বলে পাঠিয়েছেন কথা বলতে পারবেন না। রাত যখন এগারটার মতো বাজে আবু জুনায়েদ উপাচার্য ভবনের বাইরে এসে বাগানে ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। তাঁর ঘরে প্রবেশ করতে ইচ্ছে হল না। পায়ে পায়ে তিনি তরণী নিবাসে চলে এলেন। দেখাশোনা করার লোকটি রাতের বেলা থাকে না। বেলা আটটা বাজলেই চলে যায়। তিনি গোয়াল ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালিয়ে দেখেন তরণী লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। আবু জুনায়েদ মশারির দড়ি খুলে দিয়ে গরুটার শরীর স্পর্শ করলেন। আবু জুনায়েদের ছোঁয়া লাগা মাত্রই গরুটা একলাফে শোয়া থেকে উঠে দাঁড়াল। তরণীর চোখে আবু জুনায়েদের চোখ পড়ে

গেল। তাঁর মনে হল গরুটি ছলো ছলো দৃষ্টিতে তার প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করছে। আবু জুনায়েদ সবকিছু ভুলে গিয়ে গরুটাকে আদর করতে থাকলেন। তরণী একটু পেছনে হটে গিয়ে আবু জুনায়েদের হাত পা গাল চাটতে লাগল। আবু জুনায়েদের মনে হল এই বোবা প্রাণীটি ছাড়া তার বেদনা অনুভব করার কেউ এই বিশ্বসংসারে নেই। গরুটা নির্বাক নয়নে আবু জুনায়েদের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ আবু জুনায়েদের ওলানের দিকে চোখ গেল। বাচ্চা হবে, বাঁটগুলো আস্তে আস্তে পুষ্ট হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। হঠাৎ করে ওলানটা ধরে দেখবার ইচ্ছে তাঁকে পেয়ে বসল। প্রথম গরুটা দেখার সময়ও এরকম একটা ইচ্ছে তার মনে জেগেছিল। কিন্তু তিনি সঙ্কোচবশত ওলানের তলায় হাত দিতে পারেননি। কোনো মানুষের সামনে এটা করা কোনোদিনই সম্ভব হত না। গভীর রাতে সবকিছু বাঁধন আলগা হয়ে পড়ে, এমনকি চেতনার শাসন অস্বীকার করে স্বপ্নেরা ভিড় করে বাইরে আসার অবকাশ পায়। সুতরাং, আবু জুনায়েদের মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা ইচ্ছেটা পূরণ করতে বাধা কোথায়। তিনি ওলানের তলায় হাত দিয়ে বাঁটগুলো টিপে টিপে দেখছিলেন। তরণীর বোধহয় এই স্পর্শসুখ ভালো লাগছিল। গরুটি পেছনের পা দুটি ফাঁক করে আবু জুনায়েদকে অধিকতর অবকাশ করে দিল। ওলানটা রক্তিম বর্ণের। এই তুলতুলে মাংসপিণ্ড স্পর্শ করা মাত্রই তাঁর স্মৃতিতে ভেসে উঠল, আজ থেকে অনেকদিন আগে, যখন তাঁর সবে গোঁফ গজিয়েছে, শিশ্নের মধ্যে বীর্যসঞ্চার হয়েছে, এক দূর সম্পর্কীয়া মামী আবু জুনায়েদকে দিয়ে তাঁর বিশাল বিশাল স্তন মর্দন করিয়েছিলেন। আবু জুনায়েদের মনে সেই পুলক, সেই অনুভূতি জেগে উঠল। আবু জুনায়েদের মনে হল তরণীর এই রক্তিম ওলান, এই স্ফীত বাঁটগুলোর মধ্য দিয়ে চরাচরের নারীসত্তা প্রাণ পেয়ে উঠেছে।

আবু জুনায়েদের হাতে ঘড়ি ছিল না। রাত কত হয়েছে ধারণা নেই। একসময় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আবু জুনায়েদ উঠে দাঁড়ালেন। মশারিটা ফের খাটিয়ে দিতে গিয়ে দেখতে পেলেন জানালার পাশে মনুষ্যছায়া বাঁকা হয়ে পড়েছে। আবু জুনায়েদ একটু শিহরিত হলেন। এতরাতে এই গোয়াল ঘরে তাঁর খোঁজ করতে কে আসতে পারে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে?

আমি, নুরুন্নাহার বানুর কণ্ঠস্বর।

–তুমি এখানে কেন এসেছ, আবু জুনায়েদ জানতে চাইলেন।

আবিয়ানো গাইয়ের ওলানে কী খোঁজ করছ একটু দেখে জীবন সার্থক করতে এলাম।

আবু জুনায়েদ আশা করেন নি নুরুন্নাহার বানু এভাবে তাঁর ওপর গুপ্তচর বৃত্তি করতে পারেন। প্রথমে একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। সেটা সামলে উঠলেন। চরম বিতৃষ্ণায় তিনি চিন্তা করলেন, এই মেয়ে মানুষটির হাত থেকে এ জীবনে তিনি নিষ্কৃতি পাবেন না। নুরুন্নাহার বানুর কথার জবাব দিতে গিয়ে সমান রূঢ়তা সহকারে বলে বসলেন।

–সেটা জেনে তোমার লাভ কী? তোমার কী আছে? তুমি ওলানের মধ্যে কী খোঁজ করছি এটা জানতে এখানে গুপ্তচরগিরি করতে এসেছ? অথচ তুমি ঝগড়া ঝাটির একটা বাক্স ছাড়া আর কি?

–এ কথা তো তুমি বলবে। তোমার বাপ দাদা চৌদ্দগুষ্টি সকলে গরুর সঙ্গে কুকর্ম করেছে, তুমি সেই বংশের ছাওয়াল একই কাজ তোমাকে করতে হবে। নুরুন্নাহার বানুর চোখ দুটো থেকে ঠিকরে আগুন বেরিয়ে এল। আবু জুনায়েদ আবছা অন্ধকারে লাল চোখ দেখতে পেলেন।

সেই কুৎসিত বাদ প্রতিবাদের রাত নুরুন্নাহার বানু এবং আবু জুনায়েদ কীভাবে কাটিয়েছেন, এ নিয়ে চাকর-বাকরেরা একেকজনা একেক রকম কথা বলে থাকে। তার পরে আরো কিছু ঘটনা ঘটে গেল। সেগুলো সবিস্তারে না হোক সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন। উপাচার্য ভবনে আবেদ হোসেনের অবারিত গতায়ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কনস্ট্রাকশন কাজ তদারক করতে এলে নুরুন্নাহার বানুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যান। নুরুন্নাহার বানু তবারক চাচার এই সুদর্শন জামাইটিকে পছন্দ করেন। কারণ শুধু তাঁর চেহারা নয়, স্বভাব চরিত্র কথাবার্তা সব সুন্দর। মাঝে-মাঝে আবেদকে নুরুন্নাহার বানুর ছোট ভাইটির মতো আদর করতে ইচ্ছে হয়। সব দিন নুরুন্নাহারের সঙ্গে আবেদের সাক্ষাৎ হয় না। এদিকে নুরুন্নাহার বানুর মনে অন্য রকম একটা ভাবনা কাজ করছিল। সেই রাতেই তিনি ঠিক করে ফেলেছেন আবু জুনায়েদের শখের গরুটাকে সময় এবং সুযোগ এলে তিনি বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবেন। সিদ্ধান্ত টা কীভাবে কার্যকর করা যায় এ নিয়ে কল্পনা-জল্পনা করছেন। গরুটা মারা গেলে আবু জুনায়েদ কী রকম কষ্ট পাবেন, সে কথা চিন্তা করে একধরনের বিকৃত সুখ পেয়ে থাকেন। আবু জুনায়েদের এই শখের গরু যখন অক্কা পাবে, যখন নড়বে না, চড়বে না, নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকবে, তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে বলবেন তোমার আদরের গাভি প্রেমিকার কবরের ওপর একটা তাজমহল বানিয়ে দাও। যুগ যুগ তোমার নাম থাকবে।

লোকজন যখন থাকে না, লুকিয়ে চুরিয়ে গরুটাকে দেখে আসেন। গরুটাকে অনেকটা সতীনের মতো ধরে নিয়ে গোয়াল ঘর থেকে ঝাড়ু কুড়িয়ে নিয়ে কয়েক ঘা বসিয়ে দেন।

একদিন তিনি গোয়াল ঘরের কাছে গিয়ে খিলখিল হাসির শব্দ পেলেন। তাঁর ভেতরের সংস্কারটি চাড়া দিয়ে উঠল। কে জানে কেন জ্বিন পরি আবার গাভির আকার ধরে তার স্বামীর ওপর ভাগ বসাতে এসেছে কি না। তিনি আরো একটু এগিয়ে গেলেন। দরজার ফাঁক দিয়ে যা দেখলেন, তাঁর সেই মুহূর্তে মরে যেতে ইচ্ছে হল। কী করবেন ভেবে পেলেন না। মিনিটখানেক স্তব্ধ হয়ে রইলেন। আবেদ হোসেন দীলুর স্তন টিপে টিপে আদর করছেন। আর দীলু তার গলা জড়িয়ে ধরে খিল খিল করে হাসছে। নুরুন্নাহার বানুর মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে গেল,

–হারামজাদি আজ তোর একদিন, আমার একদিন

আবেদ হোসেন গলার আওয়াজ শুনে তড়িতাহতের মতো উঠে দাঁড়ালেন,

–আপা আপনি!

–বেরো কুত্তার বাচ্চা, বেরো!

আবেদ হোসেন মুখটা নিচু করে নুরুন্নাহার বানুর সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। এবার নুরুন্নাহার বানু প্রচণ্ড রোষে তার মেয়ের চুলের মুঠি ধরতে ছুটে গেলেন। মুখ দিয়ে গালাগালির খই ফুটতে থাকল। তাঁর ওই মূর্তি দেখে মেয়েটি কিন্তু একটুও ভয় পেল না।

–তুমি এরকম চেচামেচি করছ কেন? কী হয়েছে?

–কী হয়েছে হারামজাদি তোমাকে দেখাব?

তিনি চুলের মুঠিতে হাত দিতে যাচ্ছিলেন। দীলু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল,

–আম্মা বলে দিচ্ছি গায়ে হাত দিয়ো না। ভালো হবে না কিন্তু।

–হারামজাদি আজ তোর গোর দিয়ে ছাড়ব।

–গোর দেয়া অত সহজ কাজ নয়। যা বলার বলো, গায়ে হাত দিতে চেষ্টা করো না। গায়ের জোরে আমার সঙ্গে তুমি পারবে না।

–হারামজাদি এই কুত্তার সঙ্গে করছিলি কী?

–যা ইচ্ছে করছিলাম, তোমার কী? আবেদ ভাইয়ের সঙ্গে মজা করছিলাম।

–মজা করছিলি হারামজাদি, তোর কোন মায়ের পেটের ভাই, একটা আলগা বেটাকে তুই বুনি টিপতে দিলি?

–সো হোয়াট, আমি আবেদ ভাইকে বিয়ে করব।

মেয়ের দুঃসাহস, নির্লজ্জতা এবং স্পর্ধা দেখে নুরুন্নাহার বানুর মুখ দিয়ে সহসা কথা বেরুল না।

–বিয়ে করবি, জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

–কেন নয়, আবেদ ভাইকে আমার দারুণ ভালো লাগে।

–বিয়ে করবি হারামজাদি, তার বউ আছে, বাচ্চা আছে।

–থাকুক না কেন, আবেদ ভাই এই বউকে নিয়ে সুখী নয়।

–তুই হারামজাদি সুখী হবি?

–অনেক গালাগালি করেছ। আর চিৎকার করলে আমি এক্ষুনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব। সুখী হব না হব আমার ব্যাপার। তোমার তাতে কী?

নিজের মেয়ের সঙ্গে নোংড়া বচসার পর হঠাৎ করে নুরুন্নাহার বানু অনুভব করলেন, তাঁর সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। তাঁর তলার সবটুকু মাটি সরে গেছে। স্বামী তাঁর অনুগত নয়। তাঁকে বিছানায় একা ফেলে একটা গরুর সঙ্গে রাতে এসে কী সব করে। আর নিজের মেয়েটির বাজারের খানকি হতে আর বাকি কই। তবারক আলীর জড়োয়া গয়না, বেনারশি শাড়ি, সুন্দর করে বানানো গোয়াল ঘর, লক্ষ টাকা মূল্যের গাভিন গরু তাঁকে একদিক দিয়ে সর্বস্বান্ত করে ফেলেছে। তিনি মনে মনে অনুভব করলেন তবারক আলী একজন শয়তান তিনি যা কিছু স্পর্শ করবেন সেখানে পাপ

ছাড়া আর কিছুই জন্মাতে পারে না। তাঁর সারা গা জ্বালা করতে লাগল। এই অবস্থায় শোয়ার ঘরে ঢুকে আধাদিন ফুলে ফুলে কাঁদলেন। তারপর এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। বিকেল চারটের দিকে ঘুম ভেঙেছিল। সারা শরীরে অসম্ভব ক্লান্তি। নুরুন্নাহার বানুর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। নুরুন্নাহার বানুর ইচ্ছে হল এক্ষুনি যদি তিনি তবারক আলীর দেয়া সবকিছু ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন, তাহলে বাঁচার একটা উপায় হয়ত খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু শাড়ি গয়না ওসব তিনি ছুঁড়ে ফেলে দেবেন কোথায়? কাজের লোকজনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারেন। কাজের বেটির গায়ে জড়োয়া গয়না কী মানায়! তার চেয়ে নুরুন্নাহার বানুর কাছেই থাকুক। নারী হৃদয় বড় বেশি সোনার বশীভূত।

আবু জুনায়েদ অফিস থেকে এসে নুরুন্নাহার বানুর সঙ্গে কোনো কথা বললেন না। নুরুন্নাহার বানুও কোনো কথা বলতে চেষ্টা করলেন না। এই একদিন একরাতের মধ্যে তাঁদের মধ্যে একটা দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গেছে। হাজার চেষ্টা করেও কেউ কারো কাছে আসার উপায় পাচ্ছে না। নুরুন্নাহার বানুর মন থেকে ক্রমাগত ধিক্কার ধ্বনি উঠছিল। সমস্ত পৃথিবীতে এমন কোনো জায়গা আছে যেখানে তার এই মস্ত ক্ষতির কথা প্রকাশ করতে পারবেন। তিনি কোথায় যাবেন? তাঁর মুখ দিয়ে তেতো ঢেকুর উঠছিল। এই বাড়িতে তিনি কীভাবে বাস করবেন। অনেক ভেবে, অনেক চিন্তা করে স্থির করলেন, রেবা, তার ছেলে এবং বরকে আনিয়ে নেবেন।

এগার

হাত পায়ের একটা হাড় ভেতর থেকে ভেঙে গেলে যে রকম হয়, বাইরে কোনো রক্তপাত ঘটে না অথচ টনটনে ব্যথাটা ঠিকই থাকে ; আবু জুনায়েদের সংসারেরও সে অবস্থা। নুরুন্নাহার বানু এবং আবু জুনায়েদের মধ্যে কথা বলাবলি বন্ধ। বিয়ের পর এরকম অবস্থা আগে কোনোদিন হয়নি। নুরুন্নাহার বানু এখন বড় হওয়ার মজা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। দীলু আপন ইচ্ছেমতো সবকিছু করছে। যখন তখন বাইরে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে এসকল কথা জিজ্ঞেস করে দেখার কোনো প্রয়োজন নুরুন্নাহার বানু অনুভব করেননি। তিনি মনে করছেন তাঁর সর্বনাশ হয়ে গেছে। শেখ তবারক আলী তাঁদের গোটা পরিবারটাকে সর্বনাশ করে ফেলেছেন। এই সংসারের প্রতি কোনো কর্তব্য, কোনো টান তিনি বোধ করেন না। অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই বলেই তিনি এই বাড়িতে পাপী মানুষজনের সঙ্গে দিন রজনী যাপন করছেন।

নুরুন্নাহার বানুর বিষয়ে একটা সত্য কথা হল এই যে তিনি যখন ভেবেচিন্তে কিছু করেন, অবশ্যই ভুল করে বসেন। ঝোঁকের মাথায় যেসব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন, পরে দেখা গেছে, সেগুলোতেই তাঁর দূরদর্শিতা প্রমাণিত হয়েছে। রেবা তার ছেলে অন্তু এবং বর ইকবালকে কিছুদিন বরিশাল থেকে এখানে আনিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে খুবই ভালো কাজ করেছেন। মেয়ে জামাই এবং নাতি আসাতে পরিবারের গুমোট হাওয়াটা অনেকখানিই কেটে গেছে। মেয়ে জামাই আসাতে খুবই ভালো হয়েছে, এ কথা আবু জুনায়েদও স্বীকার করেন। কিন্তু মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলেননি। নুরুন্নাহার বানু আঁকড়ে ধরার মতো একটা অবলম্বন খুঁজে পেলেন। রেবা মেয়েটি ঠাণ্ডা স্বভাবের এবং অনেক বিচক্ষণ। রেবার যখন জন্ম, নুরুন্নাহার বানুর বয়স সবে ষোল। আবু জুনায়েদ তখন ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। পাস করার পরে জুনায়েদকে চাকরি পেতে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। রেবাকে মানুষ করতে গিয়ে অনেক ঝড় ঝাপটা মাথার ওপর দিয়ে গেছে। আবু জুনায়েদের সঙ্গে এক রুমের একটি টিনের ঘরে নুরুন্নাহার দাম্পত্য জীবন শুরু করেছেন। তখন তাঁদের সংসারে প্রাচুর্য বলতে কিছুই ছিল না। দুধের পয়সার জন্য নুরুন্নাহার বানুকে লজ্জা, শরমের মাথা খেয়ে তাঁর আব্বার কাছে হাত পাততে হত। দুঃখ-কষ্টের মধ্যে মানুষ হয়েছে বলেই রেবার মধ্যে দয়ামায়ার ভাগটা খুব বেশি। দীলুর কথা স্বতন্ত্র। সে

যখন জন্মেছে, নুরুন্নাহার বানুদের অবস্থা ফিরতে আরম্ভ করেছে। অধিকন্তু ঝুলি ঝাড়া সন্তান বলে দীলু সব সময় মা বাবা দুজনেরই অবারিত স্নেহ লাভ করেছে। এখন নুরুন্নাহার বানুর আফসোস হয়, ছোটবেলা থেকে যদি মেয়েটাকে কড়া শাসনে রেখে মানুষ করতেন, আজকে তাঁকে এরকম একটা কুৎসিত অবস্থার সম্মুখীন হতে হত না।

দীলুর ওপর তাঁর কোনো নৈতিক অনুশাসন চলছে না। নুরুন্নাহার বানু খুব ভয়ে ভয়ে আছেন। যদি কোনো ফাঁকে দীলু বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবেদ হোসেনের সঙ্গে কিছু একটা করে বসে, তখন নুরুন্নাহার বানু মানুষের সামনে মুখ দেখাবেন কেমন করে? এ ব্যাপারটা নিয়ে আবু জুনায়েদের সঙ্গে আলোচনা করারও উপায় নেই। নুরুন্নাহার বানু গভীরতম বেদনার সঙ্গে অনুভব করছেন আবু জুনায়েদ তাঁর দিক থেকে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেবেন, তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। নুরুন্নাহার বানুর ভেতরটা কাটা মুরগির মতো ছটফট করছে। রেবা এসে পড়ায় তিনি একটি খুঁটি পেয়ে গেলেন। একদিন দরজা বন্ধ করে মা মেয়েতে দীলু এবং আবেদ হোসেনের ব্যাপারটা আলোচনা করলেন। রেবা সবকিছু শুনে শিউরে উঠল। সে নিজে থেকে এগিয়ে এসে আবু জুনায়েদকে সব কথা জানাল। সব কথা শুনে আবু জুনায়েদ পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেলেন। সহসা তাঁর মুখ থেকে কোনো কথা বেরোল না। দীলু যে এরকম একটি কাজ করতে পারে আবু জুনায়েদ ভাবতেও পারেননি। মেয়েটি সবে সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী। আবু জুনায়েদের অবস্থা এমনিতে সবদিক দিয়ে টলোমলো হয়ে উঠেছে। এই ঘটনা যদি কোনো ফাঁক দিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়ে একটা ভূমিকম্পের সৃষ্টি হবে। আবু জুনায়েদের অস্তিত্বটাই বরবাদ করে ফেলবে। বার হাত কাঁকুরের তের হাত বিচির মতো সমস্ত গোপন বিষয় মানুষের সামনে বেরিয়ে আসবে। সকলে জানবেন তিনি ঠিকাদার শেখ তবারক আলীর বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছেন। শেখ তবারক তাঁর স্ত্রীকে জড়োয়া গয়নার সেট, কন্যাকে বেনারশি শাড়ি এবং সোনার ঘড়ি উপহার দিয়েছেন। তিনি নিজে থেকেই শেখ তবারককে একটা গাভি গরু কিনে দেয়ার প্রস্তাব করেছেন। ঠিকাদার সাহেব তাঁকে মহামূল্যবান গরু এবং গোয়ালঘর দুই উপহার স্বরূপ করে দিয়েছেন। এসবের সঙ্গে দীলুর কথাটা যখন যোগ হবে, মানুষ আপনা থেকেই বলবে, আবু জুনায়েদ এত লোভী এবং চামার যে তিনি আপন মেয়েটিকেও তবারক আলীর জামাতার হাতে তুলে দিতে কুণ্ঠিত হননি। আবু জুনায়েদ আর অধিক কিছু চিন্তা করতে পারলেন না। তাঁর কপালের বাম পাশটা প্রচণ্ডভাবে ব্যথা করছিল। প্রেশার চড়ে যাচ্ছিল। কোনো রকমে কপাল চেপে ধরে খাটে শুয়ে পড়তে বললেন।

–যা হয় কিছু একটা করো। আমি তো চোখে পথ দেখছিনে

রেবা একাই সমস্ত পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিল মা-বাবার মধ্যে একটা কাজ চলা গোছের সম্পর্কও তৈরি করে ফেলল। কিন্তু সেটাকে স্বাভাবিক সম্পর্ক বলা চলে না। একেবারে নিসম্পর্কিতভাবে মানুষের এক সঙ্গে থাকা চলে না। রেবা

ভীষণ বুদ্ধিমতি মেয়ে। দীলুকে সব সময় চোখে চোখে রাখে। কোনোক্রমেই বাড়ির থেকে একা বেরোতে দেয় না। কলেজে যাবার সময় রেবা কিংবা তার স্বামী দীলুর সঙ্গে কলেজের গেট অবধি যায়। আবার ছুটি হওয়ার পরে কলেজ গেট থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসে। কলেজের প্রিন্সিপাল ভদ্রমহিলার সঙ্গে আবু জুনায়েদের পরিচয় আছে। তিনি তাঁকে টেলিফোন করে বলেছেন, তাঁর এই মেয়েটি বড় আদুরে এবং খেয়ালি। কখন কী করে বসে কোনো ঠিক নেই। সুতরাং বেগম হাসনা বানু যদি অনুগ্রহ করে মেয়েটির প্রতি কড়া নজর রাখেন তবে আবু জুনায়েদ খুবই উপকৃত বোধ করবেন। কলেজ সম্পর্কিত অনেক কাজে উপাচার্যের কাছে হাসনা বেগমের ঠেকা আছে। তাই বেগম হাসনা বানু কথা দিয়েছেন, হাঁ মেয়েটির প্রতি তিনি প্রখর দৃষ্টি রাখবেন। তবে এও বলেছেন, এসব টিন এজারদের কন্ট্রোল করা খুবই মুশকিলের ব্যাপার।

রেবার বর ইকবাল ছেলেটিকে নুরুন্নাহার বানু খুবই পছন্দ করেন। তাঁর এই বিপদের দিনে যেভাবে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, যেভাবে নীরবে মচকে যাওয়া সংসারটির শুশ্রূষা করে যাচ্ছে, দেখে নুরুন্নাহার বানু অভিভূত হয়ে গেছেন। নুরুন্নাহার বানুর কোনো ছেলে নেই। ছেলে না থাকলে নারীর মনে একটা হাহাকার থেকেই যায়। নুরুন্নাহার বানু ছেলেটাকে তাঁদের সঙ্গে একেবারে রেখে দেয়ার কথা চিন্তা করেন। কিন্তু ইকবালের বদলির চাকরি। তার থাকার উপায় নেই। নুরুন্নাহর বানু ভাবেন, ঢাকাতে যদি কোনো কাজকর্ম পাওয়া যেত ছেলেটাকে নিজের কাছে রেখে দিতে পারতেন। সরকারি চাকরি হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। যে কোনো ধরনের একটা ভদ্র চাকরি হলেই চলে যায়। আবু জুনায়েদ এত বড় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান। প্রতিদিন তাঁর হাত দিয়ে কত লোকের চাকরি হচ্ছে। অথচ এমন সোনার টুকরো জামাই, তাঁকে একটা চাকরি দেয়ার ক্ষমতা আবু জুনায়েদের নেই। শেখ তবারক আলীর কথা কেন জানি তাঁর মনে উদয় হল। আর সারা শরীর কেঁপে গেল, এখনো নুরুন্নাহার বানু শেখ তবারকের কাছ থেকে উপকার প্রত্যাশা করেন।

রেবার ছেলে অন্তু এই মনস্তাপপীড়িত বাড়িতে এক ঝলক ফাল্গুনের হাওয়া এনে দিয়েছে। তার বয়স সবে দুই পেরিয়েছে। বয়সের তুলনায় তার বাড় অনেক বেশি। এই দুরন্ত সর্বাঙ্গে প্রাণপূর্ণ শিশুটি ছোট ছোট পায়ে টলমল টলমল করে যখন হাঁটে দেখে মনে হয় তার চরণের ছন্দের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীর প্রাণস্পন্দন ধ্বনিত হয়ে ওঠে। অন্তু যখন নব উদ্যত সাদা দাঁতগুলো দেখিয়ে হাসে দেখে মনে হয় জগতের যা কিছু সুন্দর, নিষ্পাপ এই শিশুটির শুভ্র হাসির মধ্য দিয়ে ফুলের মতো বিকশিত হয়ে উঠেছে। একদণ্ড বিশ্রাম নেই অন্তুর। গাছে পাখি দেখলে আ আ করে ডাকে। আপনি নাচে আপনি হাসে, ঝরানোর মতো শিশুকণ্ঠে কল কল করে কথা বলে যায়। এই নাতিটিকে দেখলে নুরুন্নাহার বানু সমস্ত দুঃখ, সমস্ত বেদনার কথা ভুলে যান। তাকে বুকে টেনে আদর করেন। অন্তু নানির কোল থেকে মার কোলে, মার কোল

থেকে নানার কোলে, নানার কোল থেকে দীলুর কোলে ঝাপিয়ে পড়তে বড় বেশি ভালবাসে। সকালবেলা নাস্তা খাওয়ার পর ক্রমাগত কোল বদল করা অন্তুর একটা চমৎকার খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বাড়ির পরস্পরের কাছ থেকে দূরে দূরে সরে যাওয়া মানুষদের মধ্যে অন্তু একটা নতুন যোগসূত্র রচনা করেছে।

অন্তুর মুখে সবে কথা ফুটতে আরম্ভ করেছে। আবু জুনায়েদকে যখন নানা বলে তার কোলে ঝাপিয়ে পড়ে, শত ব্যস্ততার মধ্যেও অন্তুকে একটু আদর করে, তার শিশুমুখে চুমো খেয়ে একটা অনাবিল শান্তির পরশ খুঁজে পান। অন্তু আবু জুনায়েদের ফাইল ধরে টানাটানি করে। গোছানো কাগজপত্র আউলা করে ফেলে। একটুও বিরক্ত হন না আবু জুনায়েদ। হাসিমুখে অন্তুর সমস্ত উৎপাত অত্যাচার সহ্য করেন। খালামনি বলতে এই শিশুটি পাগল। দীলুর কোলে একবার উঠলে আর নামতে চায় না। সে তার চুল ধরে টানে, কানের ফুল নিয়ে খেলা করে। দীলুর বেশ লাগে। দীলু কলেজে গেলে খালামনি খালামনি করে অন্তু চিৎকার করতে থাকে। কেঁদে কেঁদে ঠোঁট ফুলিয়ে ফেলে। উদ্ধত স্বভাবের দীলুকে বদলে যেতে দেখে মনে মনে খুব খুশি হন। অন্তুর সঙ্গে দীলুর এই সার্বক্ষণিক মেলামেশা তার মন থেকে আবেদ হোসেনের চিন্তা সরিয়ে রাখতে অনেকখানিই সাহায্য করবে বলে বিশ্বাস করেন।

অন্তু মাঝে-মাঝে অদৃশ্য হয়ে যেতে বড় পছন্দ করে। সে খাটের তলায় অথবা ঘরের কোনো কোণাকানচিতে লুকিয়ে থাকে। খুঁজে পাওয়া না গেলে সারা বাড়িতে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে যায়, অন্তু কোথায়, অন্তু কোথায়। কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। খুঁজে খুঁজে সকলে যখন হয়রান, খাটের তলা থেকে অন্তু মাথায় ঝুল কালি মেলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে। এই একটুখানি শিশু কত চাতুরি জানে। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে, কোন ফাঁকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসে। একেবারে আঙিনায় বেরিয়ে এসে ফড়িঙের পেছনে ছুটোছুটি করে। হাতের কাছে যা পায়, মুখের ভেতর চালান করে দেয়। একবার একটা আস্ত কেচো মুখ থেকে বের করা হয়েছিল।

একদিন অন্তুকে পাওয়া গেল না। সবখানে খোঁজা হল। সবগুলো খাটের তলা দেখা হল, রান্নাঘরে খোঁজ করা হল। স্টোর রুম, নিচের অফিস ঘর তন্ন তন্ন করা হল। না অন্তু কোথাও নেই। সকলেরই একটা প্রশ্ন, অন্তু কোথায়, কোথায় যেতে পারে অন্তু। এই শিশুটি অতি অল্পে যেমন সকলকে আনন্দ দিতে পারে, তেমনি আবার অতি অল্পে সকলকে ব্যতিব্যস্ত করেও তুলতে পারে। কোথাও যখন পাওয়া গেল না নুরুন্নাহার বানুর সহজাত প্রবণতা মনে করিয়ে দিল, যদি অন্তু গোয়াল ঘরে গিয়ে থাকে। সত্যি সত্যি গোয়াল ঘরেই অন্তুকে পাওয়া গেল। কীভাবে এই এতদূর চলে এসেছে কেউ চিন্তাও করতে পারেননি। নুরুন্নাহার বানু দেখেন, অন্তু ছোট ছোট হাতে গরুটির ওলানের বাঁট নিয়ে খেলা করছে। এই দৃশ্য দেখে নুরুন্নাহার বানুর মাথায় রক্ত চড়ে গেল। শেখ তবারক গরুর আকারে তাঁর জীবনের মধ্যে একটা শনি ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এই গরুটির কারণে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হয়েছে, কন্যাটি

বিপথগামী হয়েছে, এখন নাতিটিকেও ধরে টান দিচ্ছে। নুরুন্নাহার বানু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন, গরুটিকে তিনি ইঁদুর মারা বিষ দিয়ে খুন করবেন।

রেবা আসার পর পরিবারে একটা শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। আবু জুনায়েদ এবং নুরুন্নাহার বানুর মধ্যে, নুরুন্নাহার বানু এবং দীলুর মধ্যে যে একটা সংঘাত আসন্ন হয়ে উঠেছিল তার বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে ওঠার ক্ষমতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। নুরুন্নাহার বানু তাঁর নাতি, কন্যা এবং জামাতাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। আবু জুনায়েদ যা ইচ্ছে করুন, তাঁর কথা না ভাবলেও তাঁর চলে। আবু জুনায়েদ তাঁর কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তাঁর মধ্যে এক ধরনের নির্লিপ্ততা বোধ জন্ম নিয়েছে। যা ঘটবার আপনিই ঘটবে। উপাচার্য থাকুন, আর নাই বা থাকুন, তিনি পরোয়া করেন না। মাঝে-মাঝে তিনি বিষয়টা নিয়ে এ রকম চিন্তা করেন, আমার তো উপাচার্য হওয়ার কথা ছিল না। উপাচার্যের চাকরি তার জীবনের মহত্তম দুর্ঘটনা। এই চাকরি যদি চলেই যায়, যাবে। লোকে কী ভাববে, কী মনে করবে এ নিয়ে আর বিশেষ তোয়াক্কা করেন না। তাঁর নিজের মতো করে বেঁচে থাকার একটা পদ্ধতি তাঁর মধ্যে ভেতর থেকে সংহত হয়ে উঠছে। গরুটার প্রতি তাঁর পক্ষপাত কম্পাসের কাঁটার মতো হেলে রয়েছে। যদিও নুরুন্নাহার বানু গরুটাকে যাবতীয় অকল্যাণের হেতু বলে মনে করছেন এবং তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড করেছেন, তাঁর মনোভাব অপরিবর্তিতই থেকে গেছে।

সকাল বেলা তিনি গরুর সঙ্গে কাটান। ঘুম থেকে উঠে আবু জুনায়েদ গোয়াল ঘরে যাবেনই। আজকাল শরীর বিশেষ ভালো যাচ্ছে না। তাই দুপুরের গরু সন্দর্শনে যাওয়া ঠিকমতো হয়ে ওঠে না। বিকেল বেলা অবশ্যই তিনি গোয়াল ঘরে যান। সভা-সমিতিতে যাওয়ার বিশেষ স্পৃহা তিনি বোধ করেন না। তাঁর বক্তৃতার নিন্দে করার মানুষের অভাব নেই। সবদিক থেকে তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন। বিকেলের সমস্ত সময়টা তিনি নিজের জন্য রাখেন এবং গোয়াল ঘরে চলে আসেন। কোনো কোনোদিন নাতিটাকেও সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আসেন। গরুর প্রতি নাতিটারও একটা টান পড়ে গেছে। তিনি যদি কোনোদিন অন্তুকে রেখে আসেন, অন্তু চিৎকার করতে থাকে,

—নানু হাম্বা যাব, হাম্বা যাব।

নুরুন্নাহার বানু এটা মোটেও পছন্দ করেন না। তাঁর নজরে পড়লে তিনি অন্তুকে জোর করে কোলে উঠিয়ে অন্যদিকে নিয়ে যান। অন্তু পা আছড়ে কাঁদতে থাকে।

আরবির শিক্ষক মাওলানা আবু তাহের মাসুম এক সময় আবু জুনায়েদের প্রতিবেশী ছিলেন। আবু জুনায়েদ আগে মাওলানা তাহেরের সঙ্গে প্রাতঃভ্রমণে বের হতেন। আবু জুনায়েদ উপাচার্য হওয়ার কারণে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র একজন মানুষ যদি খুশি হয়ে থাকেন, তিনি মাওলানা আবু তাহের। মাওলানা তাহেরের সঙ্গে আবু জুনায়েদের একটা হাসি-ঠাট্টার সম্পর্ক ছিল। মাওলানা রসিক মানুষ। আজানুলম্বিত দাড়ি, লম্বা আচকান এবং কানপুরি টুপিতে ঢাকা মাওলানার শরীর।

এই দাড়ি টুপি এবং আচকানের ভেতর থেকে এমন রসিকতা প্রকাশ পেত শুনলে অত্যন্ত গোমরা মানুষেরও পেটে খিল ধরে যেত এখনো আবু জুনায়েদ যে মাঝে মাঝে নামাজের পাটিতে দাঁড়ান, মাওলানার প্রভাবে সেটা হয়েছে। মাওলানার সঙ্গে আবু জুনায়েদের বিশেষ আঁটা আঁটি নেই। উপাচার্য অফিসে হোক কি বাড়িতে হোক, মাওলানা আবু তাহের আবু জুনায়েদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কারো তোয়াক্কা করেন না। সরাসরি চলে আসেন। এক সন্ধ্যেয় মাওলানা আবু জুনায়েদকে তাঁর বাড়িতে এসে তালাশ করলেন। আবু জুনায়েদের বেয়ারা জানাল তিনি পেছনের গোয়াল ঘরে রয়েছেন। বাড়ির পেছনে আবু জুনায়েদ যে একটি গোয়াল ঘর তৈরি করেছেন, মাওলানা জানতেন না। গোয়াল ঘরের অবস্থান জেনে মাওলানা এসে দেখেন, আবু জুনায়েদ আপন হাতে টুকরো করে, কাটা নেপিয়র ঘাস অল্প অল্প করে গরুর মুখে তুলে দিচ্ছেন। তিনি বললেন,

–আসসালামু আলাইকুম জুনায়েদ সাহেব। মাসখানেক আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতে পারিনি, গুস্তাকি মাফ করবেন।

আবু জুনায়েদ বললেন,

–আরে মাওলানা সাহেব আসেন, আসেন, কয়েকদিন থেকে আমি মনে মনে আপনাকেই খুঁজছিলাম। আবু জুনায়েদ নেপিয়র ঘাসের চুপড়িটা গরুর সামনে রেখে উত্তর দিকের শেডটার বাতি অন করলেন। ঝলমল করে আলো জ্বলে উঠতেই গরুটা মাওলানার নজরে পড়ে গেল। এক ঝলক দেখেই মাওলানার কণ্ঠ দিয়ে বিস্ময়সূচক একটি ধ্বনিই বেরোল :

–মাশাল্লাহ, এই সুন্দর জিনিস আপনি পেলেন কেমন করে? পিঠে দুইখানি পাখা থাকলে অনায়াসে বলা যেত পারত এটা বুররাক।

আবু জুনায়েদ বললেন, আল্লাহ দেনেঅলা, তিনিই মিলিয়ে দিয়েছেন।

মাওলানা সাহেব কোরআনের একটা আয়াত আবৃত্তি করলেন, তার অর্থ দাঁড়াবে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছে দান করেন, যাকে ইচ্ছে কেড়ে নেন। যাকে ইচ্ছে সম্মানিত করেন, যাকে ইচ্ছে লাঞ্ছিত করেন। তারপর দুহাতে আলগোছে দাড়ি মুঠি করে বললেন,

–আপনি সঠিক পথটি বেছে নিয়েছেন। বেবাক দেশ খবিশ এবং খান্নাসের আওলাদ, নাতিপুতিতে ভরে গেছে। এই জাতির মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করার চাইতে হাইওয়ানের মহব্বত অনেক বেহেতর। আপনার গরুটি সম্পর্কে তাই একটি কথাই আমি বলব। আপনার গরুটির চেহারা সুরত যে রকম, কোরআন মজিদের সুরা বাকারায় এই রকম একটা গরুর কথা বলা হয়েছে কেবল দুইটা তফাৎ। সুরা বাকারায় যে গরুটির কথা উল্লেখ আছে, সেটির গায়ের রঙ উজ্জ্বল হলুদ আর আপনার গরুটির রঙ লাল। আর আপনার গরুর চাকা চাকা দাগ আছে। সুরা বাকারার গরুতে তেমন কোনো দাগের কথা উল্লেখ নেই

আবু জুনায়েদ বললেন,

—মাওলানা সাহেব গরুর ভাগ্য আর আপনার এলেমের তেজ।

মাওলানা আবু তাহের দাঁতে জিভ কাটলেন,

—ভাই ওই রকম কথা বলবেন না। আল্লাহ আপনাকেই এলমে লাদুন্নি বখশিস করেছেন। এই এলমে লাদুন্নি ছিল বলেই আপনি এত উপরে উঠতে পেরেছেন। আমি অতিশয় এক নাদান বান্দা। আমি তাই আপনাকে বিশেষ একটা অনুরোধ করব। যদি আপনি রাখেন।

আবু জুনায়েদ বললেন,

—বলুন আপনার অনুরোধ কী

মাওলানা সাহেব জবাব দিলেন,

—আমি আপনাকে স্বার্থপরের মতো আচরণ না করতে বলব।

আবু জুনায়েদ বললেন,

—আমি স্বার্থপরের মতো আচরণ কোথায় করলাম। আপনিও এ কথা বলেন?

—আমি না বললে কে বলবে আপনি এ বাড়ির পেছনে এমন এক সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন প্রথমত সে কথা জানাননি। দ্বিতীয়ত একা একা এই জান্নাতের শান্তি উপভোগ করছেন, বন্ধু-বান্ধবকে তার হিস্যা দিচ্ছেন না।

আবু জুনায়েদ একটু অবাক হয়ে বললেন,

—মাওলানা আপনি আমাকে কী বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি না। যা হোক, বলুন আমাকে কী করতে হবে।

মাওলানা আবু তাহের উচ্চহাস্য করে উঠলেন এবং তারপর বললেন,

—এইখানে আপনি চমৎকার বসার বন্দোবস্ত করেছেন। সন্ধ্যেবেলা বন্ধু-বান্ধবদেরও বসার বন্দোবস্ত করে দিন। চমৎকার এক জায়গা। চারদিকে গাছ গাছালিতে ঢাকা। এখানে বসে একটু প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলা যাবে। আমাদের এলাকায় শান্তিতে নিরিবিলিতে কোথায় বসার জায়গা নেই। যেখানেই যান দেখবেন, মানুষ মানুষকে নলদাঁত মেলে কামড়াতে আসছে।

মাওলানা আবু তাহেরের প্রস্তাবটা আবু জুনায়েদের মনে ধরল। এই গরুটাকে সকলের সঙ্গে শেয়ার করার ইচ্ছে তাঁর ছিল। কিন্তু তবারক সাহেবের হুঁশিয়ারিতে তিনি দমে গিয়েছিলেন। মাওলানা আবু তাহের যখন নিজে থেকেই প্রস্তাবটা করলেন আবু জুনায়েদ হাতে চাঁদ পেয়ে গেলেন। মাওলানার প্রস্তাবে সায় দিয়ে বললেন,

—তা মাওলানা আপনারা এসে বসুন, গল্পগুজব করুন। আপনাদের বারণ করেছে কে?

—ভাই আপনি এরকম বলবেন আমি জানতাম। আমরা অবশ্যই আসব। একটা বসার জায়গা হল, আসব না, সে কেমন কথা। কিন্তু আপনাকে তার জন্য আরো কিছু খরচ করতে হবে। এমনিতে আপনার রুচির তারিফ না করে পারিনে। গোয়ালটা বানিয়েছেন চমৎকার। মাশাল্লাহ গরুটিও হয়েছে খুব খুবসুরত। আপনি আরো কিছু পশুপাখি কিনুন। যেমন ধরুন ময়না, টিয়ে, দোয়েল, বুলবুলি আর শালিক। যদি সম্ভব হয় এক দুটি ভালো জাতের কুকুরও রাখবেন।

আবু জুনায়েদ বললেন,

–মাওলানা কুকুর আমার দু'চোখের বিষ। এই জিনিস আমাকে রাখতে বলবেন না।

–ভাই আপনি ক্ষেপে যাচ্ছেন কেন? আপনি জানেন না একটা কুকুর বেহেশতে যাবে। আসকাবে কাহরের সঙ্গে যে কুকুরটি ছিল, সে সরাসরি পুলসিরাতের ওপর দিয়ে হেঁটে বেহেশতে চলে যাবে। মাওলানা গালিবের একটা উর্দু কবিতাংশ পাঠ করে শোনালেন, মানুষ যদি কুকুরের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা শিক্ষা করতে পারত এতদিনে দুনিয়া জান্নাত হয়ে যেত।

আবু জুনায়েদকে গলানো গেল না। বরং তিনি মাওলানা তাহেরকে উল্টো দিক থেকে চেপে ধরলেন।

–মাওলানা আপনার এত কুকুর প্রীতি কেন? বুড়ো বয়সে কি গায়ে সাহেবদের হাওয়া লাগল?

মাওলানা তাহের বললেন, আচ্ছা কুকুরের দাবি উঠিয়ে নিলাম। ঘুঘু, শালিক, টিয়া, ময়না, চন্দনা, দোয়েল, বুলবুল এসব রাখুন। একটা ছোটখাটো চিড়িয়াখানা হয়ে যাবে। আপনার এই মিনি চিড়িয়াখানা এক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী সম্পদে পরিণত হবে।

আবু জুনায়েদের প্রস্তাবটা ভীষণ মনে ধরেছে। তবু তিনি আমতা আমতা করে বললেন,

–অনেক খরচাপাতির ব্যাপার, দেখার লোক কই। তাছাড়া নানা রকম কথা উঠতে পারে।

মাওলানা তাহের ফোড়ন কেটে বললেন,

–জুনায়েদ সাহেব আপনি হাসালেন। হাতি খরিদ করার পর বলছেন রশির কিবা দাম। আপনার গোয়াল ঘর বানাতে কত খরচ পড়েছে। এই বুররাক মার্কা গরু কিনতে গেছে কত টাকা। এই চিড়িয়া সবগুলো কিনতে পাঁচ হাজার টাকার বেশি খরচ পড়বে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে এই টাকা খরচ করার অধিকার নিশ্চয়ই উপাচার্যের আছে। থাক টাকার বিষয় নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। এই গরিব বান্দা খাতা দেখার টাকা থেকে এই চিড়িয়াগুলো কিনে দেবে।

আবু জুনায়েদ বললেন, কিন্তু দেখাশোনা করবে কে? মাওলানা বললেন, কেন গরু যে দেখাশোনা করে তার ওপর চিড়িয়ার দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন। বেটা তো কেবল খায় আর ঘুমোয়? সপ্তাহ গত হতেই মাওলানা আবু তাহের একটি পায়ে টানা ভ্যানের ওপর দশ বারটি খাঁচা চাপিয়ে একেবারে সরাসরি উপাচার্য ভবনের কম্পাউন্ডে এসে হাজির হলেন। তিনি দারোয়ান এবং বেয়ারার সাহায্যে খাঁচাগুলি নামিয়ে একেবারে গোয়ালঘরে নিয়ে এলেন। আবু জুনায়েদ উত্তরের শেডে বসে নাতি অন্তুর সঙ্গে হাম্বা হাম্বা খেলা করছিলেন। অন্তু আবু জুনায়েদকে বলছে, নানু হাম্বা বলো। নাতিকে খুশি করার জন্য আবু জুনায়েদ বললেন, হাম্বা। অন্তু অত

অনুচ্চ ডাকে খুশি হওয়ার ছেলে নয়। তাঁর পাঞ্জাবির কোণা আকর্ষণ করে বলল, নানু আরো জোরে বলো, হাম্বা।

আরো জোরে হাম্বা বলতে গিয়ে আবু জুনায়েদ দেখতে পেলেন তাঁর মুখোমুখি মাওলানা আবু তাহের দাঁড়িয়ে আছেন। দারোয়ান এবং বেয়ারা মিলে একটা দুটো করে সবগুলো খাঁচা উত্তরের শেডে এনে রাখল। দেখে আবু জুনায়েদের চক্ষু চড়কগাছ। অস্ফূটে উচ্চারণ করে বসলেন, মাওলানা এ কী কাণ্ড করলেন।

মাওলানা বললেন, সব কাণ্ড এখনো শেষ হয়নি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনি দেখুন, এখনো কিছু কাণ্ড বাকি আছে।

মাওলানা আবু তাহের পেরেক, হাতুড়ি এসব নিয়ে একেবারে তৈরি হয়ে এসেছিলেন। তারপর অনেকক্ষণ ধরে ঠুকে ঠুকে দেয়ালে পেরেক বসিয়ে খাঁচাগুলো ঝুলিয়ে দিলেন। শালিক, চন্দনা, টিয়া, ময়না, দোয়েল, বুলবুল যে সকল পাখির নাম মাওলানা বলেছিলেন সব প্রজাতির পাখি জোড়ায় জোড়ায় খাঁচাতে ভরে এনেছেন। নতুন জায়গায় আসার কারণে, একসঙ্গে সবগুলো পাখি ডেকে উঠল। পাখিদের কলকাকলিতে আচমকা নির্জন গোয়াল ঘর মুখরিত হয়ে উঠল। অন্তু হাত তালি দিয়ে চিৎকার করে উঠল, ও নানু পাখি, অ-নে-ক পাখি।

আবু জুনায়েদ বললেন, হ্যাঁ নানু অনেক পাখি। জনার্দন চক্রবর্তী হলেন আবু জুনায়েদের মিনি চিড়িয়াখানার প্রথম দর্শক। তাঁর বিষয়ে কিঞ্চিৎ ভূমিকা দেয়া প্রয়োজন। তিনি সংস্কৃতের প্রবীণ শিক্ষক। চাকরির মেয়াদ অনেকদিন আগেই ফুরিয়েছে। যেহেতু সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের শিক্ষক পাওয়া দুরূহ হয়ে উঠেছে, তাই দু' বছর একস্টেনশন দিয়ে জনার্দন চক্রবর্তীর চাকরি এত দিন পর্যন্ত বহাল রাখা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একজন তরুণ দুলাল বিশ্বাস ব্যাকরণ এবং অলঙ্কারশাস্ত্রে ডক্টরেট করে এসেছেন। এবার জনার্দন চক্রবর্তীর চাকরি নবায়নের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু জুনায়েদ নিজে থেকে উদ্যোগ নিয়ে জনার্দন চক্রবর্তীর চাকরি নবায়ন করেছেন। এ নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। আবু জুনায়েদ সেসব আমলে আনেননি। জনার্দন চক্রবর্তীর প্রতি এই পক্ষপাতের একটা কারণ অবশ্য আছে। জনার্দন চক্রবর্তীর বাড়ি আবু জুনায়েদদের এদিকে। আবু জুনায়েদ যে স্কুলের ছাত্র সেখানে তিনি সংস্কৃত এবং বাংলা পড়াতেন। স্কুলে থাকার সময়ে তিনি টোল থেকে আদ্য মধ্য এবং উপাধি পাস করেছিলেন। ঘা খেয়ে তিনি প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে সংস্কৃতে তিনি এম, এ পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করবেন। জনার্দন চক্রবর্তী সে জেদ প্রমাণ করে ছেড়েছেন। জনার্দন চক্রবর্তীর বয়স এখন সত্তুর পেরিয়ে গেছে। এখনো বেশ শক্তসমর্থ আছেন। কেবল সামনের চোয়ালের দাঁত কটি পড়েছে। বাড়িতে এখনো কাষ্ঠপাদুকা ব্যবহার করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার সময়ে বিদ্যাসাগরী চটি পরে চটাং চটাং শব্দ করে ক্লাস নিতে আসেন।

জনার্দন চক্রবর্তী এখনো আবু জুনায়েদকে তুমি সম্বোধন করেন। ছোট ছোট ব্যাপারে আবু জুনায়েদকে বকাবকি করতেও ছাড়েন না। তিনি মনে করেন, এখনো

তাঁর সে অধিকার আছে। জনার্দন বাবু যখন রেগে যান, পাঞ্জাবির বুকে হাত দিয়ে শুভ্র উপবীতটি টেনে বের করে বলেন, আমি খাঁটি ব্রাহ্মণ, উপবীত স্পর্শ করে যদি শাপ দেই লেগে যাবে। ভয় অনেককেই দেখিয়েছেন, কিন্তু শাপ কাউকে দিয়েছেন কেউ বলতে পারবে না। কথা বলার সময় তৎসম শব্দ ব্যবহার করার দিকে ঝোঁকটা বেশি। অবশ্য ঘরে তিনি তাঁর জেলার উপভাষাটি ব্যবহার করে থাকেন। সাধু ভাষায় কথা বলতে পারলে তিনি স্বস্তি অনুভব করেন। এক সন্ধ্যেবেলা তিনি হেলতে দুলতে আবু জুনায়েদের মিনি চিড়িয়াখানায় এসে হাজির। আবু জুনায়েদ তখনো নিজের হাতে টুকরো টুকরো নেপিয়র ঘাস গরুকে খাওয়াচ্ছিলেন। জনার্দন চক্রবর্তী এসে হাঁক দিলেন,

–বৎস বিশ্বস্ত সূত্রে আমি অবগত হইলাম তুমি রামায়ণে বর্ণিত সুবর্ণ মৃগের মতো একটি রূপ যৌবন সম্পন্ন স্ত্রী জাতীয় গরুরত্ন সংগ্রহ করিয়াছ। কথাটি শ্রবণ করিবার পরেও আমার মনে প্রত্যয় হয় নাই। ভাবিলাম চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া আসি।

আবু জুনায়েদের কিছু বলার পূর্বেই পাখির খাঁচাগুলোর দিকে জনার্দন বাবুর চোখ পড়ল। তিনি বলে বসলেন, সাধু সাধু বৎস আবু জুনায়েদ আমি আপন অক্ষি গোলকে প্রত্যক্ষ করিলাম, তুমি অনেকগুলি বিহঙ্গকেও প্রশ্রয় দিয়াছ। আমি জানিতাম তোমার অন্তঃকরণ জীবের প্রতি প্রেমে পরিপূর্ণ। সংসারে যাঁহারা প্রকৃত মানুষ, তাঁহারা জীবের মধ্যে শিবের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করেন। সেই দিক দিয়া বিচার করিলে তোমার স্থান অত্যন্ত উঁচু হওয়া উচিত। তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলে। তা তোমার গাভিটি কোথায়?

জনার্দন বাবুর দৃষ্টিশক্তি হালে ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। তিনি ঠিকমতো ঠাহর করতে পারছিলেন না। আবু জুনায়েদ তাঁকে একেবারে হাত ধরে গোয়াল ঘরের একান্ত সন্নিকটে গিয়ে বাতিটি জ্বালালেন। তারপর মশারি উন্মোচন করে বললেন,

–এই যে স্যার দেখুন।

জনার্দন চক্রবর্তী কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। তিনি সামনে পেছনে গিয়ে গরুটাকে বেশ ভালো করে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখলেন। গায়ে হাত দিয়ে পরীক্ষা করলেন। গরুটি ঘাড় উঠিয়ে জনার্দন চক্রবর্তীর মাথা চাটতে ছুটে এল। তিনি দুপা পিছু হটে এসে বলতে থাকলেন,

–বৎস আবু জুনায়েদ তোমাতে একটা মনের কথা বলিব।

আবু জুনায়েদ বললেন, বলুন স্যার।

–শোন বৎস আমাদের শাস্ত্রে গাভিকে মাতার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। যে পাষণ্ড গাভির মধ্যে মাতৃমূর্তি দর্শন করিতে না পারে, তাহাকে জন্ম জন্মান্তর তীর্যক যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। এই হইল গিয়া তোমার শাস্ত্রের বিধান। তথাপি তোমার এই চতুষ্পদের কন্যাটিকে দেখিয়া আমার মনে ভিন্ন ধরনের জল্পনা শুরু হইয়াছে। সংস্কৃত কাব্যে এক ধরনের সুন্দরী রমণীকে হস্তিনী রমণী বলিয়া

মহাকবিগণ শনাক্ত করিয়া গিয়াছেন। তোমার গাভি দর্শন করিয়া আমার কী কারণে হস্তিনী নায়িকার কথা মনে হইতেছে বলিতে পারি না। মহাকাব্যের যুগে যেই ধরনের গাভিকে কামধেনু বলা হইত তোমার গাভিটি সেই জাতের। ইহাকে যত্ন করিয়া রাখিবে।

আবু জুনায়েদ জনার্দন চক্রবর্তীর কথায় খুব তুষ্ট হলেন। বললেন, আশীর্বাদ করবেন স্যার।

–বৎস আমার আশীর্বাদ নিরন্তর তোমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। আমার আশীর্বাদের গুণে তুমি উপাচার্যের আসনে বসিয়াছ। এখন আশীর্বাদ করিতেছি তুমি রাষ্টদূত হও। মন্ত্রী হও। ভগবান তোমাকে রাষ্ট্রপতির আসনে উপবেশন করাইবেন। মনে রাখিবে, আমি খাঁটি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ কদাচ মিথ্যা হইবার নয়।

বার

আবু জুনায়েদের গোয়ালঘরের উত্তরের শেডে সান্ধ্য আড্ডাটি চালু হয়ে গেল। যে সকল শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাবে যেতে পছন্দ করেন গাছের গুড়ির আড্ডায়ও যেতে পারেন না, এই নতুন আসরটি চালু হওয়ায় অনেকেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব একটি বাজার। সেখানে তাস চলছে, দাবা চলছে, টেনিস, ব্যাডমিন্টন এমনকি রাতের বেলা জুয়া পর্যন্ত চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দলাদলের প্রধান আখড়া হল এই ক্লাব। সর্বক্ষণ সভা হচ্ছে, গুজ গুজ ফুস ফুস চলছে। কে কাকে ল্যাং মেরে এগিয়ে গেল। কে সরকারের চামচাগিরি করতে গেল, কে আধারাতে বউকে ধরে পেটায়, কাজের বেটির সঙ্গে কে লটরফটর কাণ্ড করেছে এই সকল মুখরোচক সংবাদ ক্লাবের হাওয়ায় ভেসে ভেসে বেড়ায়। যে সকল শিক্ষক নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে না, ক্লাবের এই পাঁচমিশালি আড্ডায় বড় বেচারা বেচারা অনুভব করেন।

ক্লাব ছাড়া শিক্ষকদের আরো একটি আড্ডা আছে। আবাসিক এলাকার ভেতরে ড. আহমদ তকির বাড়ির সামনে একটা গাছের গুঁড়ির ওপর সন্ধ্যেবেলা এই আড্ডাটি বসে। ঝড় বৃষ্টি হলে লোকজন ড. আহমদ তকির ড্রয়িং রুমে এসে আশ্রয় নেন। একবার ঝড়ের সময় প্রকাণ্ড একটি শিশু গাছ কাণ্ডশুদ্ধ উপরে উঠে এসে ভূপাতিত হয়েছিল। ডালপালা সব ছেটে ফেলে সরানো হয়েছে, কিন্তু ড. আহমদ তকি এবং তাঁর মতো আরো কতিপয় প্রবীণ শিক্ষক এই গুড়িটি সরাতে দেননি। তারপর থেকেই গুঁড়িটি সান্ধ্য আড্ডার স্থান হিসেবে এন্তার কুখ্যাতি অর্জন করেছে। কী কারণে এই গুঁড়ির আড্ডাটির দুর্নাম একটু বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে। ড. আহমদ তকি ঘোষণা করেছেন তিনি নাস্তিক। আল্লাহ রসুলের ধার তাঁর না ধারলেও চলে। কোরান-হাদিসে তাঁর বিশ্বাস নেই। এই আড্ডায় মাঝে-মাঝে নাস্তিকতা বিষয়ক আলাপ-সালাপ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কিছু সিনিয়র শিক্ষক, এমনকি তরুণদের মধ্যেও কেউ কেউ নিজেরা সরাসরি নাস্তিক না হয়েও ড. আহমদ তকিকে পছন্দ করে থাকেন। কারণ ড. আহমদ তকি একদিকে যেমন গোঁয়ার, তেমনি আবার রসিকও বটে। এ ধরনের মানুষ যিনি নিজের বিজ্ঞতা বা অজ্ঞতা চিৎকার করে প্রকাশ করতে পারেন তাঁর কিছু চেলা জুটে যাবে, এটি তো খুবই স্বাভাবিক। ড. আহমদ তকিই হলেন গাছের গুঁড়ির আড্ডার প্রধান ব্যক্তি অন্যদের ভূমিকা

নিতান্তই গৌণ। সাম্প্রতিককালে প্রবীণ শিক্ষকদের অনেকেই এই গাছের গুঁড়ির আড্ডায় আসতে আরম্ভ করেছেন। ড. আহমদ তকির ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ তার একমাত্র কারণ নয়। ড. আহমদ তকি ভদ্রলোকটি একাধারে নাস্তিক এবং আবু জুনায়েদ বিরোধী। কোনোরকম রাখঢাক না করেই উপাচার্য আবু জুনায়েদকে তিনি ছাগল, বলদ, গাধা ইত্যাকার নামে সম্বোধন করে থাকেন। প্রবীণ শিক্ষকদের অনেকেরই আবু জুনায়েদের প্রতি জন্মগত বিতৃষ্ণা রয়েছে। তাঁদের মতো উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব থাকতে আবু জুনায়েদের মতো একজন ওঁচা মার্কা মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের আসনে বসল এই ঘটনাটি কি আবু জুনায়েদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হওয়ার মুখ্য কারণ হতে পারে না? কিছুদিন থেকে কয়েকদিন অন্তর অন্তর সুন্দরী দিলরুবা খানম এই আড্ডায় অংশগ্রহণ করতে আরম্ভ করেছেন। যদিও প্রবীণ শিক্ষকদের স্ত্রীরা দিলরুবা খানমকে ভীষণ অপছন্দ করেন, কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে হলেও তাঁরা দিলরুবার সঙ্গে মেলামেশা করেন। দিলরুবা যখন আসেন তাঁর পিঠ ঝাপা এলানো চুলের সৌরভে বাতাস পর্যন্ত গন্ধময় হয়ে ওঠে। কাঠ কয়লায় আগুনের ছোঁয়া লাগলে যেমন নতুন করে আগুন জ্বলে ওঠে, তেমনি দিলরুবা খানম এলেই বুড়ো অধ্যাপকেরা রক্তের মধ্যে যৌবনের তেজ অনুভব করতে থাকেন। দিলরুবা ঝড়ের মতো আসেন, ঝড়ের মতো চলে যান। এই গতিময়তাই তাঁকে অনেক বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছে। তিনি এসেই আবু জুনায়েদের কুকীর্তির কথা পাঁচ কাহন করে বলতে থাকেন। তার মধ্যে সত্যের ভাগ যথেষ্ট নয়, তথাপি তাঁর বলার ভঙ্গিটি এমন মনোরম যে সকলকে তাঁর মতে সায় দিতে হয়। আবু জুনায়েদকে দেখলে মানুষের শরীরে বোয়াল মাছের মাথা লাগানো এক কিম্ভূতকিমাকার প্রাণীর মতো মনে হয়, এই আশ্চর্য সদৃশ্যটি তিনি এই আড্ডায় এসে আবিষ্কার করেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে যাঁরা যান না, গাছের গুঁড়ির নাস্তিকদের আড্ডায় যেতে ঘৃণাবোধ করেন, সেই সমস্ত শিক্ষকেরা আবু জুনায়দের গোয়ালঘরে সন্ধ্যেবেলা আসতে আরম্ভ করেছেন। আবু জুনায়েদ ভেবে দেখলেন এবারেও বিনা প্রয়াসে ভাগ্য তাঁকে অনুগ্রহ করেছে। তিনি ভীতি এবং আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটচ্ছিলেন। মানসিক নিঃসঙ্গতাবোধ তাঁকে ভয়ানক রকম পীড়ন করছিল। বাড়িতে নুরুন্নাহার বানুর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। ঝগড়ার সম্পর্কও একটি সম্পর্ক আবু জুনায়েদ গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন। তাঁর প্রবল শঙ্কা শেখ তবারক আলীর দেয়া গরু এবং গোয়াল বিষয়ক ঘটনাগুলো প্রকাশিত যদি হয়ে পড়ে তিনি সমাজে সর্বকালের সবচাইতে দুর্নীতিপরায়ণ উপাচার্য হিসেবে নিন্দিত হবেন। আত্মহত্যা করেও তিনি কলঙ্কের দায় থেকে মুক্ত হতে পারবেন না।

এই আড্ডাটি জমে উঠতে দেখে তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। মনে মনে ভাবলেন, তিনি যে মাঝে-মাঝে শুক্রবার মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়েন, আল্লাহতায়ালা তার কিছু ফল দিতে আরম্ভ করেছেন। নইলে বলা নেই, কওয়া নেই, বলতে গেলে একেবারে শূন্য থেকে এই আড্ডাটি জমে উঠত না। মাওলানা আবু তাহের শুভ

সূচনাটি করে দিয়েছেন, একথা সত্য বটে। কিন্তু আল্লাহ তো তাঁর রহমত কোনো ব্যক্তির অছিলায় বখশিস করে থাকেন।

আবু জুনায়েদের গোয়ালঘরের আড্ডায় যে সমস্ত শিক্ষক আসতে শুরু করেছেন, তাঁদের সম্পর্কেও কিছু না বললে অন্যায় করা হবে। মাওলানা আবু তাহের নিছক খেয়ালের বশে মিনি চিড়িয়াখানার ভিত গড়ে দিয়েছিলেন। তারপরে জনার্দন চক্রবর্তী চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করার জন্য এসেছিলেন। তারপরে এসেছিলেন পালি বিভাগের ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া। বড়ুয়া বাবু তাঁর জন্য একটি বাড়ি বরাদ্দের তদবির করতে এসেছিলেন। আবু জুনায়েদ এমনভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন, তিনি বাড়ি পেতেও পারেন, আবার নাও পেতে পারেন। পেতে পারেন কারণ তাঁর চাকরি অনেক দিনের। আবার না পেতে পারেন কারণ বাড়ি খুব অল্প, দাবিদার অনেক। যা হোক তিনি চেষ্টা করবেন। তারপর থেকে সুমঙ্গল বাবু আড্ডায় স্থায়ী সদস্য হয়ে গেলেন। তিনি আবু জুনায়েদের গরু এবং পাখিগুলোকেও পছন্দ করে ফেললেন। ড. সুমঙ্গল বড়ুয়ার পর ফিজিক্স বিভাগের ড. দেলোয়ার হোসেন। ড. দেলোয়ার হোসেনের ইন্টারমিডিয়েটে থার্ড ডিভিশন ছিল। সেটাই তাঁর প্রফেসর হওয়ার পথে মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূরি ভূরি থার্ড ডিভিশন পাওয়া শিক্ষক প্রফেসর হয়ে গেছেন। সেটা আসল কথা নয়, বিভাগীয় চেয়ারম্যানের সঙ্গে ড. হোসেনের সম্পর্ক ভালো নয়। বিভাগীয় চেয়ারম্যান অনুমোদন করছেন না বলেই তাঁর প্রমোশন ঠেকে আছে। উপাচার্য সাহেবকে গোয়ালঘরে নিরিবিলিতে পাওয়া যায়। তাঁর ওপর যে দীর্ঘকাল ধরে অবিচার চলছে সেই দুঃখের কথাটি জানাতে এসেছিলেন। আবু জুনায়েদ জানিয়েছিলেন ফিজিক্স বিভাগের চেয়ারম্যান খুব ঘাউরা টাইপের মানুষ। তবু তিনি তাঁর প্রভাব খাটিয়ে চেষ্টা করবেন, কিছু করা যায় কি না। তারপর থেকে সন্ধ্যে হলেই ড. দেলোয়ার হোসেন আড্ডায় হাজির থাকতে আরম্ভ করলেন। এভাবে তিন মাসের মধ্যে অর্থী প্রার্থী মিলে বিশ পঁচিশ জন শিক্ষক গোয়ালঘরে নিয়মিত হাজিরা দিতে আরম্ভ করলেন। দর্শন বিভাগের আয়েশা খানম আসতে আরম্ভ করায় আড্ডাটির কিঞ্চিৎ জৌলুশ বেড়েছে। আয়েশা খানমের তেমন কোনো দাবি নেই। তবে তিনি পুরুষ মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে যৌন সুখের মতো এক প্রকার সুখ অনুভব করে থাকেন। এই মহিলাকে সকলে কেন এড়িয়ে চলতেন, এক কথায় বলা মুশকিল। হয়ত তাঁর বয়স একটু বেশি, হয়ত তার স্থুল বপু এবং পানদোক্তা খাওয়া গ্যাটগেটে লাল দাঁতের কারণে পুরুষ শিক্ষকেরা তাঁকে পছন্দ করেন না। মাছ যেমন পানিতে সাঁতার কাটে, পাখি আকাশে ওড়ে আয়েশা খানমও এই আড্ডার মূল কুশীলবদের একজন হয়ে গেলেন। তিনি সদস্যের জন্য বাড়ি থেকে কখনো চিড়ে ভাজা এবং কোরানো নারকেল এনে সকলকে খেতে দিতেন। মাঝে-মাঝে আবু জুনায়েদকেও কিছু গাঁটের পয়সা উপুড় করতে হত। আড্ডার সদস্যদের নিয়মিত চা এবং বিস্কুট সরবরাহ করতে হত। নিরামিষ আড্ডা স্থায়ী হয় না। একবার তিনি সেরা দোকান থেকে তন্দুরি এবং শিক

কাবাব এনে সকলকে খাইয়েছেন। আরেকবার নাতি অন্তুর জন্মদিনে সকলকে সন্দেশ পায়েশ এবং শবরি কলা দিয়ে আপ্যায়ন করেছেন।

আবু জুনায়েদ লক্ষ্য করেছেন, তার এখানে যাঁরা আসেন তাঁরা কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেগুনি, হলুদ এবং ডোরাকাটা দলের সঙ্গে যুক্ত নন। সকলেই আলাদা আলাদা ব্যক্তি। কারো দলীয় পরিচয় নেই। ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত থাকাই নির্দলীয় শিক্ষকদের সবচাইতে বড় দল। আবু জুনায়েদ ভাবনাচিন্তা করতে আরম্ভ করেছেন, এই ভাঙাচোরা শিক্ষকদের সংগঠিত করেই তিনি ইচ্ছে করলে একেবারে নিজস্ব একটি দল খাড়া করতে পারেন। তাঁর নিজের ডোরাকাটা দলটির কোনো কোনো শিক্ষক তাঁকে এমনভাবে নাজেহাল করতে আরম্ভ করেছেন, আত্মরক্ষার্থে এরকম কোনো পরদক্ষেপ গ্রহণ করবেন কি না, একথাটা তাঁর বিবেচনার মধ্যে রয়েছে।

আবু জুনায়েদের চুটিয়ে আড্ডা দেয়ার একটা অসুবিধা হল, টেলিফোন এলে তাঁকে বারে বারে ছুটে যেয়ে কল রিসিভ করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে তো সরকারি বেসরকারি নানা ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে যেতে হয়। বার বার উঠে যেতে হয় বলেই গল্পগুজবের মাঝখানে ছেদ পড়ে যায়। এক সন্ধ্যেবেলা জনার্দন চক্রবর্তী একটা অভিনব প্রস্তাব করে বসলেন :

–বৎস আবু জুনায়েদ তোমাকে টেলিফোনে কথা কহিবার জন্য বারে বারে উঠিয়া যাইতে হয়, ইহা আমাদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত অশোভন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উপাচার্য কেন বার বার টেলিফোন যন্ত্রের কাছে ছুটিয়া যাইবে। ইহার অন্যরকম একটা বিহিত বাহির করিতে চেষ্টা করো।

আবু জুনায়েদ বললেন,

–স্যার কী করতে বলেন, তাহলে টেলিফোন কি রিসিভ করব না?

–বৎস আবু জুনায়েদ আমার কথার মর্ম তুমি অনুধাবন করিতে পারো নাই। তুমি টেলিফোনের কাছে যাইবে কেন, টেলিফোন যন্ত্র তোমার কাছে ছুটিয়া আসিবে।

–কী করে সম্ভব স্যার।

–বৎস তুমি সরল জিনিসটি বুঝিতে পারিলে না। তুমি বাড়ি হইতে টেলিফোন যন্ত্রের শাখা অত্র স্থানে টানিয়া আনার হুকুম করো। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্মও এইখানে বসিয়া তুমি সম্পন্ন করিতে পারিবে। জায়গাটি অতীব মনোরম। গাভিটি তো অনিন্দ্য সুন্দর। বিহঙ্গগুলির কলকাকলি শুনতেও বেশ লাগে। আধারাত কাজ করিলেও শরীরে মনে কোনো শ্রান্তি অনুভব করিবে না। আমরা যেমন প্রত্যহ আসিয়া থাকি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মে যাহারা তোমার দর্শন লাভ করিতে চায়, তাহারাও এখানে আসিবে। তুমি হুকুম করো।

জনার্দন চক্রবর্তীর ঝুনো মস্তকে এরকম সুন্দর একটি পরামর্শ লুকিয়ে থাকতে পারে, কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। মাওলানা তাহের বললেন,

জনার্দন বাবু একটি চমৎকার প্রস্তাব করেছেন। ওল্ড মানে গোল্ড এই কথা প্রমাণিত হল। দুনিয়াতে বুড়ো মানুষের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে না। বাদশাহ

সিকান্দার জঙ্গে যাওয়ার সময় একদল বুড়ো মানুষ সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন। কোনো বিপদ আপদ হলে তাঁরা মুশকিল আসানের পথ বাতলে দিতেন, একবার হল কী জানেন...?

আয়েশা খনম মাওলানা তাহেরের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, তারপর আপনি একটা গল্প শুরু করলেন। কিন্তু আমরা চাই আগামী কালই টেলিফোনের এক্সটেনশন লাইন নিয়ে আসা হোক। দু'চারদিনেই গোয়ালঘরের উত্তরের শেডে টেলিফোনের এক্সটেনশন নিয়ে আসা হল। টেবিল পাতা হল। কোণার দিকে দুটো শেলফ বসে গেল। গোয়াল ঘরে উপাচার্যের একটা নতুন অফিস তৈরি হয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের খুচরো খাচরা কাজগুলো মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদ নতুন অফিসে বসেই সারতে লাগলেন। অনানুষ্ঠানিকভাবে যাঁরাই দেখা করতে আসেন, তাঁদেরকে উত্তরের শেডে আসতে বলা হল। মোগল সম্রাটেরা যেমন যেখানে যেতেন রাজধানী দিল্লিকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন, তেমনি আবু জুনায়েদও দিনে একবেলার জন্য গোটা বিশ্ববিদ্যালয়কে গোয়ালঘরে ঢুকিয়ে ফেলতেন। দিনে দিনে গোয়ালঘরটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃৎপিণ্ড হয়ে উঠল। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এটাই পৃথিবীর একমাত্র গোয়ালঘর, যেখান থেকে আস্ত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপদ্ধতি পরিচালিত হয়।

আর কিছুদিন না যেতেই গোটা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একটা চাঞ্চল্যকর সংবাদ ছড়িয়ে গেল। উপাচার্য সাহেব বিকেলবেলা গোয়ালঘরে বসেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা কাজকর্ম পরিচালনা করে থাকেন। তাঁর গরু এবং মিনি চিড়িয়াখানা সম্বন্ধেও নানারকম আজগুবি খবর ছড়িয়ে পড়তে থাকল। এটাকে ঠিক গরু বলা যাবে কি না সে ব্যাপারেও বিতর্ক আছে। গরুটির গর্ভধারিণী হল সুন্দর বনের একটা শিঙাল মাদি হরিণ এবং বাবা অস্ট্রেলিয়ান ষাঁড়। মাদী হরিণের গর্ভে একং অস্ট্রেলিয়ান ষাঁড়ের ঔরসে উপাচার্য সাহেবের গরুটি পয়দা হয়েছে। গরুটির আকার প্রকার গরুর মতো। গায়ের রঙ, চোখের দৃষ্টি, স্বভাবের চঞ্চলতা সবটা হরিণের মতো। গরুটি এই অল্প সময়ের মধ্যে উপাচার্য সাহেবের কল্জার টুকরো হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদণ্ড দৃষ্টির আড়াল করতে চান না। নিজের হাতে উপাচার্য সাহেব গরুটিকে খাওয়ান, নিজে গোসল করান, সাধ্যমতো মলমূত্রও নিজে পরিষ্কার করেন। অন্য কাউকে গরুটির ধারেকাছেও ঘেঁষতে দেন না।

এটাই একমাত্র গুজব নয়। গরুটাকে কেন্দ্র করে আরো একটা কাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী এবং মহিলা মহলে চালু হয়ে গেছে। একটা জ্বীন কিংবা পরীর সঙ্গে উপাচার্য আবু জুনায়েদের গভীর ভালবাসা হয়েছে। এই পরীটাই দিনের বেলা সুন্দর একটা গরুর বেশ ধরে গোয়ালঘরে শুয়ে থাকে। রাত গভীর হলে অনিন্দ্যসুন্দর একটা মেয়ে মানুষ হয়ে আবু জুনায়েদের সঙ্গে রঙ ঢঙ মতো কিছু করে। আবু জুনায়েদ রাতে ঘরে থাকেন না। পরী কন্যার সঙ্গেই গোটা রাত আশনাই করে কাটিয়ে দেন। এখন আবু জুনায়েদের সঙ্গে তার বড় পত্নী নুরুন্নাহার বানুর

কোনোও সম্পর্ক নেই। স্বামী স্ত্রীতে কথা বলা পর্যন্ত বন্ধ। তৃতীয় আরেকটি গুজব টিচার্স ক্লাবে তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে বিশেষ চমৎকারিত্ব নেই। নিতান্ত সাদামাঠা ধরনের। সেটা এরকম–আবু জুনায়েদ নাকি স্থির করেছেন, উপাচার্যের চাকরির মেয়াদ ফুরোলে তিনি দুধের ব্যবসা করবেন। কারণ তিনি হিসেব করে দেখেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার চাইতে গাভি পুষে গয়লাগিরি করা অনেক লাভজনক।

কিছুদিন বাদেই নিউজপ্রিন্টে ছাপা একটি লিফলেট হাতে হাতে তামাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছড়িয়ে গেল। লিফলেটের শিরোনাম দেয়া হয়েছে 'উপাচার্য না গো আচার্য'। কারা এই লিফলেট ছেপেছে, কারা বিলি করেছে তার কোনো উল্লেখ নেই। মূল বয়ানটা এরকম– ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক–শিক্ষিকা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন কর্মচারী এবং দেশপ্রেমিক দায়িত্বশীল নাগরিকবৃন্দের কাছে আকুল আবেদন : আপনাদের কাছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গরীয়ান ঐতিহ্যের কথা অজনা থাকার কথা নয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতে বাংলাদেশের গর্ব করার সম্পদ দ্বিতীয়টি নেই। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকেরা এই অঞ্চলে একটি নতুন ইতিহাসের ভিত্তিভূমি রচনা করেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ভ থেকে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম জন্ম নিয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান-বিজ্ঞান মেধা মনীষায় একদা সমস্ত ভারতবর্ষে একটা বিশিষ্ট স্থান দখল নিয়েছিল। মাননীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী ভাইবোনেরা, সম্মানিত দেশপ্রেমিক নাগরিকবৃন্দ আপনারা সকলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণোজ্জ্বল গৌরবমণ্ডিত দিনের কথা স্মরণ করে অশ্রুপাত করুন। আজকের দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই অতীত দিনের গৌরবের লেশমাত্রও অবশিষ্ট নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে হরদম খুনাখুনি হামলাহামলি চলছে। নিয়মিত ক্লাস বসছে না, পরীক্ষা হতে পারছে না, সেশনজট লেগে আছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বেরুতে ছেলেদের চাকরির বয়স চলে যায়, মেয়েদের বিয়ের বয়স পার হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সর্বত্র দুর্নীতির আখড়া বসেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠিত সমস্ত অপকর্মের জন্য দায়ী ডোরাকাটা দল। ওই দলটি কতিপয় দেশদ্রোহী শিক্ষকদের একটি সংগঠন। তারা ছলেবলে কৌশলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ক্ষমতা আপন মুঠোয় নিয়ে এই সুপ্রাচীন বিদ্যাপীঠটি ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে সর্বক্ষণ তৎপর রয়েছে। ডোরাকাটা দল এমন এক ব্যক্তিকে উপাচার্যের পবিত্র আসনটিতে বসিয়েছে, জ্ঞান বিদ্যার প্রতি যার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবোধও নেই। ওই উপাচার্যটি তাঁর পোষা গরুর পেছনে যত সময় ব্যয় করেন, গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তার তিনভাগের এক ভাগ সময়ও ব্যয় করেন না। এই ব্যক্তি এই ঐতিহ্যমণ্ডিত বিশ্ববিদ্যালয়টিকে গোশালায় পরিণত করার বন্দোবস্ত একরকম পাকা করে এনেছেন। এই ব্যক্তি যদি দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে, শুধু কঙ্কালটিই টিকে থাকবে। এখনো সময় চলে যায়নি। সকলের কাছে উদাত্ত আহ্বান রাখছি আমাদের এই মহান বিশ্ববিদ্যালয়কে ডোরাকাটা দল

এবং তাঁদের মনোনীত উপাচার্য আবু জুনায়েদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করার জন্য সকলে এগিয়ে আসুন।

এই লিফলেটের কয়েকটি কপি যথারীতি গোয়ালঘরের সান্ধ্য আসরে এসে পৌঁছাল। আড্ডায় রীতিমতো একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল। সকলেরই একটা প্রশ্ন। এরকম নোংড়া কর্ম কে বা কারা করতে পারে। সকলেরই ধারণা গাছের গুঁড়ি অলাদের সঙ্গে এই লিফলেটের একটা সম্পর্ক অবশ্যই আছে। ড. দেলোয়ার হোসেন নিশ্চিত করে বললেন,

–ড. আহমদ তকির উস্কানিতেই এই লিফলেট ছাড়া হয়েছে। তকি সাহেবের সার্ভিস এক্সটেনশনের আবেদনপত্রে উপাচার্য সাহেব সুপারিশ করেননি বলেই তাঁর বিরুদ্ধে তিনি উঠে পড়ে লাগতে এসেছেন।

দর্শন বিভাগের আয়েশা খানম ড. দেলোয়ার হোসেনের মুখের কথা টেনে নিয়ে মন্তব্য যোগ করলেন,

–উপাচার্য সাহেব যদি একটিও ভালো কাজ করে থাকেন, আমার মতে সেটি হল ড. তকির সার্ভিস এক্সটেনশনের আবেদনে সুপারিশ না করা। ড. তকি একজন ঘোরতর নাস্তিক–সেটা যথেষ্ট নয়, তিনি মাস্তান শিক্ষকদের নেতাও বটে। ফার্মেসী বিভাগের ড. ফারুক আহমদ একটু ভিন্নরকম কথা বললেন। তাঁর মতে :

–এই লিফলেটের সঙ্গে ড. আহমদ তকির একটা সম্পর্ক আছে অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে আমার বিশ্বাস ভাষাটা তকি সাহেবের নিজের নয়। তকি সাহেব গদ্য লেখার সময় তৎসম শব্দের অপপ্রয়োগ করেন এবং তাঁর যে কোনো লেখায় স্নিক প্রত্যয়ান্ত শব্দ অবশ্যই থাকতে বাধ্য। আপনারা লিফলেটটি আবার পড়ে দেখুন, সেরকম একটি শব্দও খুঁজে পাবেন না। আমার বিশ্বাস এই লিফলেটটির লেখার সঙ্গে কোনো মহিলার হাত অবশ্যই আছে। রচনার রীতি দেখে মনে হয় লিফলেটটি রচনা করে থাকবেন দিলরুবা খানম।

উপস্থিত সকলের মতামতও তাই। হ্যাঁ দিলরুবা খানমের কলম থেকে এরকম একটি লিফলেট জন্ম নিতে পারে। বোটানি বিভাগের ড. মাহমুদুল আলম গম্ভীরভাবে বললেন,

–এই লিফলেট কে লিখেছেন বা কারা লিখেছেন সেটি বিচার্য বিষয় নয়। আমার কথা হল এই নোংড়া লিফলেটের একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন জবাব দেয়া প্রয়োজন। বুঝিয়ে দেয়া উচিত বিশ্ববিদ্যালয় নোংরামির জায়গা নয়। উপাচার্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, কী বলেন স্যার?

আবু জুনায়েদ চশমার কাচ মুছতে মুছতে জবাব দিলেন,

–আমি কী বলব। বিশ্ববিদ্যালয় আপনাদের, আপনারা যা উচিত মনে করেন, করবেন।

সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল অত্যন্ত রুচিসম্মত ভাষায় এই লিফলেটটির একটি জবাব দেয়া হবে। সেটি লেখার ভার বাংলা বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর ড.

কোনোও সম্পর্ক নেই। স্বামী স্ত্রীতে কথা বলা পর্যন্ত বন্ধ। তৃতীয় আরেকটি গুজব টিচার্স ক্লাবে তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে বিশেষ চমৎকারিত্ব নেই। নিতান্ত সাদামাঠা ধরনের। সেটা এরকম–আবু জুনায়েদ নাকি স্থির করেছেন, উপাচার্যের চাকরির মেয়াদ ফুরোলে তিনি দুধের ব্যবসা করবেন। কারণ তিনি হিসেব করে দেখেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার চাইতে গাভি পুষে গয়লাগিরি করা অনেক লাভজনক।

কিছুদিন বাদেই নিউজপ্রিন্টে ছাপা একটি লিফলেট হাতে হাতে তামাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছড়িয়ে গেল। লিফলেটের শিরোনাম দেয়া হয়েছে 'উপাচার্য না গো আচার্য'। কারা এই লিফলেট ছেপেছে, কারা বিলি করেছে তার কোনো উল্লেখ নেই। মূল বয়ানটা এরকম– ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক–শিক্ষিকা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন কর্মচারী এবং দেশপ্রেমিক দায়িত্বশীল নাগরিকবৃন্দের কাছে আকুল আবেদন : আপনাদের কাছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গরীয়ান ঐতিহ্যের কথা অজনা থাকার কথা নয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতে বাংলাদেশের গর্ব করার সম্পদ দ্বিতীয়টি নেই। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকেরা এই অঞ্চলে একটি নতুন ইতিহাসের ভিত্তিভূমি রচনা করেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ভ থেকে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম জন্ম নিয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান-বিজ্ঞান মেধা মনীষায় একদা সমস্ত ভারতবর্ষে একটা বিশিষ্ট স্থান দখল নিয়েছিল। মাননীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী ভাইবোনেরা, সম্মানিত দেশপ্রেমিক নাগরিকবৃন্দ আপনারা সকলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণোজ্জ্বল গৌরবমণ্ডিত দিনের কথা স্মরণ করে অশ্রুপাত করুন। আজকের দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই অতীত দিনের গৌরবের লেশমাত্রও অবশিষ্ট নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে হরদম খুনাখুনি হামলাহামলি চলছে। নিয়মিত ক্লাস বসছে না, পরীক্ষা হতে পারছে না, সেশনজট লেগে আছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বেরুতে ছেলেদের চাকরির বয়স চলে যায়, মেয়েদের বিয়ের বয়স পার হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সর্বত্র দুর্নীতির আখড়া বসেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠিত সমস্ত অপকর্মের জন্য দায়ী ডোরাকাটা দল। ওই দলটি কতিপয় দেশদ্রোহী শিক্ষকদের একটি সংগঠন। তারা ছলেবলে কৌশলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ক্ষমতা আপন মুঠোয় নিয়ে এই সুপ্রাচীন বিদ্যাপীঠটি ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে সর্বক্ষণ তৎপর রয়েছে। ডোরাকাটা দল এমন এক ব্যক্তিকে উপাচার্যের পবিত্র আসনটিতে বসিয়েছে, জ্ঞান বিদ্যার প্রতি যার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবোধও নেই। ওই উপাচার্যটি তাঁর পোষা গরুর পেছনে যত সময় ব্যয় করেন, গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তার তিনভাগের এক ভাগ সময়ও ব্যয় করেন না। এই ব্যক্তি এই ঐতিহ্যমণ্ডিত বিশ্ববিদ্যালয়টিকে গোশালায় পরিণত করার বন্দোবস্ত একরকম পাকা করে এনেছেন। এই ব্যক্তি যদি দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে, শুধু কঙ্কালটিই টিকে থাকবে। এখনো সময় চলে যায়নি। সকলের কাছে উদাত্ত আহ্বান রাখছি আমাদের এই মহান বিশ্ববিদ্যালয়কে ডোরাকাটা দল

এবং তাঁদের মনোনীত উপাচার্য আবু জুনায়েদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করার জন্য সকলে এগিয়ে আসুন।

এই লিফলেটের কয়েকটি কপি যথারীতি শেয়ালঘরের সান্ধ্য আসরে এসে পৌঁছাল। আড্ডায় রীতিমতো একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল সকলেরই একটা প্রশ্ন। এরকম নোংড়া কর্ম কে বা কারা করতে পারে সকলেরই ধারণা গাছের গুঁড়ি অলাদের সঙ্গে এই লিফলেটের একটা সম্পর্ক অবশ্যই আছে। ড. দেলোয়ার হোসেন নিশ্চিত করে বললেন,

–ড. আহমদ তকির উস্কানিতেই এই লিফলেট ছাড়া হয়েছে। তকি সাহেবের সার্ভিস এক্সটেনশনের আবেদনপত্রে উপাচার্য সাহেব সুপারিশ করেননি বলেই তাঁর বিরুদ্ধে তিনি উঠে পড়ে লাগতে এসেছেন।

দর্শন বিভাগের আয়েশা খানম ড. দেলোয়ার হোসেনের মুখের কথা টেনে নিয়ে মন্তব্য যোগ করলেন,

–উপাচার্য সাহেব যদি একটিও ভালো কাজ করে থাকেন, আমার মতে সেটি হল ড. তকির সার্ভিস এক্সটেনশনের আবেদনে সুপারিশ না করা। ড. তকি একজন ঘোরতর নাস্তিক–সেটা যথেষ্ট নয়, তিনি মাস্তান শিক্ষকদের নেতাও বটে। ফার্মেসী বিভাগের ড. ফারুক আহমদ একটু ভিন্নরকম কথা বললেন। তাঁর মতে :

–এই লিফলেটের সঙ্গে ড. আহমদ তকির একটা সম্পর্ক আছে অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে আমার বিশ্বাস ভাষাটা তকি সাহেবের নিজের নয়। তকি সাহেব গদ্য লেখার সময় তৎসম শব্দের অপপ্রয়োগ করেন এবং তাঁর যে কোনো লেখায় স্নিক প্রত্যয়ান্ত শব্দ অবশ্যই থাকতে বাধ্য। আপনারা লিফলেটটি আবার পড়ে দেখুন, সেরকম একটি শব্দও খুঁজে পাবেন না। আমার বিশ্বাস এই লিফলেটটির লেখার সঙ্গে কোনো মহিলার হাত অবশ্যই আছে। রচনার রীতি দেখে মনে হয় লিফলেটটি রচনা করে থাকবেন দিলরুবা খানম।

উপস্থিত সকলের মতামতও তাই। হ্যাঁ দিলরুবা খানমের কলম থেকে এরকম একটি লিফলেট জন্ম নিতে পারে। বোটানি বিভাগের ড. মাহমুদুল আলম গম্ভীরভাবে বললেন,

–এই লিফলেট কে লিখেছেন বা কারা লিখেছেন সেটি বিচার্য বিষয় নয়। আমার কথা হল এই নোংড়া লিফলেটের একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন জবাব দেয়া প্রয়োজন। বুঝিয়ে দেয়া উচিত বিশ্ববিদ্যালয় নোংরামির জায়গা নয়। উপাচার্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, কী বলেন স্যার?

আবু জুনায়েদ চশমার কাচ মুছতে মুছতে জবাব দিলেন,

–আমি কী বলব। বিশ্ববিদ্যালয় আপনাদের, আপনারা যা উচিত মনে করেন, করবেন।

সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল অত্যন্ত রুচিসম্মত ভাষায় এই লিফলেটটির একটি জবাব দেয়া হবে। সেটি লেখার ভার বাংলা বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর ড.

আনোয়ারুল আজিমের ওপর দেয়া হল। তিনি আগামী কাল সন্ধ্যেবেলা খসড়াটি করে আনবেন কথা দিলেন।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা গোয়ালঘরের সান্ধ্য আসরে সকলে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছেন। কিন্তু ড. আজিমের দেখা নেই। সকলের উৎকণ্ঠা বেড়ে গেল। ড. দেলোয়ার হোসেন বিরক্ত হয়ে বললেন,

–ড. আজিম পারবেন না বললেই হত। না হয় বাংলা একটু কম জানি। তবু তো চেষ্টা করে দেখা যেত।

ড. আয়েশা খানম মন্তব্য করে বসলেন,

–খোঁজ নিয়ে দেখেন গিয়ে হয়ত ড. আহমদ তকির খপ্পরে পড়ে গেছেন। এক সময় তো আজিম তকি সাহেবের পেছনে ছায়ার মতো ঘোরাঘুরি করতেন।

মাওলানা আবু তাহের বললেন,

–সে তো চাকরি পাবার পূর্বের ঘটনা। এখন জমানা পাল্টে গেছে। একটু অপেক্ষা করুন। দেখেন আসবেন।

সত্যি সত্যি ড. আজিম এলেন। লিফলেটের খসড়াটি তাঁর হাতে ধরা রয়েছে। তিনি কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বললেন,

–আমি দুঃখিত। একটু দেরি হয়ে গেল। তিন চারবার কপি করতে হল কিনা।

দেলোয়ার হোসেন সাহেব বললেন, আপনাকে আর ভণিতা করতে হবে না। কী লিখে এনেছেন পড়ে ফেলুন।

ড. আজিম জামার খুটে কাচ মুছে মুছে চশমাটি নাকের ডগায় চড়ালেন। প্রথমে একটা গলা খাকারি দিলেন। তারপর লাজুক ভঙ্গিতে বললেন,

–আমাদের লিফলেটেরও একটা শিরোনাম দেয়া হয়েছে। আর সেটা হল 'মহান উপাচার্য : বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি'।

মাওলানা তাঁকে বললেন, চমৎকার পড়ে যান।

ড. আজিম আবার একটু ভণিতা করলেন,

–আমি গোটা লিফলেটটি সাধু ভাষাতেই রচনা করিয়াছি। সাধু ভাষার একটা বিশেষ প্রসাদগুণ রয়েছে।

ড. ফারুক আহমদ একটু অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন। তিনি বললেন,

–ড. আজিম লেখাটা পড়ে যান। পরে গুণাগুণ বিচার করব, আমরা শিশু নই।

অতএব ড. আনোয়ার আজিম পড়তে আরম্ভ করলেন :

–জগৎ পরিবর্তনশীল। কাল সহকারে কত কিছুরই পরিবর্তন হইতেছে। দিবস আঁধারে মিলাইতেছে, নদী সমুদ্রে পড়িতেছে। রাজ্য ও সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইতেছে, আবার নতুন রাজ্য গড়িয়া উঠিতেছে। শিশু কিশোর হইতেছে, কিশোর যুবক হইতেছে এবং বৃদ্ধ মৃত্যুর মুখে ঢলিয়া পড়িতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে পরিবর্তন জগতের ধর্ম। যে কেহ পরিবর্তনকে মানিয়া লইবে না সে আপনার মৃত্যুর পথ আপনি প্রশস্ত করিবে আপনার কবর আপনি খনন করিবে।

জাতীয় জীবনে আমাদিগকে এত দুর্ভাগ্যের বোঝা বহন করিয়া বেড়াইতে হইতেছে, তার মূল কারণ কী হইতে পারে? কারণ একটাই। আমরা পরিবর্তনকে মানিয়া লই নাই। আমাদের প্রাণপ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এত অত্যাচার, এত অন্যায়, এত খুন, এত জীবনের অপচয়, সময়ের অপচয়, অর্থের অপচয় কেন অহরহ ঘটিতেছে তার কারণ কি কেহ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? ঐ একটাই কারণ জাতীয় জীবনের মতো বিশ্ববিদ্যালয়েও আমরা পরিবর্তনকে মানিয়া লই নাই। তাহার ফল এই হইয়াছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা অধঃপতনের চরম সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিদায় লইয়াছে, পাকিস্তানিরা চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা ব্রিটিশ এবং পাকিস্তানিদের সমস্ত নিয়মকানুন আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছি। ব্রিটিশ আমলে উপাচার্যেরা যে ধরনের কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতেন, সেইভাবে জনবিচ্ছিন্নভাবে গজদন্ত মিনারে অবস্থান করিয়া ক্ষমতার মহিমা এবং স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিতেন, পাকিস্তানি আমলের উপাচার্যেরা সেই জীবন পদ্ধতির অক্ষম অনুকরণ করিয়াছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানি আমলের উপাচার্যদের অনুকরণ করিয়াছেন। এই পৌনঃপুনিক অনুকরণের কারণে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অনেকদিন পর্যন্ত মৌলিক চিন্তাশক্তিসম্পন্ন কোনো বাংলাদেশী উপাচার্যের নিকট হইতে সঠিক দিক নির্দেশনা লাভ করিতে পারে নাই। স্বাধীনতার পর হইতে বেগুনি দলটি নানারকম তালবাহানা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহারা নিজেদের স্বার্থেই পরিবর্তনের স্রোত রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই পরিবর্তনকে ঠেকাইতে গিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহকে কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এত অনিয়ম হইতেছে, এত অন্যায় হইতেছে, এত খুন হইতেছে, এত সেশনজট হইতেছে, জীবনের এত অপচয় হইতেছে সবকিছুর জন্য বেগুনি দলই দায়ী। ডোরাকাটা দল তাহাদের অন্যায় অবিচার সংশোধন করিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করিবার জন্য সদাসর্বদা তৎপর রহিয়াছে। তাঁহাদের মনোনীত উপাচার্য মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদ সাহেব কোনোরকম দ্বিধা দ্বন্দ্ব না করিয়া ঔপনিবেশিক আমলের উপাচার্যের জীবন পদ্ধতি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তিনি একেবারে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের জীবনের একই সমতলে নামিয়া আসিয়াছেন। তিনি গাছপালা পশুপাখির মধ্যে জীবনের পূর্ণতা এবং সার্থকতা আবিষ্কার করিতে তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। ইহা কি একটি মহান বৈপ্লবিক দৃষ্টান্ত নয়? অতীতে কোন উপাচার্য সাজানো-গোছানো অফিসের মায়া ছাড়িয়া একজন সরল গ্রামীণ মানুষের মতো একটি চালঘরে নিজের দপ্তর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গবাদি পশুর সঙ্গে, বিহঙ্গের সঙ্গে জীবন এবং কর্তব্য ভাগ করিয়া লইয়াছেন। যাহাদের দৃষ্টি নীচ তাহারা সর্বত্র নীচতা দেখিতে পাইবেন তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। বর্তমান বিশ্বে সর্বত্র পরিবেশ রক্ষার আওয়াজ বুলন্দ হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক পৃথিবীর সভ্য মানুষের পরিবেশ রক্ষার উদাত্ত আহ্বান তাঁহাদের মর্মে প্রবেশ করে নাই। তাঁহারা মধ্যযুগের অন্ধকারে

চক্ষু আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন, দিনের আলোক দেখিতে পাইতেছেন না। প্রকৃতি মানুষের একার নয়। মানুষকে পশুপাখি, গাছপালার সঙ্গে প্রকৃতি সমানভাবে ভাগ করিয়া লইতে শিক্ষা করিতে হইবে। এইটাই হইল সভ্যতার মর্মবাণী। আবু জুনায়েদ সাহেব বাংলাদেশের শতকরা পঁচাশি জন কৃষিজীবী মানুষের জীবনের সঙ্গে সহমর্মিতা প্রকাশ করিবার জন্য অনেক কষ্ট করিয়া একটি গবাদি পশুকে আদর করিয়া পুষিতেছেন। পরিতাপের বিষয় হইল বেগুনি দলের লোকেরা তাঁহার এই দৃষ্টান্তমূলক কর্মটির অপব্যাখ্যা করিতেছে। দেশের মানুষ ভালো করিয়া জানে কে বন্ধু, কে শত্রু। আমাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন গরুকে লইয়া যাহারা ব্যঙ্গ করে, দেশের মানুষ তাহাদের চিনিয়া লইতে ভুল করিবে না। সুতরাং আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক কর্মচারী এবং কোটি কোটি দেশবাসীর পক্ষ হইতে বলিব, মহান আবু জুনায়েদ আপনি আপনার বৈপ্লবিক জীবনদর্শন লইয়া আগাইয়া চলিতে থাকুন, আমরা সকলে আপনার পেছনে রহিয়াছি।

ড. আজিম পিনপতন নিস্তব্ধতার মধ্যে লিফলেটের খসড়াটি পাঠ করে গেলেন। শেষ হলে সকলেই একবাক্যে বললেন, চমৎকার। আবু জুনায়েদ ড. আজিমের দিকে প্রথম নতুন চোখে তাকাতে আরম্ভ করলেন। তার কর্মের মধ্য থেকে একটা জীবনদর্শন আবিষ্কার করা রীতিমতো সেয়ানা মস্তকের কাজ। ঠিক করলেন প্রফেসর পদে তাঁর প্রমোশন দেয়া যায় কি না চেষ্টা করে দেখবেন। সেদিন সন্ধ্যেবেলা উপাচার্য সাহেব দোকান থেকে বিরিয়ানি আনিয়ে সকলকে খাওয়ালেন। একেবারে তাঁর নিজের একটি দল তৈরি হয়ে গেল।

তের

কিছুদিন যেতে না যেতেই আবু জুনায়েদের গোয়ালঘর নিরন্তর কর্মতৎপরতার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। শুধু সন্ধ্যেবেলা নয়, ছুটির দিনে, কর্মচারিদের কর্মবিরতির দিনে কিংবা ছাত্রদের ডাকা ধর্মঘটের দিনগুলো সকালবেলাতে এ গোয়ালঘরে নানারকম বৈঠক বসা শুরু হয়ে গেল। ডোরাকাটা দলের সকলে আবার এখন আবু জুনায়েদকে সমর্থন করেন না। কিছু বেগুনি দলে চলে গেছেন, কিছু হলুদ দলে যাব যাব করছেন। আগামীতে হলুদ দলটি শক্তিশালী হয়ে উঠবে তার যাবতীয় আলামত দেখা যাচ্ছে। আবু জুনায়েদ তাঁর নতুন সমর্থক মণ্ডলীদেরসহ ডোরাকাটা দলের অবশিষ্টাংশ নিয়ে একটি নতুন দল করবেন কি না ভেবে দেখছেন। যদি ভবিষ্যতে তেমন পরিস্থিতি আসে, তিনি হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারবেন না।

এই বাদ প্রতিবাদ, এই অনবরত বাকযুদ্ধ, এই লিফলেট, পাল্টা লিফলেট বিতরণ এসবের মধ্য দিয়ে আবু জুনায়েদের গরুটির কথাই প্রচারিত হল সর্বাধিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের একেবারে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা গরু বিষয়ক অনেক খবরাখবর জেনে গেল। শ্রবণসুখকর নয় এমন সব মুখরোচক গুজবও তৈরি হতে থাকল। ছাত্রদের মধ্যেও উপাচার্যের পক্ষে-বিপক্ষে জনমত তৈরি হতে থাকল। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা উপাচার্যের গাভি একটা চমৎকার শ্লেষাত্মক শব্দবন্ধ হিসেবে পরিচিতি পেয়ে গেল। যখন কোনো ছাত্র কোনো ছাত্রকে ইয়ার্কি করে তখন বলে বসে তুই বেটা উপাচার্যের গাভি। শ্লেষ প্রকাশে, অবজ্ঞা প্রকাশে নির্মল রসিকতায় উপাচার্যের গাভি শব্দবন্ধের ব্যাপক ব্যবহার চালু হয়ে গেল। উপাচার্যের গাভি শব্দবন্ধ অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তরুণ ছাত্রছাত্রীদের নানান ধরনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হয়ে দাঁড়াল।

উপাচার্যের গাভী শব্দবন্ধের অপব্যবহারকে কেন্দ্র করে দু'দল ছাত্রের মধ্যে একটা জবরদস্ত মারামারি হয়ে গেল। সময়মতো পুলিশ এসে না পড়লে খুনোখুনি হয়ে যেত। ঘটনাটি ঘটেছিল এভাবে। একজন সুন্দরী ছাত্রী তার পুরুষ বন্ধুকে নিয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় হাত ধরাধরি করে নিরিবিলি আলাপ করছিল। আরেকজন ফাজিল মতো ছাত্র এই মধুর দৃশ্য দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিৎকার করে উঠল, লে হালুয়া উপাচার্যের গাভি। মন্তব্যটি সুন্দরী মেয়েটির কানে গিয়েছিল। মেয়েটি একেবারে ধনুকের টানটান ছিলার মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেটিকে প্রশ্ন করে

বসল, কী বললে তুমি? ছেলেটি প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। এতটুকু সে আশা করেনি। মুখরক্ষার জন্য বলল, যা বলবার তো বলে ফেলেছি। তুমি চেতছো কেন? বাদানুবাদের এই পর্যায়ে তার পুরুষ বন্ধুটি তেড়ে এসে তার মুখে খুব জোরে একটা চড় বসিয়ে দিল। ছেলেটিও পাল্টা ঘুষি দিতে গেল। কিন্তু সে ছিল গায়ে গতরে একেবারে দুর্বল। মেয়েটির বন্ধুটি তাকে কিলঘুষি দিতে দিতে একেবারে রক্তাক্ত করে ছাড়ল। ছেলেটির তিনচারজন বন্ধুবান্ধব ক্যাফেটেরিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। তার করুণ অবস্থা দেখতে পেয়ে ওপক্ষের ছেলেটাকে আক্রমণ করে বসল। তারও বন্ধুবান্ধব ছিল। তারা বন্ধুকে রক্ষা করতে ছুটে এল। ব্যাস দু'দলে একটা খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। পনের বিশ মিনিটের মধ্যেই মারামারিটার একটা রাজনৈতিক আকার পেয়ে গেল। দুজন ছাত্রই দুটি প্রধান ছাত্রসংগঠনের হোমরাচোমরা। ছাত্রাবাসে ছাত্রাবাসে খবর রটে গেল। দলে দলে দুই দলের সৈনিকেরা শহীদ হওয়ার আবেগ নিয়ে একদল অন্যদলের বিরুদ্ধে ইট বৃষ্টি করতে লাগল। কাটা রাইফেল এল, রিভলবার এল, রামদা এল। চীনা কুড়ালের ফলায় সূর্যের আলো ঝকমক জ্বলে উঠল।

একদিন মাঘ শেষে খুব বৃষ্টি হয়েছিল। গোয়াল ঘরের আড্ডায় কোনো লোক আসেনি। আসবে কেমন করে–মাঘের শীতের চাইতে মেঘের শীত অনেক বেশি। আবু জুনায়েদ একা একা বসে গরুটার পেটের কাছে হাত দিয়ে গর্ভস্থ শিশুটির নড়াচড়া অনুভব করা যায় কি না পরখ করে দেখছিলেন। এমন সময়ে তিনি কাকের আওয়াজের মতো একটা কর্কশ গলা খাকারি শুনতে পেলেন। আবু জুনায়েদ তাকিয়ে দেখেন উত্তর দিকের শেডে একটা বেঁটেমতো মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর শরীর ওভারকোটে ঢাকা। গলায় মাফলার পেঁচানো। চট করে আবু জুনায়েদের মনে পড়ে গেল এই শহরে সুযোগ পেলে ওভারকোট পরে বেড়ায় এমন মানুষ একজন আছেন তিনি হলেন শহীদ হোসেন শিরওয়ানি। শিরওয়ানি সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য। সাম্প্রতিককালে বিরোধী দলের রাজনীতির সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সিনেটের অধিবেশনের সময় একাধিকবার আবু জুনায়েদকে একরকম উলঙ্গ করে ছেড়ে দিয়েছেন। আবু জুনায়েদ শহীদ হোসেন শিরওয়ানিকে কিছু বলার আগে নিজের মনকেই জিজ্ঞেস করলেন, শিরওয়ানি সাহেব মাঘ মাসের এই প্রচণ্ড শীত বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে কোন্ প্রয়োজনে তাঁর গোয়ালঘরে আসবেন। আবু জুনায়েদ উত্তরের শেডে এসে শিরওয়ানি সাহেবের মুখমণ্ডল ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন। তাঁর মুখে রসুনের শেকড়ের মতো না কামানো পাকা দাড়ি দেখতে পেলেন। শিরওয়ানি সাহেবই প্রথম কথা বললেন, 'জুনায়েদ ভাই'। আবু জুনায়েদের বিস্ময়বোধ মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। শিরওয়ানি সাহেবকে জীবনে এই প্রথম জুনায়েদ ভাই ডাকতে শুনলেন। তাঁর মতলবটা কী তিনি আঁচ করতে চেষ্টা করছিলেন। যা হোক, শিরওয়ানি সাহেব বলে গেলেন,

–জুনায়েদ ভাই লোকমুখে শুনেছি আপনি একটা গাভি সংগ্রহ করেছেন এবং মিনি চিড়িয়াখানা গড়ে তুলেছেন। পরিবেশচর্চায়ও নাকি মনোযোগ দিতে আরম্ভ

করেছেন। শুনে ভীষণ ভালো লাগল। ভালো জিনিস কার না পছন্দ হয়? আমার আগ্রহ এত প্রবল হল, এই শীত বৃষ্টির মধ্যেই দেখতে ছুটে চলে এলাম। কই দেখান দেখি আপনার গাভি এবং অন্যান্য জীবজন্তু। আবু জুনায়েদ প্রথমে উত্তরের শেডে পাখির খাঁচাগুলো দেখালেন। আপনা থেকেই শিরওয়ানির মুখ থেকে বেরিয়ে গেল,

–বাহ্ চমৎকার অনেক জাতের পাখি আপনি সংগ্রহ করেছেন। জুনায়েদ ভাই, ইউ আর এ মিরাকল ম্যান।

শিরওয়ানি সাহেব একটু উঁচু হয়ে আবু জুনায়েদের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন,

–এইবার আপনার গাভিটি দেখব।

আবু জুনায়েদ তাঁকে আসুন বলে একেবারে গোয়ালঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে মশারি তুলে ফেললেন। গরুটা দেখে শিরওয়ানি সাহেবের চোখজোড়া কপালে উঠে গেল,

–জুনায়েদ ভাই কী করছেন, কোহিনূরের চাইতে দামি চীজ। এই জিনিস আপনি পেলেন কোথায়? যতই আপনাকে দেখছি অবাক হচ্ছি–আপনি বিস্মিত হচ্ছেন? তার কোনো কারণ নেই। শহীদ হোসেন শিরওয়ানি সিনেটে আপনার সমালোচনা করে। এটা তো ভাই নাগরিক কর্তব্য। আমাকে তো করতে হবে। কিন্তু সেটাই সব নয়। আমি মানুষটার আরেকটা পরিচয় আছে। আমি ভালো জিনিসের তারিফ করতে পারি। সে কারণে তো আপনার এখানে এলাম।

তাঁরা দুজনে গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে এসে পাশাপাশি বসলেন। আবু জুনায়েদ শিরওয়ানি সাহেবের জন্য কফি এবং বিস্কুট আনালেন। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে শিরওয়ানি সাহেব তাঁর পিতৃদেবের গল্প করলেন। তাঁর পিতৃদেবও আবু জুনায়েদের মতো গরু পুষতে ভালবাসতেন। তারপর দেশের কথায় এলেন। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেন। দেশ গোল্লায় যেতে বসেছে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে নয় সারা দেশের তারুণ্য অপচিত হতে যাচ্ছে। তাঁরও দুজন তরুণ ছেলে আছে। একজন মাস্টার্স দিল আর একজন অনার্সে ভর্তি হয়েছে। তাঁর খুব ভয় কখন মারা যাবেন। ছেলেদের একেবারে অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলে যেতে হবে। সারা জীবন দেশের কাজ করেছেন। নিজের চিন্তা করার সময় পাননি। এখন স্ত্রী এবং ছেলেদের সামনে মুখ তুলে কথা বলতে পারেন না। ইচ্ছে করলে কি না করতে পারতেন। তাঁকে ধরে কত লোক কোটিপতি হয়ে গেল। অথচ শিরওয়ানি সাহেবের কিছুই হয়নি। তিনি যে কিছু করতে পারেননি সেই মনোবেদনাটি প্রকাশ করতে আবু জুনায়েদের কাছে আসা। কারণ, তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকাদার শেখ তবারক আলী সম্পর্কে আবু জুনায়েদের চাচা শ্বশুর হন। শিরওয়ানি সাহেব মরবার আগে ছেলেদের একটা ছাদের তলায় রেখে যেতে চান। বর্তমানে বারিধারায় একটি ডেরা বানাবার চেষ্টা করছেন। প্রিনস পর্যন্ত না উঠলে তিনি হাউজ বিল্ডিংস থেকে লোন পাবেন না। এই কাজটুকু করার জন্য তাঁর লাখ দুয়েক ইট দরকার। জুনায়েদ ভাই তাঁর চাচা শ্বশুর তবারক সাহেবকে ছয়

মাসের করারে দু লাখ ইট যদি তাঁর ভাঁটা থেকে দিতে বলেন, একটি গরিব পরিবারের বড় উপকার হয় এবং জুনায়েদ এ কাজটুকু করে দেবেন, কারণ তিনি জানেন তাঁর মনে দয়া আছে। কালিদাস আবৃত্তি করে শোনালেন, 'জ্ঞানীতে অনুনয় নিষ্ফল সেও ভালো ছোটোলোকে বর দিলে নিতে নেই।' আবু জুনায়েদ সঙ্গে সঙ্গে কবুল করে ফেললেন, তিনি তবারক সাহেবকে বলে দেবেন। শিরওয়ানি সাহেব চলে গেলে অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন, ভাগ্যের চাকা আমার অনুকূলে ঘুরতে আরম্ভ করেছে।

ড. সাইফুল আলম বিগত উপাচার্যের প্যানেল নির্বাচনে বেগুনি দলের প্যানেলভুক্ত প্রার্থীদের একজন ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে ভালো মানুষ এবং ভালো শিক্ষক হিসেবে ড. আলমের সুনাম রয়েছে। তিনি যদি প্রাক্তন উপাচার্য আবু সালেহ্‌র সঙ্গে একই প্যানেলে না দাঁড়িয়ে ডোরাকাটা দলের প্রার্থী হতেন, সবচেয়ে বেশি ভোট পেতেন একথা আবু জুনায়েদও স্বীকার করেন। আবু জুনায়েদ মনে মনে ড. সাইফুল আলমকে খুব শ্রদ্ধা করেন। তাঁকে ডোরাকাটা দল থেকে প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল। তিনি সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, আমি জানি নির্বাচনে বেগুনি দল হারবে। তবু আমি ওই দলে থেকেই নির্বাচন করব। আপনারা হয়ত বলবেন, এট আমার জন্য একটা বোকামো হবে। সবাইকে চালাক হতে হবে এমন কোনো কথা আছে কি? পৃথিবীতে কিছু মানুষ আছে ক্রমাগত হেরে যাওয়াই হচ্ছে যাদের কাজ। ক্রমাগত হারার ক্ষমতা অর্জন করাকেই আমি সবচেয়ে বড় বিজয় বলে মনে করি।

ড. সাইফুল আলম একদিন সকালবেলা আবু জুনায়েদের গোয়ালঘরে এসে উদয় হলেন। সেটা ছিল কোনো একটা পর্ব উপলক্ষে ছুটির দিন। আবু জুনায়েদ বাগানে মালিদের সঙ্গে নিজ হাতে কাজ করছিলেন। এই অভ্যেসটি তিনি একেবারে হালে রপ্ত করেছেন। দলের লোকেরা যখন থেকে পরিবেশ-প্রেমিক হিসেবে তাঁর একটি নতুন পরিচয় প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছেন, তারপর থেকে আবু জুনায়েদ ফুল ফল গাছপালা এসবের প্রতি বর্ধিত অনুরাগ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছেন। একদল ছাত্রকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গাছের চারা লাগাবার জন্য বিশেষ তহবিল থেকে দশ হাজার টাকা দিয়েছেন। অবশ্য বেগুনি দলের লোকেরা আবু জুনায়েদের এই একান্ত ভালো কাজটিকেও খারাপভাবে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁরা বলেছেন সরকারি দলটির মাস্তানদের হাতে রাখার জন্য বৃক্ষরোপণের নামে টাকাটা তাদের পাইয়ে দিয়েছেন।

ড. সাইফুল আলমকে আবু জুনায়েদের খোঁজ করতে হল না। ড. আলমকে গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখামাত্রই আবু জুনায়েদ এগিয়ে গিয়ে নিয়ে এলেন। তিনি বললেন,

–ভাই হাত মেলাতে পারব না, কারণ হাতে অনেক কাদা।

ড. আলম বললেন,

–আপনার এই কাদামাখা হাতের সঙ্গে হাত মেলাবার জন্যই সকালবেলা ছুটে এলাম। দিন কাদামাখা হাতটা দিন, একটু মিলিয়ে নিই।

অগত্যা আবু জুনায়েদ তাঁর হাতখানি প্রসারিত করে দিলেন। হাত মেলানোর পালা সাঙ্গ হওয়ার পর আবু জুনায়েদ ড. সাইফুল আলমকে উপাচার্য ভবনে নিয়ে যেতে চাইলেন। ড. আলম বললেন, জুনায়েদ সাহেব 'এমন সুন্দর দিনে ঘরে কেবা যায়'। চার দেয়ালের মধ্যে ঢুকতে মন চাইছে না। আবু জুনায়েদ বললেন,

–তাহলে বারান্দায় চেয়ার পেতে দিতে বলি।

ড. সাইফুল আলম জবাবে বললেন,

–সেটিও হচ্ছে না। তার চেয়ে আপনি আপনার গরু এবং পাখিগুলো দেখান। এত শুনেছি। দুজনে পথ দিয়েছেন, মাঝামাঝি জায়গায় গিয়ে ড. আলম আবু জুনায়েদের হাত ধরে থামিয়ে দিয়ে বললেন,

–কিন্তু ভাই একটি কথা, আপনাকে আগেই সোজাসুজি বলে ফেলতে চাই। পরে আমার বলতে খারাপ লাগবে, শুনে আপনারও মনে হতে পারে মানুষটা তোষামোদ করতে এসেছে।

আবু জুনায়েদ বললেন,

–ড. আলম আপনি আসুন। সেসব নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। আপনার মতো স্ট্রেটফরোয়ার্ড মানুষ আমি খুবই কম দেখেছি।

আবু জুনায়েদ ড. সাইফুল আলমকে প্রথমে গরুটা দেখাতে নিয়ে গেলেন। গরু শুয়েছিল। আবু জুনায়েদরা প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে আদর করার জন্য ঘাড়টা বাড়িয়ে দিল। আবু জুনায়েদ আদর করলেন। তারপর মুখের কাছে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। গরুটা লম্বা লালচে জিভ বের করে হাত চাটতে লাগল। ড. সাইফুল আলম পকেট থেকে চশমা বের করে চোখে লাগিয়ে ভালো করে গরুটা দেখলেন। গো সন্দর্শন শেষ করে দুজনে উত্তরের শেডে গিয়ে বসেছেন। খাঁচা থেকে দুটি ময়নার মধ্যে একটি কথা বলে উঠল : পরিবেশ বাঁচান, গাছ লাগান। ময়নার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে ড. আলম উঠে দাঁড়ালেন। তারপর প্রতিটি খাঁচার কাছে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। তাঁর মধ্যে একটা চঞ্চলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। তিনি বলে উঠলেন,

–জুনায়েদ সাহেব, একটা কথা বলে ফেলি। আপনার কাছে আমি নির্বাচনে হেরেছি। জানেন তো প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি একটা ঈর্ষা, একটা শত্রুতার ভাব সব সময়ে থাকে।

আবু জুনায়েদ মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন, কী জানি আবার ড. সাইফুল আলম কী অঘটন ঘটিয়ে তোলেন। কিন্তু ড. সাইফুল আলমের মুখ থেকে কোনো অপ্রিয় বাক্য তিনি শুনতে পেলেন না।

ড. সাইফুল আলম বললেন,

–জুনায়েদ সাহেব, আপনার কাছে নির্বাচনে হেরেছি, সেজন্য মনে একটা বেদনাবোধ ছিল, এই মুহূর্তে পাখির মুখের কথা শুনে আমার মনের সমস্ত বেদনা,

সমস্ত দুঃখ কোথায় চলে গেল। আমি হেরেছি বটে, কিন্তু হেরেছি একজন যোগ্য এবং ডিসেন্ট মানুষের কাছে। আসুন একটু কোলাকুলি করি।

কোলাকুলির পর দুজনে মুখোমুখি বসলেন। চা এল, সন্দেশ এল। আবু জুনায়েদ এবং ড. সাইফুল আলম দুজনকেই উঠে হাত ধুতে হল। সন্দেশ চা খেতে খেতে ড. সাইফুল আলম তাঁর আগমনের কারণ ব্যাখ্যা করতে লেগে গেলেন,

–আমার গিন্নি আপনাকে সালাম দিয়েছেন। বস্তুত তিনিই জোর করে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনি তো জানেন আমরা সাত চল্লিশের এ-তে থাকি। বাড়িটা তিন রুমের। আমাদের অনেকগুলো ছেলেমেয়ে। আমরা যখন বিয়ে করেছি তখনো ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর কথাটা বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। কী করব ভাই, একবার ভুল করেছি এখন তো শোধরাবার উপায় নেই। তিন রুমের বাড়িতে সকলের স্থান সঙ্কুলান হতে চায় না। ছেলে দুটোর বিয়ে দিয়েছি। তাদের বাচ্চা কাচ্চা হয়েছে। সকলকে গাদাগাদি করে এক সঙ্গে থাকতে হয়। তাই আমার গিন্নি বললেন, মুতালিব সাহেবরা চলে যাওয়ার পর থেকে আঠার বি-র চার রুমের ফ্ল্যাটটা খালি পড়ে রয়েছে। আপনি যদি ওই ফ্ল্যাটটা আমাদের দেয়া যায় কি না দেখেতেন।

আবু জুনায়েদ কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর বললেন,

–আপনার ক্যালিবারের একজন মানুষ চার রুমের একটি বাসা চাইছেন, সেটা এমন কী। আপনার আসার প্রয়োজন ছিল না। কাউকে দিয়ে দু'কলম লিখে পাঠালেই কাজ হয়ে যেত। তবে আপনি এসেছেন আমি খুব খুশি হয়েছি। তবে ভাই একটি কথা, ফ্ল্যাট তো আমি বরাদ্দ করব, কিন্তু আপনার দলের লোকদের দিকটা আপনি একটু খেয়াল রাখবেন। উনারা সবসময় আমার ভালো কাজের খারাপ মানে করেন।

ড. সাইফুল আলমকে একটু অপ্রস্তুত দেখা গেল। তিনি বললেন,

–হ্যাঁ ভাই সে কথাও তো ভাবতে হবে। আমি তো একটি দল করি। আর মোটামুটি প্রিন্সিপ্যাল একটা মেনে আসছি।

আবু জুনায়েদ চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন,

–হ্যাঁ ভাই চার রুমের ফ্ল্যাট আপনার নামে এ্যালটমেন্ট দেয়া হবে, আগামী মাসেই পজেশন নিতে পারবেন।

আরো কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে ড. সাইফুল যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। উত্তরের শেড থেকে বের হওয়ার আগে বললেন,

–ভাই এই মুহূর্তে স্থির করলাম, আমিও একটি ময়না পুষবো। পাখিটিকে একটি কথাই শেখাব–ডিসেন্ট শত্রুর কাছে হারাও ভালো।

ড. সাইফুল আলম চলে যাওয়ার পর আবু জুনায়েদ কিছুক্ষণ চেয়ারে অচল হয়ে বসে রইলেন এবং বিড়বিড় করে বলতে থাকলেন,

–আমার ভাগ্যের চাকা ঘুরতে আরম্ভ করেছে। আসবে, আরো অনেকে আসবে। অনেককেই আসতে হবে। তারপর তিনি গোয়ালঘরে গরুকে ঘাস খাওয়াতে চলে গেলেন।

বিরোধী দলীয় ছাত্রনেতা মাজহারুল করিম জুয়েল যেদিন আবু জুনায়েদের সঙ্গে গোয়ালঘরে দেখা করতে এল তাঁর মনের ভেতর কে যেন বলে দিল এই গোয়ালঘর থেকেই তোমার নতুন ক্যারিয়ার তৈরি হতে যাচ্ছে আবু জুনায়েদ। অনেকদিন পর্যন্ত তোমার সৌভাগ্য রাশি আলো দিতে থাকবে।

সেই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় দু'দলের মারামারির কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় যখন একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, ক্যাম্পাসে কোনোও ছাত্রছাত্রী থাকে না, এ ধরনের পরিস্থিতিতে এ্যাকটিবিস্ট ছাত্রনেতারা বিপদে পড়ে যায়। এ ধরনের সময়কে তাদের জন্য আকালও বলা চলে। তাদের অনেককেই কষ্টেসৃষ্টে দিন কাটাতে হয়। কোনো কোনো সময় দু বেলার খাবারও জুটতে চায় না। এ্যাকটিবিস্ট ছাত্রনেতার সঙ্গে দলবল সাঙ্গপাঙ্গ না থাকলে শক্তিই বা কোথায় আর দাপটও বা আসবে কোত্থেকে। আর এ্যাকটিবিস্ট ছাত্রনেতার পেছনে জনশক্তি যদি থাকে তার মূল্য কী? একা একা দোকানে গিয়ে চাঁদা তোলার কথা দূরে থাকুক ভিক্ষেও করা যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয় একেবারে বন্ধ থাকলে এ্যাকটিবিস্ট ছাত্রনেতারা এরকম অথৈ পানিতে পড়ে যায়। ঢাকায় যাদের বাড়িঘর আছে, তাদের কথা আলাদা। যারা মফস্বল থেকে এসেছে, যাদের বাড়ি একেবারে গ্রামে তাদের অবস্থা দাঁড়ায় হরিণবিহীন বনভূমিতে বন্দী ব্যাঘ্র মহারাজের মতো। উপস্থিত মুহূর্তে মাজহারুল করিম জুয়েলের অবস্থা একেবারে শোচনীয়। সে না পারছে গ্রামে ফিরে যেতে, না পারছে প্রকাশ্যে চলাফেরা করতে। ছিনতাই, রাহাজানি এবং খুনের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে তিনটি মামলা রয়েছে। অবশ্য খুনের মামলায় তাকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আসামী করা হয়েছে। জুয়েল যদি গ্রামে যায় চিল যেভাবে ছুঁ মেরে মুরগির বাচ্চা নিয়ে যায়, সেভাবে তাকেও পুলিশ উঠিয়ে নেবে। শহরে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াবার উপায় নেই। জুয়েল দলের জন্য এতগুলো ঝুঁকি নিয়েছে, এতগুলো মামলার আসামী হয়েছে, আজকে যখন সে বিপদে পড়েছে দল তাকে গ্রহণ করতে চাইছে না, বের করে দেয়ার চক্রান্ত করছে। এখন মাজহারুল করিম জুয়েলের সামনে দুটি পথই খোলা আছে। প্রথমটি হল সরকারি ছাত্র দলটিতে যোগ দেয়া। সরকারি দলে যোগ দিতে তার আপত্তি নেই, প্রধানমন্ত্রী যে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন, সেগুলো তার [illegible] পছন্দ। কিন্তু দুটি অসুবিধে : প্রথমটা হল পুলিশ কেসগুলো উঠিয়ে নিতে হবে। দ্বিতীয়টা হল সরকারি দলের এ্যাকটিবিস্ট নেতা হান্নান মোল্লার সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো নয়। হান্নান মোল্লা যদি বাধা দেয় তাহলে একটু বেকায়দায় পড়ে যাবে। তবে সে গভীর রাতে হান্নান মোল্লার বাড়িতে যেয়ে কথাবার্তা বলে একটা ফয়সালা করে ফেলার আশা রাখে। যে দলেরই হোক না কেন এ্যাকটিবিস্ট ছাত্র নেতাদের একটি সাধারণ ধর্ম হল একজন নেতা যদি আরেকজন এ্যাকটিবিস্ট নেতার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে, প্রাপ্য মর্যাদা দিতে কখনো কুণ্ঠিত হয় না। তার দৃঢ় বিশ্বাস সে সবগুলো বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে যাবে। সরকারি দলের

যুবনেতা বাটুল ভায়ের সঙ্গে তার ফাইনাল কথা হয়েছে। সবকিছু সে সাইজমতো সেটেল করে এনেছে প্রায়। উপস্থিত মুহূর্তে তার কিছু নগদ টাকার প্রয়োজন, সেজন্য উপাচার্য স্যারের কাছে আসা। তিনি যদি টাকাটা ম্যানেজ করে দেন। আবু জুনায়েদ জিজ্ঞেস করলেন,

–কত টাকা হলে তোমার চলে?

জুয়েল বলল, বেশি নয় স্যার মাত্র পনের হাজার।

শুনে আবু জুনায়েদের বোবা হয়ে যাওয়ার উপক্রম।

–অত টাকা আমি পাব কোথায়? মাইনে কত পাই জানো? জুয়েল বলল, স্যার আপনাকে এক টাকাও দিতে হবে না। আমার একটা লোক আছে সে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাফেটেরিয়ার ক্যাটারার হিসেবে নিয়োগপত্র পাওয়ার আবেদন করেছে, আর্নেস্টমানি জমা দিয়েছে, উপাচার্য স্যার যদি অনুগ্রহ করে ক্যাটারিংয়ের সুযোগটা তার বন্ধু রহমতউল্লাহকে দিয়ে দেন তাঁর কাছ থেকেই সে পনের হাজার টাকা ক্যাশ আদায় করে নেবে। জুয়েল আরো বলল, কাজটা ঠিক হচ্ছে না সে জানে, তবুও উপাচার্য সাহেবের কাছে একটি কারণে তার প্রার্থনাটি জানাতে এসেছে, কারণ উপাচার্য স্যার খুব নরম দিলের মানুষ। গরু ছাগল পাখি গাছপালা সবকিছুই তাঁর দয়া পেয়ে থাকে। সে তুলনায় জুয়েল তো মানুষের বাচ্চা। অল্প ক'দিন আগেও বিরোধী ছাত্র সংগঠনের এ্যাকটিবিস্ট নেতা হিসেবে তার একটি সম্মানজনক অবস্থা ছিল। উপাচার্য স্যার যদি তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে দেয়, সুদূর ভবিষ্যতে সে উপাচার্য স্যারের চাকর হওয়ার আশা পোষণ করে।

মাজহারুল জুয়েলের কথাবার্তা শুনে আবু জুনায়েদ একটু উন্মনা হয়ে পড়েছিলেন, একটা তন্ময়তাবোধ তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল। তিনি তন্ময়তা ভেঙে জেগে উঠে বললেন,

–একটি শর্তে তোমাকে সাহায্য করতে রাজি হব। বলো শর্তটি মানবে?

–স্যার আপনি যা বলবেন, তাতেই আমি রাজি।

–তোমাকে ভালো হয়ে যেতে হবে। কথা দিতে হবে গুণ্ডামি ষণ্ডামি এসব করবে না।

–স্যার আমি এখনই ভালো হয়ে গেছি। কথা দিচ্ছি কোনো বদ কাজ আমি করব না। বরঞ্চ যদি কাউকে অন্যায় কাজ করতে দেখি গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।

জুয়েল ঝুঁকে পড়ে আবু জুনায়েদের পদধূলি নিয়ে মুখে এবং কপালে মাখল।

মাজহারুল করিম জুয়েল চলে যাওয়ার পর আবু জুনায়েদের ধারণা হতে থাকল তিনি বিশেষ ধরনের কামালিয়াত হাসিল করে ফেলেছেন। যা ভাবেন তাই ঘটে যাবে। তাঁর অগ্রযাত্রা ঠেকায় সাধ্য কার?

চৌদ্দ

নুরুন্নাহার বানু ভীষণ একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছেন। বিয়ে হওয়ার পর থেকেই তাঁর মনে এমন একটা আত্মবিশ্বাস জন্ম দিয়েছিল যে আবু জুনায়েদকে ডাইনে বললে ডাইনে, বামে বললে বামে, সামনে পেছনে যেদিকে ইচ্ছে চালিয়ে নেয়ার ক্ষমতা তিনি রাখেন। তিনি মনে করতেন আবু জুনায়েদ হলেন একটা লক্কর ঝক্কর গাড়ি, আর এমন গাড়ি যে পথে চলতে গেলে মাঝে-মাঝে থমকে দাঁড়ায়। দুর্ঘটনার ভয়ে মেইন রাস্তা ছেড়ে অলিগলিতে ঘোরাঘুরি করতে পছন্দ করে। আবু জুনায়েদকে ভাঙাচোড়া গাড়ির সঙ্গে তুলনা করতেন আর নিজেকে মনে করতেন রদ্দি জগদ্দলের প্লাটিনামে মোড়া চকচকে স্টিয়ারিং হুইল। নুরুন্নাহার বানুর আব্বা টাকাপয়সা দিয়েছিলেন বলেই আবু জুনায়েদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে পেরেছেন। পেছনে তাঁর বাবা না থাকলে আবু জুনায়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হওয়া দূরে থাকুক ছাত্র হওয়ার সুযোগ পর্যন্ত জুটত না। নুরুন্নাহার বানুর মতো ভাগ্যবতী মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন বলেই আবু জুনায়েদ অত সহজে বাঘা বাঘা মানুষদের পাশ কাটিয়ে উপাচার্যের চাকরিটা পেয়ে গেছেন। আবু জুনায়েদ আজকে যা হয়েছেন তার সামান্য অংশ নুরুন্নাহার বানুর বাবার তৈরি, আর বাদবাকি সবটা নিজের হাতে তিনি ঢালাই করেছেন। আবু জুনায়েদের কোনো ভূমিকা, কোনো কৃতিত্ব নেই। নুরুন্নাহার বানু অনুগ্রহ করে পেটে ধারণ করতে রাজি হয়েছিলে বলেই আবু জুনায়েদ সন্তানের বাবা হতে পেরেছেন। নুরুন্নাহার বানু মনে করেন, পেছনে তিনি না থাকলে আবু জুনায়েদকে লাফাঙ্গারের মতো ঘুরে বেড়াতে হত। বিয়ে হওয়ার ছাব্বিশ বছর পর্যন্ত নুরুন্নাহার বানুর বেঁধে দেয়া ছকের মধ্য দিয়ে আবু জুনায়েদের সংসারের যাতা চলছিল। সবকিছু বাঁধাধরা, কোনো অনিয়ম দুর্ঘটনার বালাই নেই। মাঝে-মাঝে ঝগড়াঝাটি, অল্পস্বল্প যে মনোমালিন্য হত না তা নয়। কিন্তু সেগুলো নুরুন্নাহার বানুর পরিকল্পনার ভেতরের জিনিস। মেয়ে মানুষ এবং পুরুষ মানুষের একসঙ্গে দীর্ঘকাল বাস করতে হলে অল্পবিস্তর ঝগড়াঝাটি মান-অভিমান থাকা খুবই প্রয়োজন। নইলে জীবন আলুনি এবং বিস্বাদ হয়ে যায়। ঝগড়াঝাটি সময় বিশেষে সংসার রথের চাকায় ওয়েল্ডিং-এর কাজ করে। সুতরাং নুরুন্নাহার বানু যখন ফাটাফাটি ঝগড়া করতেন, সেটাও তার একটা হিসেবের ব্যাপার ছিল। সংসারের সমস্ত কিছু আপন হাতের মুঠোর ভেতর চেপে রাখতেন।

এক চুল এদিক ওদিক হবার জো ছিল না। শুধু স্বামী নয়, মেয়ে থেকে চাকর-বাকর পর্যন্ত সবাই তাঁর অনুগত ছিল। কাজের বেটি একচুল এদিক সেদিক করলে ঝাঁটা দিয়ে পিটিয়ে বাড়ির বের করে দিতেন। নিজের মেয়েটিকে পাড়ার কোনো ছেলের সঙ্গে হাসাহাসি করতে দেখলে পিটিয়ে আধমরা করে ফেলতেন।

গথিক ধাঁচে তৈরি এই প্রাসাদোপম স্বপ্নপুরিতে প্রবেশ করে নুরুন্নাহার বানুর মনে হয়েছিল তিনি মহারাণীর কপাল নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর ঠিকে ভুল হতে লাগল। ছোট খালে নৌকা বায় যে মাঝি, উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কুল মহাসমুদ্রে এসে পড়লে তার যে অবস্থা হয়, নুরুন্নাহার বানুও সেরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে লাগলেন। কাজের লোকদের নির্দেশ দিতে গিয়েই তাঁর কর্তৃত্বের পরিধি কতদূর সঙ্কুচিত টের পেলেন। মালিকে সামনে তরকারির বাগান করার হুকুম দিয়েছিলেন, মালি তাঁর মুখের ওপর বলেছে এই বাড়িতে সেটা চলতে পারে না। বেয়ারাকে দুপুরবেলা বাজারে যেয়ে কিছু টক দই কিনে আনতে বলেছিলেন, বেয়ারা ঘড়ি দেখে বলেছিল,

–বেগম সাহেবা আমার পরে যে আসবে তাঁকে বলবেন, আমার ডিউটি শেষ। এখন আমি বাসায় যাব।

এরকম ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে টের পাচ্ছিলেন এই বাড়িতে কেউ তাঁকে বিশেষ মান্য করার প্রয়োজন বোধ করে না।

তাঁর চোখের সামনে আবু জুনায়েদ কী রকম বদলে গেল। আবু জুনায়েদের গেঞ্জি এবং জাঙ্গিয়া থেকে এত দুর্গন্ধ বের হত যে নুরুন্নাহার বানুর বমি এসে যেত। তবু সেগুলো তিনি পাল্টাতেন না। এখন আবু জুনায়েদ বাড়িতেও অর্ধেক সময় থ্রি পিস স্যুট পরে বসে থাকেন। চেপে কথা বলবেন কি করে মানুষটাকেই অচেনা অচেনা লাগে। আগে ক্লাস থেকে ফিরতে পাঁচ মিনিট দেরি করলে নুরুন্নাহার বানুর কাছে দশ মিনিট কৈফিয়ত দিতে হত। এখন পুরো একবেলা এমনকি কখনো একদিন একরাত বাড়িতে না এলেও নুরুন্নাহার বানুর কাছে কথা বলাটাও প্রয়োজন বোধ করেন না। এখন আবু জুনায়েদের ব্যক্তিগত সহকারী, একান্ত সচিব, চাপরাশি কত কিছু হয়েছে। বেলে টিপ দিলেই উর্দি পরা লোক ছুটে আসে। আবু জুনায়েদের নুরুন্নাহার বানুকে কীসের প্রয়োজন।

মেয়েটাও কি নুরুন্নাহার বানুর আছে! নুরুন্নাহার বানু নিজের চোখে দেখেছেন একটা আলগা বেটাকে ঘরে বিয়ে করা বউ আছে, ছেলেমেয়ে আছে, তাকে আপন বুকে হাত দিতে দিয়েছে। নুরুন্নাহার বানু যখন শাসন করতে গেছেন আপন পেটের মেয়ে চোখ রাঙিয়ে বলে কি, খবরদার গায়ে হাত দিতে আসবে না। আবেদ ভাইকে ভালো লাগে, তাই মজা করছিলাম। তুমি চিৎকার করলে আমি আবেদ ভায়ের কাছে চলে যাব। আবেদ ভাই বর্তমান বউকে নিয়ে সুখী নয়। আমিও যদি সুখী না হই সেটা আমার ব্যাপার। তুমি হৈচৈ করার কে?

নুরুন্নাহার বানু কি বিনা প্রতিবাদে আবু জুনায়েদের এই জঘন্য অন্যায় মেনে নিতে পারেন। আজকে যদি তাঁর আব্বা বেঁচে থাকতেন, একটা গাই গরুর কাছে তাঁর মেয়েকে এমন ছোট করা কি সহ্য করতে পারতেন? তিনি আপন হাতে রামদায়ের একটা মাত্র কোপ দিয়ে ছোটলোকের বাচ্চার মাথা ফাঁক করে ফেলতেন এবং গাই গরুটি জবাই করে জেয়াফত খাওয়াতেন, নুরুন্নাহর বানু তেমন ঝালঅলা বাপের বেটি। আবু জুনায়েদের গরু পীরিতের শেষ দেখে তিনি ছাড়বেন। গরুটিকে তিনি আপন হাতে বিষ দিয়ে হত্যা করবেন। তাহলেই তাঁর শরীরের ঝাল মেটে। ইতোমধ্যে তিনি বিষ সংগ্রহ করে ফেলেছেন। সেজন্য তাঁকে একটু কষ্ট করতে হয়েছে। পুরনো একটি শাড়িও বুড়ি মাগিটি তাঁর কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে, গরুটি ভালোভাবে মারা যাবে, সেই মারা যাওয়ার কাজটি নিরাপদে হয়ে গেলে, নুরুন্নাহার বানুকে তাঁর সাহেবকে মানে আবু জুনায়েদকে বলে ছমিরনের স্বামীর একটি চাকরি ঠিক করে দিতে হবে। এতকিছু করার পরেই মাগি গ্রামে গিয়ে চামারের কাছ থেকে গরুর বিষ এনে দিয়েছে।

শুক্রবার দিন মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদকে নরসিংদি যেতে হল। আবু জুনায়েদের ইচ্ছে ছিল না। আজ পশু হাসপাতাল থেকে গরুটাকে দেখার জন্য ডাক্তার আসার কথা ছিল। গর্ভাবস্থার এখন ছ'মাস চলছে। শরীর ভারী হয়ে উঠছে। তরণীর চঞ্চলতা অনেকখানি থিতিয়ে এসেছে। ডাক্তার কী বলেন, আবু জুনায়েদের শোনার ইচ্ছে ছিল। শিক্ষা সচিব যাচ্ছেন, শিক্ষামন্ত্রী যাচ্ছেন, আবু জুনায়েদ না বলবেন কেমন করে। সরকারের অধীনে চাকরি আবু জুনায়েদের। আজ সপ্তাহব্যাপী উৎসবের সূচনা। একেবারে শেষ দিন প্রধানমন্ত্রী যাবেন। ঘর থেকে বেরোবার আগে আবু জুনায়েদ গোয়াল ঘরে গেলেন। গত দিন দেখাশোনার লোকটা চলে গেছে তার আসতে একটু বেলা হবে। কারণ তাকে বউকে নিয়ে হাসপাতালে যেতে হবে। সকালে যাতে 'তরণী' ব্রেকফাস্ট করতে পারে সেজন্য রাতেই তার জন্য গামলাতে আতপ চালের জাউ তৈরি করে রেখে যাচ্ছে। কেউ জাউটা তরণীর সামনে ঠেলে দিলেই চলবে। তরণী জাউ শেষ করার আগেই সে বউকে বাসায় রেখেই চলে আসবে।

আবু জুনায়েদ বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর নুরুন্নাহার বানুর হঠাৎ কেমন জানি ইচ্ছে হল তিনি নিচে গিয়ে একটু হেঁটে আসবেন। আবু জুনায়েদ বাইরে টাইরে কোথাও গেলে তিনি কম্পাউন্ড পরিক্রমার কাজটা বেশ ভালোভাবেই করেন। দারোয়ান মালি ঝাড়ুদার এ সকল তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা তাঁকে দেখে তটস্থ হয়ে ওঠে, হুকুম তামিল করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে, মনে যত কষ্টই থাকুক এটা তিনি মহা আনন্দে উপভোগ করে থাকেন। আজকে তিনি নিচে নেমে দেখেন সবটা ফাঁকা। ঝাড়ু দেয়া শেষে ঝাড়ুদারেরা চলে গেছে। মালিরাও অনুপস্থিত। কেবল এক দারোয়ান গেটে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে। নুরুন্নাহার বানুকে দেখতে পেয়ে মুখের সিগারেট ছুড়ে দিয়ে সালাম দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। নুরুন্নাহার বানু দারোয়ানের

কাছে তার অসুস্থ মেয়েটির সংবাদ জিজ্ঞেস করলেন দারোয়ান জানাল, বেগম সাহেবের অশেষ মেহেরবাণী। আল্লাহর রহমতে তার মেয়ে সুস্থ। দুঃসময়ে বেগম টাকাটা ধার না দিলে মেয়ের চিকিৎসা করানো তার পক্ষে সম্ভব হত না। এক তারিখ মাইনে পেলে সে ঠিক বেগম সাহেবার টাকাটা শোধ করে দেবে। বেগম সাহেব তার বড় উপকার করেছেন, সে কথা সারা জীবন মনে থাকবে। নুরুন্নাহার বানু বললেন, ঠিক আছে হাশমত ঐ টাকা ক'টা তোমাকে একেবারেই দিয়ে দিলাম। শোধ দিতে হবে না।

দারোয়ান করজোড়ে আবার নুরুন্নাহার বানুকে সালাম করল।

নুরুন্নাহার বানু ঘুরতে ঘুরতে গোয়ালঘরে এলেন। গরুটা দাঁড়িয়ে আছে, সুন্দর লেজটা দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে। তার ছলছল চোখ দুটোয় নুরুন্নাহার বানুর চোখ গেল। তিনি পেটে হাত রাখলেন, ভেতরে বাচ্চাটি নড়াচড়া করছে টের পেলেন। এমন গাভিন একটি গরুকে তিনি বিষ দিয়ে হত্যা করবেন! মনে একটা মমতা জন্মাল। গরুটা সত্যিই সুন্দর। কিন্তু তাঁর মনের ভেতর দীর্ঘদিনের কুণ্ডুলি পাকানো সংকল্পটা জীবন পেতে শুরু করছিল। তিনি কাজটা করবেন কি না ঠিক করতে পারছেন না। গোটা কম্পাউন্ডটা আগাগোড়া দু'চার চক্কর দিলেন। তাঁর একে একে মনে মনে পড়তে লাগল, গরুটা আসার পর থেকে কীভাবে তাঁর ওপর দুর্যোগ নেমে এসেছে। স্বামী পর হয়ে গেছে, মেয়ে খানকি হওয়ার উপক্রম, তাঁর নিজের জীবন থেকে শান্তি সুখ কীভাবে বিদায় নিয়েছে। গরুটা যদি বেঁচে থাকে নুরুন্নাহার বানুর আর কোনোই আশা নেই। নুরুন্নাহার কি স্বামী সংসার নিয়ে বেঁচে থাকতে চান, তাহলে গরুটি কোনোমতেই বেঁচে থাকতে পারে না। তাঁর মন কঠিন হয়ে উঠল, যা করবার তাঁকে তাড়াতাড়ি করে ফেলতে হবে। মনের এই দৃঢ়তা কতক্ষণ রাখতে পারবেন তিনি জানেন না। নুরুন্নাহার বানু নিজের কাছে নিজে পরাজিত হতে চান না। তাঁর চলার বেগ অত্যন্ত দ্রুত হয়ে গেল। হৃৎপিণ্ডের ধুক ধুক শব্দ তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন। তাড়াতাড়ি দোতালায় উঠে প্লাস্টিকের কৌটার ভেতর থেকে পলিথিনে ঢাকা পুরিয়াটা নিয়ে নেমে এলেন এবং গুঁড়োগুলো জাউয়ের গামলার মধ্যে স্পর্শ বাঁচিয়ে ছড়িয়ে দিলেন। আপন হাতে একটি গাছের ডাল ভেঙে গুলতে লাগলেন। তারপর ওপরে উঠে পরনের শাড়িটা বদলে ড্রাইভার ডেকে গাড়িতে চড়ে মীর হাজির বাগে বোনের বাড়িতে চলে গেলেন।

পনের

নরসিংদি থেকে মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদের ফেরার কথা ছিল বিকেলের দিকে। কিন্তু তাঁর ফিরতে ফিরতে রাত এগারটা হয়ে গেল। পথে এক জায়গায় একটা প্রাইভেট কার একজন কলেজ ছাত্রকে চাপা দিয়ে চলে গেছে এবং ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে। ক্ষিপ্ত ছাত্ররা ছাত্র হত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ যত প্রাইভেট কারের দেখা পেয়েছে, ইচ্ছেমতো ভাঙচুর করেছে, কোনো কোনো আরোহীকে জোর করে নামিয়ে পিটিয়েছেও। ভয়ে ওই রাস্তা দিয়ে কোনো গাড়ি আসতে সাহস পাচ্ছিল না। আবু জুনায়েদকেও অনেক ঘুরপথ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে আসতে হয়েছে। বিপদের ওপর বিপদ। বড় রাস্তায় যেই উঠেছে পেছনের চাকাটা পাংচার হয়ে গেল। অতিরিক্ত কোনো চাকা সঙ্গে ছিল না। তাই দু'মাইল ঠেলে গাড়িকে নিকটবর্তী গ্যারেজে আনতে হয়েছে। আবু জুনায়েদকে নিজেকেও এই ঠেলাঠেলির কাজে হাত রাখতে হয়েছে। গ্যারেজে নতুন চাকা লাগিয়ে আবার চলা শুরু করতে ঘণ্টাখানেক সময় চলে গেল। তাঁর খেয়ে ঘণ্টাখানেক আরাম করার অভ্যেস। আজকে সেটি হয়নি। তাছাড়া আরো নানারকম ধকল গেছে। শিক্ষা সপ্তাহের শুরুর দিন নরসিংদিতে দু'দল ছাত্রের মধ্য মারামারি হয়েছে। ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রান্তিতে তাঁর চোখ বুঁজে আসছিল।

তিনি যখন উপাচার্য ভবনের কম্পাউন্ডে এলেন দেখেন গেট খোলা। ভেতরে মানুষজনের আনাগোনা। গোয়ালঘরে অনেক মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। তিনি কোনোরকমে গাড়ি থেকে নেমে দারোয়ানকে কাছে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন কী হয়েছে?

দারোয়ান বলল,

–দুপুরবেলা থেকে গরুটা হড় হড় করে পাতলা পায়খানা করছে, কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না, আর মুখ দিয়ে ফেনা আসছে।

আবু জুনায়েদ জিজ্ঞেস করলেন,

–বেগম সাহেবা কোথায়?

দারোয়ান জবাব দিল,

–বেগম সাহেবেরও শরীর ভীষণ খারাপ। বড় আপার বাসায় গিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন। ওপরে তিনি আছেন। এখন অল্প অল্প জ্ঞান ফিরেছে। ডাক্তার দেখছেন।

আবু জুনায়েদ বেগমকে দেখতে ওপরে না যেয়ে গরু দেখতে গোয়ালঘরে চলে গেলেন। গোয়ালঘরে এই এত রাতেও অনেক মানুষ। মাওলানা তাহের, জনার্দন চক্রবর্তী, ড. আনোয়ারুল আজিমসহ সান্ধ্য আসরের প্রায় সমস্ত সদস্য উপস্থিত আছেন। একপাশে শেখ তবারক আলী। তাঁর পাশে এক ভদ্রলোক ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। আবু জুনায়েদ ধরে নিলেন তিনি ডাক্তার হবেন।

গরুটার অবস্থা দেখে আবু জুনায়েদের ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে। দুটো অসহায় স্বচ্ছ টলোটলো চোখ থেকে পানির দুটো ধারা গড়িয়ে নিচের দিকে নেমে আসছে। মলদ্বার দিয়ে পিচকারির মতো বেগে পাতলা পায়খানা ছুটছে। আবু জুনায়েদ ভালো করে দেখার জন্য যেই পেছনের দিকে গিয়েছেন ছড় ছড় করে পায়খানা ছুটে এসে তাঁর কোট প্যান্ট সব ভরিয়ে দিল। সে সবের পরোয়া না করে আবু জুনায়েদ মলদ্বারের গোড়া পরীক্ষা করে দেখেন, মলদ্বারের গোড়ায় ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ। গরুটির মুখে ফেনা ভাঙছে তো ভাঙছেই। সমুদ্রের জোয়ার নেমে যাওয়ার পর বেলাভূমিতে যে রকম ফেনা পড়ে থাকে গোয়ালঘর জুড়ে সর্বত্র ফেনার দাগ দেখতে পেলেন। আবু জুনায়েদ কী করবেন বুঝতে পারলেন না। তিনি কোটপ্যান্টশুদ্ধ হাঁটু মুড়ে গরুর পাশেই বসে পড়লেন। তারপর শিশুর মতো, বৃদ্ধের মতো, পুত্রহারা মেয়ে মানুষের মতো বুক চাপড়ে হু হু করে কেঁদে উঠলেন। উপস্থিত মানুষরা তাঁকে কেউ কিছু বলতে পারলেন না। এক সময় কান্নার বেগও শান্ত হয়ে এল। কিন্তু গরুটি পাতলা পায়খানা করেই যাচ্ছে।

আবু জুনায়েদকে কখন থেকে পায়খানা শুরু হল, নিতান্ত অনিচ্ছায়ও সে কথা শুনতে হল। কাঞ্চন মানে যে মানুষটি দেখাশুনা করে থাকে হাসপাতালে বউকে দেখিয়ে বাসায় রেখে সরাসরি গোয়ালঘরে চলে এল। এসেই দেখে গরুটি পাতলা পায়খানা করছে আর বড় বড় করে কাশছে এবং কাশির সঙ্গে ফেনা আসছে। রকমসকম দেখে কাঞ্চন খুব ভয় পেয়ে যায়। বাড়িতে বেগম সাহেবাকে খবর দিতে গিয়ে দেখে বেগম সাহেবা নেই। উপায়ান্তর না দেখে তবারক সাহেবের বাড়িতে টেলিফোন করে। তাঁর বাড়ি থেকে জানানো হয় তিনি মতিঝিলের অফিসে আছেন। কাঞ্চন তিল পরিমাণ বিলম্ব না করে তবারক সাহেবের অফিসে গিয়ে জানায় যে গরুটি পাতলা পায়খানা করছে এবং মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে। তবারক সাহেব অফিসে একজন সাহেবের সঙ্গে বসে চা খেতে খেতে আলাপ করছিলেন। ঘটনা শুনে তবারক সাহেব বিদেশী ভদ্রলোককে সঙ্গে সঙ্গেই বললেন,

এক্সকিউজ মি। ইউ হ্যাভ টু এ্যাপোলোজাইস মি। দেয়ার ইজ এ্যান এ্যাকসিডেন্ট, আই হ্যাভ টু রাশ রাইট নাউ।

তারপর তবারক সাহেব পশুহাসপাতালে গিয়ে নিজের গাড়িতে ভেটেরনারী সার্জন নূরুল হুদা সাহেবকে উঠিয়ে নিয়ে উপাচার্য ভবনে চলে আসেন। ভেটেরনারি সার্জন গরুকে ট্যাবলেট খাওয়াতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু গরুটি কিছু গিলছে না। কী

রোগ তিনি ধরতে পারছেন না তথাপি অনুমানের ওপর নির্ভর করে দু দুটো ইঞ্জেকশন দিয়েছেন, পায়খানা বন্ধ হয়নি। শেখ তবারক আলী তারপর সাভার সরকারি ডেয়ারি ফার্মে যে সুইডিশ পশু বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোক আছেন তাঁকে আনিয়েছেন। ড. জারনট জানালেন ট্রপিক্যাল ক্যাটেল ডিজিজ সম্বন্ধে তাঁর যতদূর বিদ্যা এরকম কোনো রোগের নাম কখনো শোনেননি। সুতরাং তিনিও বলতে পারেন না আসল রোগটা কী। আকস্মিক কোনো বিষাক্ত বস্তু খাওয়ার কারণেই হয়ত এরকম ঘটতে পারে। স্টম্যাক এক্সরে করালে আসল কারণটা জানা যেত। কিন্তু এদেশে ক্যাটেল এক্সরে করার কোনো প্ল্যান্ট নেই। সুতরাং তিনি খুবই দুঃখিত, কিছু করতে পারবেন মনে হয় না।

আবু জুনায়েদকে ধরে ধরে উপরে উঠিয়ে দেয়া হল। তিনি শুনলেন নুরুন্নাহার বানুকে এই সবেমাত্র ডাক্তার ঘুম পাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর শরীর থেকে একরকম জোর করেই কোট প্যান্ট খুলে তাঁকে বাথরুমে ঢুকিয়ে দেয়া হল। তিনি ঘোষণা করলেন, কিছু খাবেন না। আবারও জোর করে তাঁকে দুধ খাওয়ানো হল। চাপে পড়ে সামান্য ভাতও তিনি খেলেন। সকলে ধরাধরি করে তাঁকে শোয়ার ঘরের বাইরে একটি খাটে শুইয়ে দিল। কারণ, শোয়ার ঘরে নুরুন্নাহার বানু অচেতন হয়ে পড়ে আছেন এবং তাঁকে বড় বোন দেখাশোনা করছেন। আবু জুনায়েদ অসুস্থ স্ত্রী এবং গরুর কথা ভুলে পরেরদিন বেলা আটটা পর্যন্ত ঘুমোলেন।

মার্চ মাসের এগার তারিখ বেলা সোয়া ন'টার সময়ে একটি পশ্চিমা দেশের একজন রাষ্ট্রদূত আবু জুনায়েদের সঙ্গে তাঁর অফিসে এসে দেখা করবেন, এরকম এ্যাপয়েন্টম্যান্ট করা হয়েছিল। ভদ্রলোক এদেশে নতুন এসেছেন। মাত্র দু সপ্তাহ হল রাষ্ট্রপতির কাছে পরিচয়পত্র পেশ করছেন। এ পর্যায়ে তিনি মহানগরীর সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। আবু জুনায়েদ খুশি হয়েছিলেন। বিদেশীদের সঙ্গে তিনি চমৎকার বাতচিত করতে পারেন। অথচ এখানকার নাক উঁচু কালো সাহেবেরা রটিয়েছেন আবু জুনায়েদের ইংরাজি ভুল, বাংলা অশুদ্ধ।

তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী ফোন করে জানালেন রাষ্ট্রদূত সাহেব এসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। আবু জুনায়েদকে দাড়িটা কাটতে হল। গত কালের স্যুটটা পরতে গিয়ে দেখলেন গরুর গোবরের ছিটা লেগে আছে সর্বত্র। আলমারি খুলে তাই নতুন স্যুট বের করে পরতে হল। অফিসে গিয়ে দেখেন রাষ্ট্রদূত ভদ্রলোক অফিসে বসে বসে অপেক্ষা করছেন। আবু জুনায়েদ হাত বাড়িয়ে দিতে দিতে বললেন :

–ইউর এক্সেলেন্সি আই এ্যাম এক্সট্রিমলি সরি, দেয়ার ইজ এ্যান এক্সিডেন্ট ইন মাই হাউস!

রাষ্ট্রদূত ভদ্রলোক উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বললেন,

–সো ইউর ওয়াইফ ইজ সিক, ইজ সি?

–ইউর এক্সেলেন্সি নট এক্স্যাক্টলি মাই ওয়াইফ, বাট মাই কাউ।

–হোয়াট? কাউ? সো ইউ আর কিপিং এ কাউ?

–ইয়েস ইউর এক্সেলেন্সি, ভেরি গুড, ভেরি বিউটিফুল কাউ এবং ইটস মাদার ইজ এ সুইডিশ কাউ, এ কাউ অব ইউর বিউটিফুল কান্ট্রি। দ্যাট কাউ ইজ সিক। রাষ্ট্রদূত ভদ্রলোক একটু অবাক হয়ে গেলেন। কিছু জিনিস জানার জন্য রাষ্ট্রদূত ভদ্রলোকের কৌতুকের জন্ম নিল। তিনি বললেন,

–মিঃ ভাইস চ্যান্সেলর আই হ্যাভ টু কুয়োরিস। দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ আই হ্যাড দ্য আইডিয়া দ্যাট হিন্দুস ওঅরশিপ কাউস। বাট মুসলিমস আর বিফ ইটার নেশন লাইক আস, ইস নট দ্যাট?

আবু জুনায়েদ বললেন,

–ইউর এক্সেলেন্সি ইজ পারফেক্টলি রাইট হিন্দুস ডু ওঅরশিপ কাউ এ্যান্ড উয়ি পিপল ইট বীফ। বাট ইট ইজ অলসো ট্রু উয়ি লাভ কাউ ভেরি মাচ।

রাষ্ট্রদূত ভদ্রলোক হাসি সম্বরণ করে বললেন,

–নাউ মাই সেকেন্ড কুয়েরি উড বি হাউ ডু ইউ রিলেট কাউ কিপিং এ্যান্ড য়্যুনিভার্সিটি এ্যাডমিনিস্ট্রেশন?

–ইউর এক্সেলেন্সি। আই হ্যাভ মাই ওন ইনডিভিজুয়েলি মেথড টু ম্যানেজ বোথ।

রাষ্ট্রদূত ভদ্রলোক বললেন,

–থ্যাঙ্ক য়্যু মিঃ ভাইস চ্যান্সেলর, আই এ্যাম ভেরি হ্যাপি এন্ড গ্ল্যাড টু মিট ইউ।

তারপর একটা বিস্কুটের এককোণা দাঁতে কেটে নিয়ে চায়ে মুখ দিলেন। চা শেষ করে সুইডেনের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে ক্যাডিলাকে করে চলে গেলেন।

সুইডিশ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের পর আজকের দিনের দ্বিতীয় কর্মসূচি বোটানি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর নিয়োগের ইন্টারভ্যু। প্রফেসর নিয়োগের বেলায় উপাচার্যকে প্রিসাইড করতে হয়, এটাই নিয়ম। সায়েন্স ফ্যাকাল্টির ডীন বোটানি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান এবং এক্সটার্নেল হিসেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানির চেয়ারম্যান তিনজনই উপস্থিত আছেন। তিনজন মাত্র প্রার্থী। প্রতিটি প্রার্থীর ফাইল এবং আবেদনপত্র হাজির করা হয়েছে। আবু জুনায়েদের মুখে একটা থমথমে গাম্ভীর্য, তিনি বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে বললেন প্রথম ক্যান্ডিডেট ড. আদনানকে আসতে বলো।

তিনি চেম্বারে প্রবেশ করলে আবু জুনায়েদ চেয়ার দেখিয়ে বললেন, প্লিজ টেক ইওর সিট।

ড. আদনান বসলে কাগজপত্র দেখার পর জিজ্ঞেস করলেন আপনি ইউ. এস. এ. থেকে ডক্টরেট করেছেন?

ড. আদনান জবাব দিলেন,

–আমি ইউ. এস. এ'র মিশিগান য়্যুনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট এবং পোস্ট ডক্টরেট করেছি। মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদ একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন,

–আচ্ছা ড. আদনান, আপনি আমাকে বলুন তো, গাভীন গরু পাতলা পায়খানা করলে কী করতে হয়?

উপাচার্য সাহেবের প্রশ্ন শুনে আদনানের হেসে উঠতে ইচ্ছে হল। কিন্তু সংযম রক্ষা করলেন এবং বললেন,

–স্যার কী করতে হবে আমার জানা নেই। আমার বিষয় এ্যানিমাল হাজব্যান্ডি নয়, বোটানি।

আবু জুনায়েদ হঠাৎ করে উঠে দাঁড়িয়ে বোর্ডের অন্যান্য সদস্যদের বললেন,

–আপনারা ইন্টারভিউটা চালিয়ে নিন। আমি থাকতে পারছিনে। আমার গরুটার অসুখ। তারপর তিনি অফিস রুমের বাইরে চলে এলেন।

আবু জুনায়েদের গাড়ি অফিস থেকে উপাচার্য ভবনের কম্পাউন্ডে ঢুকলেন, দেখেন অনেক মানুষের ভিড়। ছাত্রছাত্রী, পাড়ার মহিলা, তরুণ শিক্ষকদেরও অনেককে দেখতে পেলেন। আবু জুনায়েদ চিন্তা করলেন, এই অল্প সময়ের মধ্যে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর গরুটি সকলের ভালবাসার পাত্র হয়ে উঠেছিল। কী আবেগ নিয়েই না সকলে অসহায় পশুটিকে দেখতে আসছে। দলে দলে মানুষ গোয়ালঘরের দিকে যাচ্ছে এবং গোয়ালঘর থেকে আসছে। গরুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন্ত সত্ত্বর অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে কথা আবু জুনায়েদ জানতেন না। তাঁর চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসছিল। তিনি গাড়ি থেকে নেমে ধীর মন্থর গতিতে গোয়ালঘরের দিকে গেলেন। সকলে তাঁকে পথ ছেড়ে দিল। তিনি নীরবে গোয়ালঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। গরুটি কাত হয়ে শুয়ে পড়েছে। তার মুখটা মাটিতে ঠেকিয়ে রেখেছে। ফেনায় গোয়ালের সবটা মেঝে ভেসে যাচ্ছে। সুন্দর চোখ দুটো বোজা। মলদ্বারের পাশে বিন্দু বিন্দু রক্ত লেগে রয়েছে। কাঞ্চন ছেলেটা গরুর গায়ে হাত দিয়ে বসে আছে। চুপচাপ। তার চোখ পানিতে ভেসে যাচ্ছে। আবু জুনায়েদ কাউকে কিছু না বলে ওপরে গিয়ে গায়ের কাপড়চোপড়, পায়ের জুতো কিছুই না খুলে বিছানায় নিজেকে ঢেলে দিলেন। গরুটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছেন, কী জামাই মিয়া আপনাকে কি আমি সঠিক পথ দেখাইনি। স্বপ্নটা দেখেই তিনি জেগে গিয়েছিলেন। এই রকম স্বপ্ন কেন দেখলেন, তার অর্থ কী হতে পারে! আরো কত বিপদ তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে কে জানে?

এই সময়ে তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে চাপাস্বরে বললেন, স্যার স্যার এডুকেশন মিনিস্টার অনেকক্ষণ পর্যন্ত লাইনে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আবু জুনায়েদকে তড়িতাহতের মতো উঠে টেলিফোনের কাছে যেতে হল। রিসিভার কানে লাগিয়ে সালাম দিতে হল। যত বিপদই থাকুক ওপর থেকে টেলিফোন এলে কণ্ঠস্বরে বিনীত ভাব ফুটিয়ে তুলে কীভাবে জবাব দিতে হয় সেটা আবু জুনায়েদের ধাতস্থ হয়ে গেছে। রিসিভার উঠিয়ে বিনীত কণ্ঠে বললেন,

–স্যার, আসসালামু আলাইকুম, আবু জুনায়েদ।

শিক্ষামন্ত্রী ওপ্রান্ত থেকে উৎসাহব্যঞ্জক কণ্ঠস্বরে ইংরেজিতে এবং তারপরে বাংলায় বললেন,

–মি: জুনায়েদ আই কংগ্রাচুলেট ইউ অব বিহাফ অব অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার এ্যান্ড মাই ওন বিহাফ। প্রাইম মিনিস্টার হ্যাজ আসক্‌ড মি ইনফর্ম ইউ ইউ, ইউ

আর দ্য মোস্ট ফেবার্ড এবং লাকি পারসন টু রিপ্রেসেন্ট বাংলাদেশ ইন ফিফটি ওয়ান আমেরিকান য়ুনিভার্সিটিস। উত্তর থেকে দক্ষিণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট একান্নটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির ওপর পরিচয়মূলক বক্তৃতা দিতে হবে। প্রতি বক্তৃতার সময় প্রশ্নোত্তরসহ আড়াই ঘণ্টা। প্রতিটি বক্তৃতার জন্য আপনাকে চার হাজার ডলার করে সম্মানী দেবে। এটা গুরু দায়িত্ব এবং সম্মানজনক দায়িত্ব। আপনার হাতে পঁচিশ দিন মাত্র সময় আছে। এরই মধ্যে যাবতীয় ফর্মালিটিজ সারতে হবে। বক্তৃতাগুলোর বিষয়বস্তু ছকিয়ে নিতে হবে এবং ফ্যাক্টস এ্যান্ড ফিগার ডোগার করতে হবে। সুতরাং বিশেষ সময় নেই। এই মুহূর্ত থেকে কাজে লেগে যান। প্রধানমন্ত্রী যাওয়ার আগের দিন আপনার অনারে একটা ডিনার দেবেন। সময়টা আমিই পরে জানাব।

এই বিরল সম্মান এবং প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনার সংবাদটি শোনার পর প্রথমেই আবু জুনায়েদ টেবিলের সামনে একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। তারপর ড্রয়ার থেকে ক্যালকুলেটর বের করে হিসেব করতে লাগলেন। তাঁকে একান্নটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে হবে। প্রতি বক্তৃতার জন্য পেতে যাচ্ছেন চার হাজার ডলার। একান্নকে চার দিয়ে গুণ করলে কত দাঁড়ায়? এক ডলারে চল্লিশ টাকা, এক লক্ষ ডলারে চল্লিশ লক্ষ টাকা, দু লক্ষ ডলারে আশি লক্ষ টাকা। তার ওপর আরো দু লক্ষ টাকার মতো। মোট বিরাশি লক্ষ টাকার হাতছানি। সে কী সামান্য ব্যাপার! একটু আগে দেখা স্বপ্নটার কথা মনে এল। স্বপ্নের তাৎপর্যটা তাঁর কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি ইচ্ছে করলে পাঁচশো একর, এক হাজার একর মনের মতো জমি পছন্দ করে কিনতে পারবেন। তাঁর হালাল রুজির টাকায় কেনা। তিনি কনসালট্যান্সি করেননি। রাজনৈতিক ধান্দাবাজি করেননি। আল্লাহ সৎ পথেই তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছেন।

আবু জুনায়েদ ভাবলেন সংবাদটা প্রথমে নুরুন্নাহার বানুকে জানানো প্রয়োজন। আবু জুনায়েদের মনে হল তিনি শূন্যের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছেন। শোয়ার ঘরে গিয়ে দেখেন নুরুন্নাহার বানু উত্তর দিকে মুখ করে ঘুমিয়ে আছেন। আবু জুনায়েদ তাঁকে আস্তে আস্তে দোলা দিয়ে ডাকতে থাকলেন এই বানু এই বানু। খুব আবেগাপ্লুত নয়নে তিনি কখনো নুরুন্নাহারকে বানু বলে ডাকেন না। আবু জুনায়েদ ডাকাডাকি করছেন, অথচ নুরুন্নাহার বানু চোখ খুলছেন না। অবশেষে অনেক ডাকাডাকির পর নুরুন্নাহার বানু ঘুম থেকে জেগে খাটের ওপর বসলেন। আবু জুনায়েদের দিকে ঘোলা ঘোলা চোখে তাকালেন। মনে হল না তিনি আবু জুনায়েদকে চিনতে পেরেছেন। খুব ক্ষীণ স্বরে, মনে হয় স্বরটা তাঁর নয়, অন্য কোথাও থেকে ভেসে আসছে জিজ্ঞেস করলেন, কী চাও?

আবু জুনায়েদ তাঁর হাত দুটি ধরে বললেন, বানু শোনো একটা অসম্ভব সুখের সংবাদ। জানো আমেরিকার একান্নটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে একটি করে বক্তৃতা দিতে হবে। প্রতি বক্তৃতায় চার হাজার ডলার সম্মানী পাব। সব মিলিয়ে হবে দু লক্ষ

চার হাজার ডলার। আমাদের টাকায় তার পরিমাণ বিরাশি লক্ষ। এত টাকা আমাদের হবে।

নুরুন্নাহার বানু পূর্বের মতো ক্ষীণ স্বরে বললেন, খুবই উত্তম সংবাদ। তুমি বিরাশি লক্ষ টাকা পাবে। এই টাকাটা তোমার দরকার হবে। গাভি প্রেমিকার কবরের ওপর তুমি তো তাজমহল বানাবে। শুনে রাখো তোমার প্রেমিকাটি আজ রাতে কিংবা কাল সকালে মারা যাবে এবং আমিই ওকে খুন করেছি।

রচনাকাল : ডিসেম্বর ১৯৯৪ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫